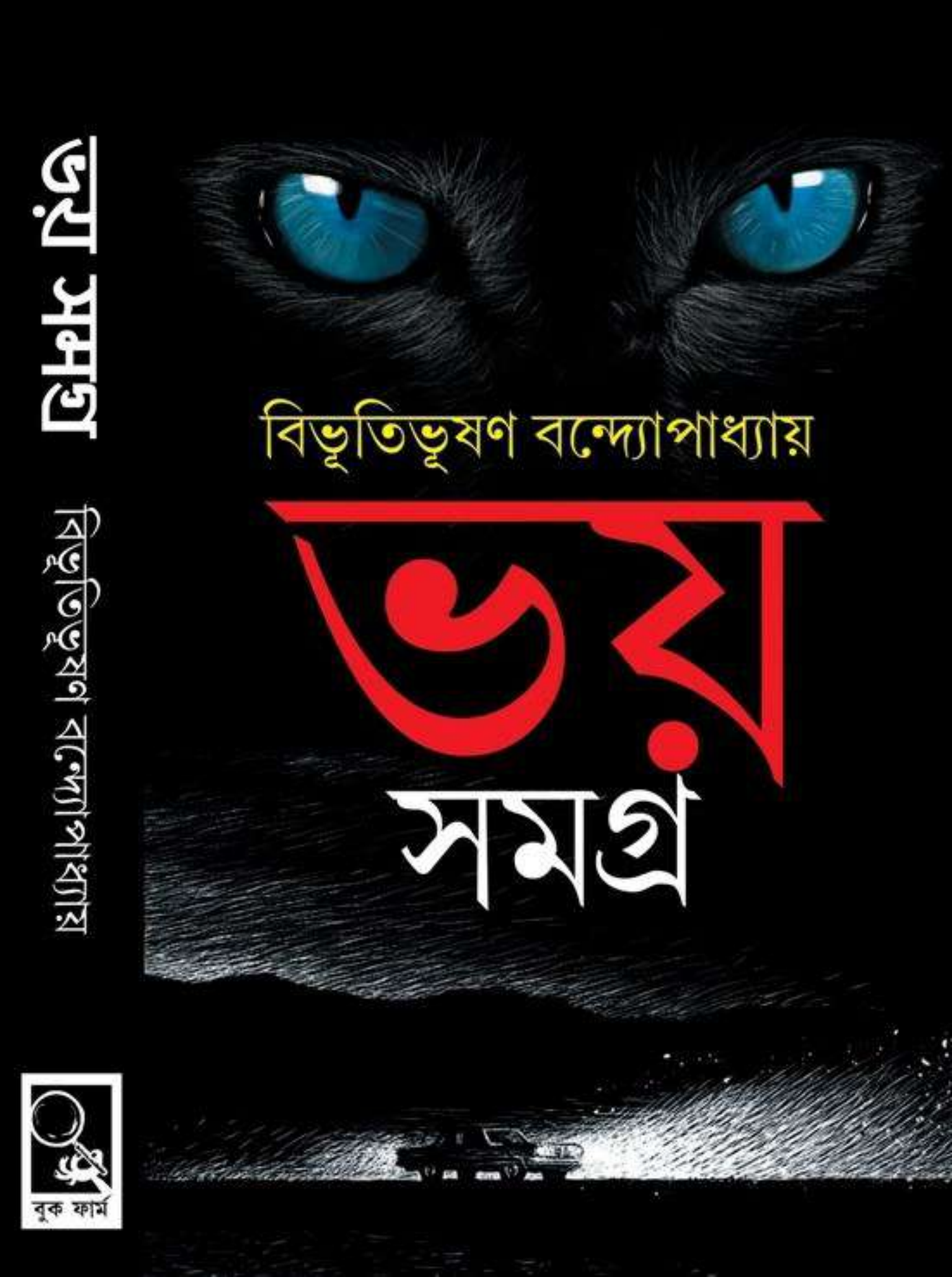

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভয় সমগ্র

ভয় সমগ্র
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুক ফার্ম

সূচিপত্র

১.	মেঘমল্লার	০৯
২.	তিরোলের বালা	২৭
৩.	ছেলেধরা	৪০
৪.	বোমাইবুরুর জঙ্গলে	৪৭
৫.	সোনাকরা যাদুকর	৫৩
৬.	খোলা দরজার ইতিহাস	৬১
৭.	পথিকের বন্ধু	৬৮
৮.	অভিশাপ	৭৩
৯.	অভিশপ্ত	৮০
১০.	হাসি	৮৯
১১.	প্রত্নতত্ত্ব	৯৪
১২.	রহস্য	১০১
১৩.	আরক	১০৬
১৪.	ছায়াছবি	১১২
১৫.	রঙ্কিনীদেবীর খড়্গ	১১৯
১৬.	মেডেল	১২৫
১৭.	পেয়ালা	১৩৪

১৮. ভৌতিক পালঙ্ক ১৩৮
১৯. গঙ্গাধরের বিপদ ১৪৪
২০. মশলা-ভূত ১৪৯
২১. কাশী কবিরাজের গল্প ১৫৪
২২. বিরজা হোম ও তার বাধা ১৬০
২৩. মায়া ১৬৬
২৪. টান ১৭৫
২৫. বউ চণ্ডীর মাঠ ১৮০
২৬. খুঁটি দেবতা ১৮৫
২৭. পৈতৃক ভিটা ১৯৪
২৮. অশরীরী ২০০
২৯. ভূত ২০৭
৩০. বাঘের মন্তর ২১২
৩১. নুটি মন্তর ২১৯
৩২. তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প ২২৪
৩৩. তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প ২৪১
৩৪. কবিরাজের বিপদ ২৫৬

দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশপারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল ; অনেক মালাকার নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা গড়ে মেয়েদের কাছে বেচবার জন্যে এনেছিল। একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী রেশমী শাড়ি এনেছিল বেচবার জন্য। তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজিয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধরে খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন

তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মন্দিরের উঠোনে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষ-মানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি চেহারায় ও হাবভাবে বর্ণনা-বাজিয়ে ধরা পড়েন। অনেকক্ষণ ধরে দেখবার পর তার চোখে পড়ল একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্যে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উঁচু ক'রে প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি অবন্তীর গাইয়ে সুরদাস, তুমি আমাকে খুঁজছিলে না?

প্রদ্যুম্ন একটু আশ্চর্য হ'ল। তার মনের কথা ইনি জানলেন কি ক'রে?

প্রদ্যুম্ন সসম্ভ্রমে জানালে, হ্যাঁ, সে তাঁকেই খুঁজছিল বটে।

প্রৌঢ় বললেন—তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা না ক'রে আসতাম না। তোমাকে ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।

—আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন?

—নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে জান?

—হ্যাঁ জানি। ওখানে একজন সন্ন্যাসী পূর্বে থাকতেন না?

—তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোন একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তুমি এখানে কোথায় থাক?

—এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন?

—সে তোমাকে বলব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।

প্রদ্যুম্ন প্রণাম করে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি ; মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল, তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা উৎসব থেকে বাড়ি ফিরছিল। প্রদ্যুম্নের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত ধাবিত হ'ল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল। আচার্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রদ্যুম্নের মধ্যে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে বেশি চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে তাকে একটু বেশি শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন—তার উপরে সে রাত ক'রে বিহারে ফিরলে কি আর রক্ষা থাকবে?

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশের পাহাড়ের আড়ালটা সরে গেল। সেখানে সেদিকটা ছিল খোলা। প্রদ্যুম্ন দেখলে দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপরকার ছায়াচ্ছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফিরছিল। আরও দূরে একখানা সাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিকের পড়ন্ত রোদে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে আসছিল, চারিধারে তার শীতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হাল্‌কা করে টানা।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রদ্যুম্নের কাপড় ধ'রে কে ঈষৎ টানলে।

প্রদ্যুম্ন পিছন ফিরে চাইতেই যে কাপড় ধ'রে টেনেছিল তার চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে কিশোরী, তার দোলন-চাঁপা রং-এর ছিপছিপে দেহটি বেড়ে' নীল

শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তার খোঁপাটিতে জড়ানো।

প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ের সুরে ব'লে উঠল—কখন তুমি এসেছিলে, সুনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজলাম, কৈ দেখতে পেলাম না তো?

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তারপরে সে একটু অভিমানের সুরে বললে—আমাকেই খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি! যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরছিলে, সে আর আমি দেখিনি!

—সত্যি বলছি সুনন্দা, তোমাকে খুঁজেছি। নামবার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি ; তুমি কাদের সঙ্গে এলে?

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে আসছে। সুনন্দার সেদিকে চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যুম্নকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এ অবস্থায় আর সুনন্দার অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা-মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু ক'রে সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল থেকে তরলতর হতে হতে হঠাৎ কখন জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অন্যমনস্ক প্রদ্যুম্ন তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙল, তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথ ঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি ক'রে? আচার্য পূর্ণবর্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভর্ৎসনা করলেই বা কি করা যাবে? এ রকম রাত্রে যে যুগেযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে ওঠে, তার অবাধ্য মন যে এই সব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে মহাকোট্‌ঠি বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানসসুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য সে-ই কি দায়ী।

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙ্গা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল, উৎসব-প্রত্যাগত নর-নারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রদ্যুম্নের গতি দ্রুত হ'ল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখলে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো প'ড়ে তার সর্বাঙ্গে আলো-আঁধারের জাল বুনেছে। প্রদ্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে ব'লে উঠল—আর একটু হলেই বেশ হ'ত! গাছের তলা দিয়ে চ'লে যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না!

সুনন্দাকে দেখে প্রদ্যুম্ন মনে মনে ভারি খুশী হ'ল, মুখে বললে—নাঃ, তা আর দেখব কেন? ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে! আর না দেখতে পেলেই বা কি? আমি তোমার ওপর ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বলছি।

সুনন্দা বললে—দোষ করবেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে! সেদিন কি কথা বলেছিলে মনে আছে? তা না, যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি ক'রে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।

প্রদ্যুম্ন বললে—তুমি বড়মানুষের মেয়ে—তোমার কথাই আলাদা—কিন্তু কথাটা কি ছিল বলছিলে?

সুনন্দা বললে—যাও! আর মিথ্যে ভানে দরকার নেই। কি কথা মনে ক'রে দেখ। সেই সেদিন বললে না?

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে ব'লে উঠল—বুঝতে পেরেছি—সেই বাঁশী?

সুনন্দা অভিমানের সুরে বললে—ভেবে দেখ বলেছিলে কিনা। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে ব'সে আছি! এক্ষে ত এলেন বেলা ক'রে, তার ওপর—যাও!

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে তো আমায় ডাকলে না কেন?

সুনন্দা বললে—আমি কি একা ছিলাম? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি ক'রে ডাকব?

প্রদ্যুম্ন বললে—আচ্ছা ধ'রে নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বলছ সুনন্দা,—সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবন্তী থেকে একজন বড় বীণবাজিয়ে আসবেন; তুমি তো জানো, আমার অনেক দিন থেকে বীণ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায়?

সুনন্দা বললে—বাবা তিন চার দিন হল কৌশাম্বী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে—ওহো তাই! নইলে আমি ভাবছি এত রাত পর্যন্ত সুনন্দা কি—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বললে—চুপ চুপ, তোমার কি এতটুকু কণ্ডজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে!

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বললে—এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে ব'লে দেব নিশ্চয়—

সুনন্দা রাগের সুরে বললে—দিও ব'লে। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে নিলে, তারপর বললে—আচ্ছা থাক্, ব'লে দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই, আমার সঙ্গেই আছে—সত্যি বলছি, তোমায় শোনাবার জন্যেই এনেছিলাম। তবে ওঁকে খুঁজছিলাম, বীণটা ভালো ক'রে শিখব ব'লে।

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সে বাঁশী বাজাল বটে, কিন্তু সে যেন ভাসা-ভাসা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। তারা দুজনে নির্জনে আরও কতবার বসেছে, প্রদ্যুম্নের বাঁশী শুনতে সুনন্দা ভালোবাসত ব'লে প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত, বাঁশীটি সঙ্গে আনত। প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্যে দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রৌদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি!

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আসছিল সেই জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা। তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন! পুরাতন পুঁথির ভূর্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং!

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাস। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড় একটা কেউ আসত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় সাত-

আট মাস হ'ল সেখানে বাস করছেন। তাঁর দু'চার জন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত যেত ব'লে মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালো আছে।

অর্ধ-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—চল, বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভালো ক'রে দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন—হবে, তোমার দ্বারাই হবে! আমি তা জানতাম।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের মূর্তি দূর থেকে দেখে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করলে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বললে—আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আসবে। হ্যাঁ, তোমার পিতা তো এক-জন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে—একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।

সুরদাস উৎসাহের সুরে বললেন—পারা তো উচিত। তোমার বাবাকে জানত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি উৎসবেই কৌশাম্বী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণ-পত্র আসত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘ-মল্লার আলাপ করতে পার!

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে—বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘ-মল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

সুরদাস বললেন—কই দেখি তুমি কেমন শিখেছ?

বাঁশী সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকত। কখন কোন্ সময়ে সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশী বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন ক'রে রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুলফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্না-রাতের মর্ম ফেটে যে রসধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে পড়ছে, তার বাঁশীর গানে সে-রস যেন মূর্ত হয়ে উঠল; সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশি কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জানতাম।

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অন্যান্য দু'এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে, সুরদাস তাকে বললেন—শোন প্রদ্যুম্ন, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব ব'লে পূর্বেও আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম; তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে একদিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বলবেন?

সে বললে—কি কথা না শুনে কি ক'রে—

সুরদাস বললে—তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হলে আমি তোমাকে বলতাম না।

কি কথা জানবার জন্যে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা করলে সুরদাসের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন—নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে জানো? তার সামনেই বড় মাঠ। ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীনকালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল; শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ ক'রে সকলেই আগে ওই মন্দিরে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না ক'রে ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেক দিনের কথা; তার পর মন্দির ভেঙে-চুরে ওই দাঁড়িয়েছে। ঐ ঢিবিতে ব'সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এ সংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার তাঁকে আনতে পারা যায়, তবে তাঁর বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সঙ্গীত সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বলছিলাম, সামনের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা ক'রে দেখব, তুমি কি বল?

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গেল। তা কি ক'রে হয়? আচার্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া—এ কি সম্ভব?

প্রদ্যুম্ন চুপ ক'রে রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে কি তোমার অমত আছে?

প্রদ্যুম্ন বললে—সে জন্যে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, এটা কি ক'রে সম্ভব যে—

সুরদাস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সামনের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা ক'রে রাখি।

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা রাখবেন, আমি আসব।

সুরদাস বললেন—বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার ক'রে এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে ব'লে দেবো।

প্রদ্যুম্ন আর একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে। তারপর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরল।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং। শ্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য বসুব্রত বলেন বটে……

ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-তমাল বনে সেবার ঘনঘোর বর্ষা নামল। সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘবরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট-রজনীর ঘনান্ধকার তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত!

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর ঘাটে গেল। তারা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান ক'রে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে এক-

জন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পূজোর আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে অন্ধকার রাতে এক-জন প্রায়-অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হ'ল।

সুরদাস বললেন—প্রদ্যুম্ন, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।

তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রদ্যুম্নের ভালো লাগল না। কিন্তু তবু সে ব'সে একমনে বাঁশীতে মেঘ-মল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনে মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নাই। শালবনের ডালপালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে! বড় মাঠের পারে শাল-বনের কাছে দিক্‌চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার পুষ্পশয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দসঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সাদা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল। প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্না-বরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী। তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তমকলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে.....হাঁ. এই তে দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গলঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্যতৃষ্ণা সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠেছে, এঁর আশীর্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্যসম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী।

প্রদ্যুম্ন চেয়ে থাকতে থাকতে দেবীর মূর্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার ম্লান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রদ্যুম্নের কেমন একটা মোহের ভাব দূর হ'ল না। সে যা দেখলে—এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল। সুরদাস বললে—আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার—কেমন, আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?

সুরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন বোধ হতে লাগল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে, তাঁর চোখ দুটো যেন অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হ'ল পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হল্‌দে রং-এর; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড় পার হ'তে অনেকটা সময় লাগল। তারপর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা

আরম্ভ হ'ল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা নিবিড় হয়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুতপদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথম যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথম সে ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে সে বুঝলে যে, সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয়, বরং……কৌতূহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যে পিপ্পল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এ কি! এ'কেই তো সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী তো!

অদ্ভুত! সে দেখলে যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, সেই অপরূপ দ্যুতি-শালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোনাকী পোকার হুল থেকে যেমন আলো বার হয়—তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে, তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্ধনিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিপ্পল গাছ-গুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপন্নের মত।

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে নইলে এ কি কাণ্ড!

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে এসে পৌঁছল, ম্লান চাঁদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে সে স্বপ্ন দেখলে—ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন ; তিনি যতই উপরে ওঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হয়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্‌রে রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে……ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দাঁত বার ক'রে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত!

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য পূর্ণবর্ধনের কাছে গিয়ে সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আচার্য পূর্ণবর্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মঠের ভিক্ষুকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—একথা আগে জানাওনি কেন?

—তিনি নিষেধ করেছিলেন—আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—

—বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন?

—এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।

পূর্ণবর্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—এই রকম একটা কিছু ঘটবে তা আমি জানতাম। পদ্মসম্ভব আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের

ধর্মকর্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা না করতে পারে এমন কোন কাজই নেই—আর আমি বেশ দেখছি প্রদ্যুম্ন যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্বনাশের মূল হবে। তুমি কাল রাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করবার সহায়তা করেছ।

এবার প্রদ্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হ'ল না। পূর্ণবর্ধন বললেন—এই সব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই আমি বিহারের কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, কিন্তু যাক্, তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি। আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কি রকম বল দেখি?

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্ধন বললেন—আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তার নাম সুরদাস নয় বা তার বাড়ী অবন্তীতেও নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্যসিদ্ধির জন্য তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে—

প্রদ্যুম্ন অধীর ভাবে বলে উঠল, কিন্তু আপনি যে বলেছেন—

পূর্ণবর্ধন বললেন, সে ইতিহাস বলছি শোন। নদীর ধারে যে সরস্বতী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু'শত বৎসর পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত। তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘমল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হয়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়ক মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই ঢিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘ-মল্লার-সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তারপর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা ক'রে বসে। সরস্বতী দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নির্গুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্যত তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, অনেক জীবন ধ'রে সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিত হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেই জানেন। আমি অনেকদিন তারপর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জানতাম না। ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক্ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কিনা, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিল:—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবংবাদী মহাসমনো...

যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় আমগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রত হরিণচর্মের আসনে ব'সে বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখল—সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্যন্ত নেই। দু'একটা যবাগুপানের ঘট, আগুন জ্বালবার জন্যে সংগৃহীত কিছু শুক্‌নো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়ানো প'ড়ে আছে।

সেইদিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিল, সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশে যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই এক বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশমত ভগবান্ তথাগতের মূর্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম ক'রে তিনি যে মূর্তি গড়ে তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্তি, তা সে দেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশীলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ ক'রে উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন!

মহাকোট্‌ঠি বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুব্রত "বুদ্ধ ও সুজাতা" নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত ক'রে এঁকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওদিকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে ঊরুবিল্ব গ্রামের কাছে একটা নির্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় ঊরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তের একটা বড় বট-গাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশে মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক্ করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মত জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক বনাহংস তার জলে খেলা করছে।

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মত জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘটকক্ষে এক স্ত্রী-লোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার একদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই তো! এই তো তিনি! ভদ্রাবতীর তীরে শালবনে ইনিই তো পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোস্নারাতে এঁকেই তো সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন, আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান—সে রোজ ব'সে দেখে।

এই রকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময় দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তারপর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন, তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিয়ে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন, ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী কেমন একপ্রকার বিহ্বল চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বল্‌লেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে একা থাকেন?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তিনি কি

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মত জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘটকক্ষে এক স্ত্রী-লোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার একদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই তো! এই তো তিনি! ভদ্রাবতীর তীরে শালবনে ইনিই তো পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোস্নারাতে এঁকেই তো সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন, আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান—সে রোজ ব'সে দেখে।

এই রকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময় দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তারপর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন, তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিয়ে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন, ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী কেমন একপ্রকার বিহ্বল চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বল্‌লেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে একা থাকেন?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তিনি কি

করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চ'লে যান,—পাঁচ-ছদিন পরে আসেন। তুমি এখানে ব'সো।

দেবী মাটির ঘর পূর্ণ ক'রে তাকে যবাগূ পান করতে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মত, এমন সুস্বাদু যবাগূ সে পূর্বে কখনো পান করেনি।

প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, যদি আচার্য পূর্ণবর্ধনের কথা সত্য হয়, আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেছে তা ইন্দ্রজাল না হয়, তবে এই তো দেবী সরস্বতী তার সামনে। তার জানবার কৌতূহল হ'ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন!

সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন? আপনার দেশ কোথা?

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে সূপ ও অন্ন পরিবেশনে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কথা বলছ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় প'ড়ে ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন! সেই থেকে এখানেই আছি—তার আগে কোথায় ছিলাম তা' আমার মনে পড়ে না।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে যেখানে ঊরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তরে বনরেখার মাথার সূর্য হেলে পড়েছেন, সেই দিকে চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে কি মনে আনবার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না। হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপড়ির মত চোখ দুটি বেয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল ঝরে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রদ্যুম্নের সামনে অন্নে পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন—খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী ক'রে খেতে দেব। সকালে যেও।

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আসছিল।.....ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক কণা ধুলোরও যোগ্য নয়, সে দেশের পথের ধুলো এমন কি পুণ্য করেছে মা, যে তুমি সেখানে প'ড়ে থাকতে যাবে?

খাওয়া শেষ হ'লে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল, বললেন—থাকো না কেন রাত্রে! আমি রাত্রে পায়স রেঁধে দেব।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—আপনার এখানে একা রাত্রে থাকতে ভয় করে না?

—খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না, সমস্ত রাত ব'সেই থাকি।

প্রদ্যুম্নের হাসি পেল, ভাবলে রাত্রে একা থাকতে ভয় করে ব'লে পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখতে চান। সে বললে,—আচ্ছা রাত্রে থাক্‌ব।

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'ল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় ব'সে কাটালে। দেবীও কাছে ব'সে রইলেন। বললেন—এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আসতে পারিনে, ঘরের মধ্যে ব'সে রাত কাটাই।

দেবীর ব্যাপার দেখে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হ'লেই বা মন্ত্রশক্তি, এতটা আত্মবিস্মৃত হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় চাইলে।

দেবী ব'লে দিলেন—সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার এস।

সেই দিন থেকে প্রতি রাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে ব'সে কুটীরের দিকে

চেয়ে পাহারা রাখত। তার তরুণ বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে একা বনের মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ-পনের দিন কেটে গেল।

এক-একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাত্রে একা গান গাইছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণধারার আদিম ঝর্ণার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন পথিক তারার গান।

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বললে—তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা বলছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করছে।

শুনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পুকুরের ধারে উপস্থিত হ'ল। দেখলে সত্যই গুণাঢ্য, পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে উপরে উঠে প্রদ্যুম্নকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি এখানে?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমি কেন তা বুঝতে পারেন নি?

গুণাঢ্য বললেন—তুমি এখন বলছ ব'লে নয় প্রদ্যুম্ন, আমি এ-কাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতি রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বলছে, তুই যে কাজ করেছিস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যই আজ এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে মনে করলে আমি যাকে ইচ্ছে বাঁধতে পারি, কিন্তু আনতে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধনশক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্যে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই, এলে তারপর মন্ত্রে বাঁধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে, এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতূহলেই আমি এ কাজ করি।

প্রদ্যুম্ন বললে—এখন?

গুণাঢ্য বললেন—এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব মন্ত্রের বিরোধী শক্তিসম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোন উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—উপায় নেই কেন?

—যে ছিটিয়ে দেবে, সে চিরকালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। আমার পক্ষে দু'দিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ, মৃত্যুর পর হয়তো পরজগৎ আছে, কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর? তা আমি পারব না।

আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী দেবীর চোখ দু'টির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্মল প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে, একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দুখানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বললে—চলুন, আপনার সঙ্গে যাব, আমায় সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।

গুণাঢ্য বিস্ময় প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—বেশ ক'রে ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা

নয়। এ কাজ—

প্রদ্যুম্ন বলেল—চলুন আপনি।

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্তী হ'ল তখন গুণাঢ্য বললেন—প্রদ্যুম্ন, আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ, কোন মিথ্যা আশায় ভুলো না, এ থেকে তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুর হবে না—দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্য জড় হয়ে যাবে ; বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি নির্মম অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।

প্রদ্যুম্ন বললে—আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি?—কিছু না, চলুন।

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন রোদ বেশ প'ড়ে এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন—প্রদ্যুম্নকে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বললেন—এস, এস! আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো।

তিনি দু'জনকে খেতে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে কুটীরের মধ্যে চ'লে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—কই আমায় মন্ত্রপূত জল দিন তবে?

গুণাঢ্য বললেন—সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমায় আর কিছু বলবেন না, জল দিন।

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান ক'রে দু'জনকে খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হ'ল তখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। বেতসবনে ছায়া নেমে আসছে, রাঙা সূর্য আবার উরুবিল্ব গ্রামের উপর ঝুলে পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠল।

তারপর তিনি ঘটকক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরণায় জল আনতে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বললেন—আমি এখান থেকে আগে চ'লে যাই, তারপর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—

তিনি কুটীরের মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তারপর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চ'লে গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্ত্ম।

প্রদ্যুম্ন চারিদিকে চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবলে, ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে ব'সে বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়তো প্রবাসী পুত্রের কথাই ভাবছেন—মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্যে দেখতে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। ঐ পূর্ব আকাশের নবমীর চাঁদ কেমন উজ্জ্বল হয়েছে! মগধ যাবার রাজপথে গাছের সারির মাথায় একটা তারা ফুটে উঠল। বেতবনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রদ্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময়ে সে দেখলে—দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল ; দেবীকে আসতে দেখে সে তা হাতে তুলে নিলে।

দেবী কুটীরের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেকগুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল।

প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ন্যাসী কোথায়?

প্রদ্যুম্ন বললে—তিনি আবার কোথায় চ'লে গেলেন। আজ আর আসবেন না।

তারপর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে—মা, না জেনে তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্যে এতটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—শুনুন, আপনি বেশ ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি, আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?

দেবী বললেন—কেন, আমি ত বিদিশার পথের ধারে—

প্রদ্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতার মত দেবী চমকে উঠলেন।

প্রদ্যুম্ন দৃঢ়হস্তে আর এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্যে তার চোখের সামনে বাতাসে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ প্রসন্ন হিল্লোল ব'য়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল ; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল—বারাণসীতে [illegible]দের গৃহে সন্ধ্যার-আকাশে-বদ্ধ-আঁখি বাতায়নপথবর্তিনী তার মা!

কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সামন্তদাসের মেয়ে। পিতা-মাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয় নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জন পাষাণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে প্রায়ই কি ভাবত ; মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত, যেন কতদিন আগে তার যে প্রিয় আবার আসবে ব'লে চ'লে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুণে গুণে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথচাওয়া······প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এরকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল—কেউ এল না···তবু মেয়েটি ভাবত, আসবে ······আসবে, কাল আসবে······পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত—এতদিনে বুঝি এল!

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকানো এক অর্ধভগ্ন পাষাণমূর্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে সির্‌সির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষাণমূর্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবল বাজছে মেঘ-মল্লার!······

ভোরে উঠে রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেত—কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্তি, কিসের এসব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!

প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩০

মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন।

গাড়ী ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এখনও ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে নি, এ নিয়ে গাড়ীর লোকজনের নানা রকম মতামত চলেছে।

—মশাই বড়গেছে নেমে যাব প্রায় পাঁচ মাইল। চারটে বাজে—এখনও গাড়ী ছাড়বার নামটি নেই—কখন বাড়ী পেঁছব ভাবুন তো?

—এদের কাণ্ডই এই রকম—আসুন না সবাই মিলে একটু কাগজে লেখালেখি করি। সেদিন বড়গেছে ইস্টিশানে দুটো ট্রেনের লোক এক ট্রেনে পুরলে—দাঁড়াবার পর্যন্ত জায়গা নেই—তাও কদমতলায় এল এক ঘণ্টা লেট্।

—ঐ আপিসের সময়টা একটু টাইমমত যায়—তার পর সব গাড়ীরই সমান দশা—

—আঃ, কি ভুল যে করেছি মশাই এই লাইনে বাড়ী করে! রিটায়ার করলাম, কোথায় বাড়ী করি, কোথায় বাড়ী করি, আমার শ্বশুর বললেন, তাঁর গ্রামে বাড়ী করতে—

—সে কোথায় মশাই?

—এই প্রসাদপুর, যেখানে প্রসাদপুরের ঠাকুর আছেন, মেয়েদের ছেলেপুলে না হলে মাদুলি নিয়ে আসে, হাওড়া ময়দান থেকে পঁচিশ মাইল, বেশী না। ভাবলাম কলকাতার কাছে, সস্তাগণ্ডা হবে, পাড়াগাঁ জায়গা, শ্বশুরবাড়ীর সবাই রয়েছেন—তখন কি মশাই জানি? তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী করলুম, দেখছি যেমনি ম্যালেরিয়া তেমনি যাতায়াতের কষ্ট, পঁচিশ মাইল আসতে পঁচিশ খেলা খেলছে। এই স্টুপিড গাড়ীগুলো—

—পঁচিশ কি স্যর, তিন পঁচিশং পঁচাত্তর খেলা বলুন। আমারও পৈতৃক বাড়ী ঐ প্রসাদপুরের কাছে নরোত্তমপুর। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি, কান্না পায় এক-এক সময়—

আমি যাচ্ছিলাম চাঁপাডাঙ্গা; লাইনের শেষ স্টেশন। এদের কথাবার্তা শুনে ভয় হলো। স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে দামোদর নদীর এপারেই আমার এক মাসীমা থাকেন, মেসোমশায় নাকি মৃত্যুশয্যায়, তাই চিঠি পেয়ে মাসীমার সনির্বন্ধ অনুরোধে সেখানে চলেছি। যে রকম এরা বলছে, তাতে কখন সেখানে পেঁছব কে জানে?

কামরার এক কোণের বেঞ্চিতে একটি যুবক ও তার সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসে ছিল। মেয়েটির পরনে সিল্কের ছাপা-শাড়ী, পায়ে মাদ্রাজী চটি, মাথার চুলগুলো যেন একটু হেলাগোছা ভাবে বাঁধা—সে জানালা দিয়ে বাইরের

দিকে চেয়ে ছিল। যুবকটি মাঝে মাঝে সকলের কথাবার্তা শুনছে, মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে ধূমপান করছে।

গাড়ী ছেড়ে তিন-চারটে স্টেশন এল। পান, পটল, আলু, মাছের পুঁটুলিহাতে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল রুমে নেমে যাচ্ছে। বাকি দল এখনও সামনা-সামনি বেঞ্চিতে মুখো-মুখি বসে কোঁচার কাপড় মেলে তাস খেলছে। মাঝে মাঝে ওদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে এঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ ভেদ করে—টু হার্টস! নো ট্রাম্প! থ্রি স্পেডস!

যখন জাঙ্গিপাড়া গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে তখন বেলা যায়-যায়। জাঙ্গিপাড়া স্টেশনের সামনে বড় দীঘিটার ধারের তালগাছগুলোর গায়ে রাঙা রোদ।

শেষ ডেলি প্যাসেঞ্জারটি জাঙ্গিপাড়ায় নেমে যাওয়াতে গাড়ী খালি হয়ে গেল—একেবারে খালি নয়, কারণ রইলাম কেবল আমি। কোণের বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেখি সেই যুবক ও তার সঙ্গিনী মেয়েটিও রয়েছে।

এতক্ষণ ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব শুনতে শুনতে আসছিলাম বেশ, এখন তারা সবাই নেমে গিয়েছে, আমি প্রায় একাই—এখন স্বভাবতই যুবক ও মেয়েটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। মেয়েটি বিবাহিতা নয়। সে তো বেশ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে ওদের সম্বন্ধ কি ভাইবোন? কিংবা মামা-ভাগ্নী? মেয়েটি বেশ সুন্দরী। ছোকরা মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে না তো? আশ্চর্য নয়। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড তো?

যাকগে, আমার সে-সব ভাবনার দরকার কি? নিজের কি হবে তার নেই ঠিক। সন্ধ্যা তো হয়ে এলো। মাসীমাদের গ্রাম স্টেশন থেকে দুই-তিন মাইল, পথও সুগম নয়। ট্রেন আঁটপুর এসে দাঁড়াল, জাঙ্গিপাড়ার পরের স্টেশন। তারপর ছাড়ল। বড় বড় ফাঁকা রাঢ়দেশের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে, লাইনের ধারে ক্বচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষাগাঁ। লাউলতা চালে উঠেছে। একটা ছোট্ট গ্রাম্য হাট ভেঙ্গে লোকজন ধামা-চেঙারি মাথায় ফিরছে—আবার মাঠ, জামগাছের মাথায় কালো বাদুড় উঠে এসে বসেছে, খালের পারে মশাল জেবলে জেলেরা মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

আবার সহযাত্রীদের দিকে চাইলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। কিন্তু দুজনেই জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে। একটা কথাও শুনলাম না ওদের মধ্যে।

ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পালাতে দু-জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে! বেশ সুন্দর চেহারা দুজনেরই। না, মামা-ভাগ্নী বা ভাইবোন নয়। নিয়ে পালানোই ঠিক। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবে ওরা? মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন তো আর দুটো স্টেশন গিয়ে রাঢ়দেশের অজ পাড়াগাঁ আর দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে শেষ হয়েছে। এ দুটি শৌখীন পোশাক-পরা তরুণ-তরুণীর পক্ষে সে অঞ্চল নিতান্ত খাপছাড়া ও অনুপযোগী।

যাক গে, আমার কেন ও-সব ভাবনা?

পিয়াসাড়া স্টেশনের সিগন্যালের সবুজ আলো দেখা দিয়েছে। সামনে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। রাঢ়দেশের মাঠের উপর দিয়ে রাস্তা, সঙ্গে ব্যাগে কিছু টাকাকড়ি আছে, শুনেছি হুগলী জেলার এদিকে চুরি-ডাকাতি নাকি অত্যন্ত বেশী। মেসোমশায়ের চিকিৎসার জন্যে মাসীমা কিছু টাকার দরকার বলে লিখেছিলেন। মা-ই টাকাটা দিয়েছে। ধনেপ্রাণে না মারা পড়ি শেষকালে!

হঠাৎ আমার সহযাত্রী যুবকটি আমার দিকে চেয়ে বললে—চাপাডাঙ্গা ইস্টিশান থেকে নদীটা কত দূরে বলতে পারেন স্যার?

—নদী প্রায় আধ মাইল।

—নৌকা পাওয়া যায় খেয়ার?

—এখন নদীতে জল কম। তবে নৌকোও বোধ হয় আছে।

যুবকটি আর কোনো কথা না বলে আবার বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হলো, একবার জিজ্ঞেস করে দেখি না ওরা কোথায় যাবে। কিন্তু ওদের দিক থেকে কথাবার্তার ভরসা না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

পিয়াসাড়া স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বিশেষ কেউ নামল উঠল না, ছোট স্টেশন। যুবকটি আমায় জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, স্যার, ওপারে গাড়ী পাওয়া যায়?

আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম—কি গাড়ীর কথা বলছেন?

—এই যে-কোন গাড়ী—মোটর-বাস কি ঘোড়ার গাঁড়ী!

লোকটা বলে কি! এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের জন্যে মোটরের বন্দোবস্ত করে রাখবে কে বুঝতে পারলাম না। বললাম—না মশায়, যতদূর জানি ও-সব পাবেন না সেখানে। পাড়াগাঁ জায়গা, রাস্তা-ঘাট তো নেই।

এবার ওদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অতি কষ্টে চেপে গেলাম।

কিন্তু যুবকটি পরমুহূর্তেই আমার সে কৌতূহল মেটাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ওখান থেকে তিরোল কতদূর হবে জানেন স্যার?

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম।

—তিরোল যাবেন নাকি? সে তো অনেক দূর বলেই শুনেছি। আমিও এদেশে প্রায় নতুন, ঠিক বলতে পারব না—তবে পাঁচ-ছ ক্রোশের কম নয়।

যুবকের মুখে উদ্বেগ ও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমার দিকে একটু এগিয়ে বসে বললে—যদি কিছু মনে না করেন স্যার, একটা কথা বলব?

তবে ইলোপমেণ্টই হবে। যা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তিরোলে কেন? সেখানে তো লোকে যায় অন্য উদ্দেশ্যে!

বললুম—হ্যাঁ, বলুন না—বলুন।

যুবকটি মেয়েটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে—ওকেই নিয়ে যাচ্ছি তিরোলে। পাগলা কালীর বালা আনতে ওরই জন্যে—আমার বোন, কাল অমাবস্যা আছে, কাল বালা পরা নিয়ম—

বাধা দিয়ে বললাম—মেয়েটি কি—

—চুপ করে আছে এখন প্রায় দু-মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সামলে রাখা কঠিন। এত রাত যে হবে বুঝতে পারি নি, সবাই বলেছিল স্টেশন থেকে বেশী দূর নয়—

—আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

—অনেক দূর থেকে স্যার, ধানবাদের কাছে সয়ালডি কলিয়ারি—এ-দিকের খবর কিছুই জানি নে—লোক যেমন বলেছে তেমনি শুনেছি—কি করি এখন? ঐ মেয়ে সঙ্গে, বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, বড় বিপদে পড়ে গেলাম যে!

চুপ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম।

ছোকরা বিপদে পড়ে গিয়েছে বেশ। ওর কথা শোনার পর থেকে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখছি, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপর দিকে কেমন একটু বাঁকান, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এই বিদেশে রাত্রিকালে মাঠের মধ্য দিয়ে পাঁচ-ছ ক্রোশ রাস্তা গাড়ী ভাড়া করে গেলেও বিপদ কাটল বলে মনে করবার কারণ নেই।

এক চাঁপাডাঙ্গাতে কোথাও থাকা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অপরিচিত লোকদের, বিশেষ করে যখন শুনবে যে মেয়েটি পাগল—তখন ওদের রাত্রে আশ্রয় দেবার মত উদারতা খুব

কম মানুষেরই হবে।

যুবকটিকে বললাম—চাঁপাডাঙ্গাতে কোন লোকের বাড়ী আশ্রয় নেবেন রাত্রে—তার চেষ্টা দেখব?

—না স্যার, ওকে অপরিচিত লোকের মধ্যে রাখতে পারব না, তা হলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে। আমি ছাড়া আর কারও কাছে থাবে না পর্যন্ত। যে-কোনও তুচ্ছ ব্যাপারে ও ভীষণ খেপে উঠতে পারে— সে-ভরসা করি নে স্যার—ওর সে মূর্তি দেখলে আমি ওর দাদা, আমি পর্যন্ত দস্তুরমত ভয় পাই—সে না দেখাই ভাল। ও অন্য মানুষ হয়ে যায় একেবারে—

চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

রাত্রির অন্ধকার এখনও ঘন হয়ে নামে নি, তবে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি, অনুমান করা যায়, কি ধরনের হবে আর একটু পরে।

চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনের কাছে লোকের বাড়ীঘর বেশী নেই। খানকতক বিচুলি-ছাওয়া ঘর, অধিকাংশ পান-বিড়ি, মুড়ি-মুড়কি কিংবা মুদিখানার দোকান। একটা সাইকেল-সারানোর দোকান। একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, ডাক্তারখানার এক পাশে স্থানীয় ডাকঘর। একটা পুকুর, পুকুরের ওপারে দু-একখানা চাষাভুষো লোকের ঘর।

আমরা টিকিট দিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম। সামনেই দুতিনখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী দেখে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল, কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম নদীর ধার পর্যন্ত তারা যায়, নদী পার হবার উপায় নেই গরুর গাড়ীর —তখন আমি আমার সঙ্গীটিকে বললুম—কি করবেন, নয়তো ইস্টিশানেই থাকবেন রাতে!

—না স্যার, কাল অমাবস্যা, আমায় তিরোল পৌঁছতেই হবে কাল। এখানে থাকলে কাজ হবে না। আপনি আর একটু কষ্ট করুন, আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে যখন পেয়েছি, ছাড়তে পারব না। আপনি না দেখলে কোথায় যাই বলুন!

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম।

ওদিকে মেসোমশায়ের অসুখ, সেখানে পয়সা-কড়ি নিয়ে যত শীগ্‌গির হয় পৌঁছনো দরকার। এদিকে এই বিপন্ন যুবক ও তার বিকৃতমস্তিষ্কা তরুণী ভগিনী। ছেড়েই বা এদের দিই কি করে এই অন্ধকার রাত্রে? তা হয় না। সঙ্গে যেতেই হবে, মেসোমশায়ের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা কিন্তু ভরসা দিল। তিরোলের বাঁধা রাস্তা, নদী পেরিয়ে গাড়ী পাওয়া যায়, পালকি পাওয়া যায় একটু খোঁজ করলেই, হরদম লোক যাচ্ছে সেখানে, ভয়ভীত কিছু নেই—নদীর খেয়া থেকে বড় জোর দু-ঘণ্টার রাস্তা।

নদীর ধার পর্যন্ত একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীতে আমরা তিনজন এলাম। সারা ট্রেনে মেয়েটি কথা বলে নি, অন্ততঃ আমি শুনি নি। ছইয়ের মধ্যে বসে সে প্রথম কথা কইল। যুবকটির দিকে চেয়ে বললে—দাদা, আমার শীত করছে—তোমার শীত করছে না?

সুন্দর গলার স্বর—যেন সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি সহানুভূতির চোখে তরুণীর দিকে চাইলাম, আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছে!

বললাম—শীত করতে পারে, নদীর হাওয়া বইছে—সঙ্গে কিছু আছে গায়ে দেবার?

যুবকটি বলে—না, গায়ে দেবার কিছু—ধরুন এ বোশেখ মাসে তো আনি নি—বিছানার চাদরখানা পেতে গাড়ীতে বসেছিলাম—ওখানা গায়ে দে—

মেয়েটি আবার বললে—কি নদী দাদা?

বেশ স্বাভাবিক সুরে সহজ ধরনের কথাবার্তা।

আমিই বললাম—দামোদর।

মেয়েটি এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বল্লভপুরে যে দামোদর? আমি জানি, খুব বড় নদী—না দাদা? ছেলেবেলায় দেখেছি—

যুবকটি আমায় বললে—দামোদরের ধারে বল্লভপুর বলে গ্রাম, বর্ধমান জেলায়, সেখানে আমার মামার বাড়ী কি না? পূর্ণিমা—মানে আমার এই বোন সেখানে দু-বার গিয়েছিল ছেলেবেলায়—তার পর—

খেয়ার নদী পার হবার সময় পূর্ণিমা ওর দাদাকে বললে—ভয় করছে দাদা—ডুবে যাবে না তো? ও দাদা—নৌকো দুলছে যে—

—ডুবে যাবি কেন? চুপ করে বসে থাক—দুলছে তাই কি?

ওপারে গিয়ে আমরা দেখি গাড়ীঘোড়া তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্যন্ত নেই। খেয়ার মাঝি লোকটা ভাল, সে আমাদের অবস্থা দেখে বললে—দাঁড়ান বাবুমশাইরা, শামকুড়ের গোয়ালপাড়ায় গরুর গাড়ী পাওয়া যায়—আমি ডেকে দিচ্ছি—আপনারা নৌকোতেই বসুন—

পূর্ণিমা বললে—দাদা, কিছু খাবে না? খাবার রয়েছে তো—

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনিও খান, খাবার অনেক আছে—

ওর দাদা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে না, ওঁকে দে—তুইও খা—কিছু তো খাস নি—পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা একটা ছোট্ট পুঁটুলি খুলে আমাদের সবাইকে লুচি, পটলভাজা, আলুচচ্চড়ি ও মিহিদানা পরিবেশন করে দিলে।

বললে—দেখ তো দাদা, মিহিদানা খারাপ হয়ে যায় নি?

আমি বললাম—এ কোথাকার মিহিদানা?

পূর্ণিমা বললে—বর্ধমান থেকে কেনা, আসবার সময়ে। খারাপ হয় নি? দেখুন তো মুখে দিয়ে—

আজ যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি এমন একটি সন্ধ্যার কথা. ভাবি নি যে দামোদর নদীর উপর নৌকাতে বসে একটি অপরিচিত যুবক ও একটি অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে খাবার খাব এভাবে। কেমন একটি শান্ত পরিবেশ, যেন বাড়ীতে মা-বোনের মধ্যেই আছি—বড় ভাল লাগছিল।

কিন্তু পরবর্তী মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ফেলে আজ যখন আবার সেই সন্ধ্যাটির কথা ও আমার সেই তরুণ সঙ্গীদের কথা এখন ভাবি—তখন মনে হয়, সেদিন তাদের সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভাল ছিল। একটা দুঃখজনক করুণ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচা যেত তাহ'লে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন সময় গরুর-গাড়ী নিয়ে খেয়ার মাঝি ঘাটের ধারে দামোদরের বিস্তৃত বালির চরে এসে হাজির হ'ল। তিরোল যাবার ভাড়া ধার্য করে আমরা গাড়ীতে উঠে পড়লাম, খেয়ার মাঝিকে তার পরিশ্রমের জন্যে কিছু বকশিশ দেওয়াও বাদ গেল না।

গাড়োয়ান বললে—বাবু, ভুল হয়ে গিয়েছে—বাড়ী থেকে তামাকের টিনটা নেওয়া হয় নি—গাড়ী গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই—বেশী দেরী হবে না বাবু—

শামকুড় গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকল। আমবাগান, বাঁশবন, লোকের বাড়ী-ঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা; ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা রান্না করছে, তার পর আবার মাঠ, আখের ক্ষেত, পাটক্ষেত, মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সাদা রাস্তা আমাদের সামনে বহুদূর চলে গিয়েছে। রাঢ়দেশের মাঠ, বনজঙ্গল খুব কম, এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে দু-চারটে কলাগাছ ছাড়া।

পূর্ণিমা আমায় বললে—আপনার মাসীমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর হবে?

—সে তো এদিকে নয়—দামোদরের ও-পারে। স্টেশনের পূর্বদিকে প্রায় দু' ক্রোশ দূরে—

—আপনাকে আমরা কষ্ট দিলাম তো!

—কি আর কষ্ট?.....আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে মাসীমার বাড়ী গেলেই হবে—

পূর্ণিমা মুখে আঁচল দিয়ে ছেলেমানুষি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে হঠাৎ। বললে —কি আর কষ্ট? না? আমাদের কাজ শেষ হলে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে—হি-হি-হি—

ওর হাসির অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করলে, এমন হাসি কোন দিন আমি হাসতে দেখি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এ অপ্রকৃতিস্থের হাসি। স্থিরমস্তিষ্ক মেয়ে হলে এ ধরনের হাসত না, অন্ততঃ এ জায়গায় ও এ অবস্থায়।

হঠাৎ ওর দাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার গা টিপলে।

ব্যাপার কি? আমার ভয় হ'ল। মেয়েটি ভাল অবস্থায় আছে তো? আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম। কি জানি মেয়েটির কেমন মেজাজ, কোন্ কথা তার মনে কি ভাবে সাড়া জাগাবে যখন জানি না তখন একদম কথা না বলাই নিরাপদ।

মনে মনে ভাবলাম, এমন সুন্দর মেয়ে কি খারাপ অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে যে তার অমন সুন্দর প্রাণভরা হাসি, তাতে মনে আনন্দ না এনে আনে ভয়?

গাড়ীতে কিছুক্ষণ কেউ কথা বললে না—সবাই চুপচাপ। মাঠ ভেঙে গরুর গাড়ী আপনমনে চলেছে, বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রাবেশ হয়ে থাকবে, হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে অন্ধকার, আমার মনে হ'ল সেই অন্ধকারের মধ্যে তরুণী এবং তার দাদার মধ্যে যেন একটা হাতাহাতি ব্যাপার চলছে।

তরুণীর মুখের কণ্টকর 'আঃ' শব্দ আমার কানে যেতেই আমি পেছন ফিরে চাইলাম ওদের দিকে, কারণ আমি বসেছি ছইয়ের সামনে, আর ওরা বসেছে গাড়ীর পেছন দিকটায়, সেদিকে বেশী অন্ধকার, কারণ ছইয়ের ও-দিকটা চাঁচের পর্দা আঁটা।

আমি কোন কথা বলবার পূর্বেই যুবকটি চাপা উদ্বেগের সুরে বললে—ধরুন, ওকে ধরুন, ও গাড়ী থেকে নেমে পড়তে চাইছে—

চাপা সুরে বলবার কারণ বোধ হয় গাড়ীর গাড়োয়ানের কানে কথাটা না যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে মেয়েটির গায়ে কি করে হাত দেব ভাবছি, এমন সময় যুবকটি বেদনার্ত কণ্ঠে 'উহু-হু-হু' বলে উঠল। পরক্ষণেই বললে—কামড়ে দিয়েছে হাত—ধরবেন না, ধরবেন না—

ততক্ষণে গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে ফেলেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে—কি বাবু? কি হয়েছে?

গাড়োয়ানের কথার উত্তর দেবার সময় বা সুযোগ তখন আমার নেই। কারণ মেয়েটি আমায় ঠেলে বাইরের দিকে আসতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে।

ওর দাদা বললে—ওর চুল ধরুন—গায়ে হাত দেবেন না, কামড়ে দেবে—

কিন্তু আমি কোন কিছু বাধা দেবার পূর্বেই মেয়েটি আমাকে ঠেলে গরুর গাড়ীর সামনের দিকে গিয়ে পৌঁছল এবং গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ল।

হতভম্ব গাড়োয়ান গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল নামাবার পূর্বেই আমি ও মেয়েটির দাদা দু-জনেই গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

মাঠের মধ্যে অন্ধকার তত নিবিড় নয়, কিন্তু মেয়েটির কোন পাত্তা কোন দিকে দেখা গেল না।

আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং বোধ হয় মেয়েটির দাদারও—

এই সময়ে কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সে ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে। তিরোল যারা যায়, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে অপ্রকৃতিস্থ থাকবেই, এ তথ্য তাদের অজানা নয়, তবে আমাদের তিন-জনের মধ্যে কে সেই লোক, এটাই বোধ হয় সে এতক্ষণ ঠাওর করতে পারে নি।

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি বললে—বাবু, শীগ্‌গির চলুন, কাছেই পাঁতিহালের খাল—সেদিকে উনি না যান, টিপকলের আলোটা জ্বালুন—

এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমরা যে যুবকের পকেটে টর্চ রয়েছে, সে-কথা দুজনের কারও মনে নেই।

সবাই ছুটলাম গাড়োয়ানের পিছু পিছু। প্রায় দু-রসি আন্দাজ পথ ছুটে যাবার পরে একটা সরু খালের ধারে পেঁছলাম, তার দু-পাড়ে নিবিড় কষার ঝাড়। তন্ন তন্ন করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুঁজে, চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সব ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে এতক্ষণে ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যায় নি জিনিসটার গুরুত্ব কতটা বা এ থেকে কত কি ঘটতে পারে।

পূর্ণিমার দাদা প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে বললে—আর কোন দিকে জলা আছে—হ্যাঁ গাড়োয়ান?

—না, বাবু, কাছেপিঠে আর জলা নেই তবে খালের ধারে আপনাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে থাকুন, আমরা বাকি দুজন অন্য দিকে যাই—

আমিই খালের ধারে রইলাম, কারণ যুবকটি একলা অন্ধকারে, যতদূর বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয়।

ওরা তো চলে গেল অন্য দিকে। আমার মুশকিল এই যে সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই। এই কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রের অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি জানি?

সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ঘণ্টাখানেক বোধ হয় হবে, তার বেশীও হয়ত। তারপর খালের ধার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলাম। এদের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি নে।

এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গলাটা শুনলাম—বাবু, বাবু—

আমার সাড়া পেয়ে ওরা আমার কাছে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম্য লোক—ওদের হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

ব্যস্তভাবে বললাম—কি হ'ল? পাওয়া গিয়েছে?

যার হাতে লণ্ঠন ছিল, সে-লোকটা বললে—চলেন বাবু। সব রয়েছেন তেনারা আমার বাড়ীতে বসে। আমি বাবু গোয়ালঘরে গরুদের জাব কেটে দিতে ঢুকেছি সন্দের একটু পরেই—দেখি গোয়ালঘরের এক পাশে একটি পরমাসুন্দরী ইস্ত্রীলোক। তখন আমি তো চমকে উঠেছি বাবু, ইকি! তারপর বাড়ীর লোক এসে পড়ল। তারপর এনারা গিয়ে পড়লেন। তাঁদের আমরা বাড়ীতে বসিয়ে আপনার খোঁজে বেরুলাম। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্দরলোকের ছেলের একি কষ্ট! চলুন গরীবের বাড়ী। দুটো ডাল-ভাত রান্না করে খান। দিদিঠাকরুণের মাথাটা ভাল যদি হ'ত একটু তো দিদিঠাকরুণ একেবারে লক্ষ্মীর পিরতিমে। আমাদের বাড়ীতে তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছে—আপনারা সবাই ব্রাহ্মণ শোনলাম—কতকালের ভাগ্যি আমাদের। দুটো ভাত সেবা করে আজ রাতে শুয়ে থাকুন—কাল ভোরে আমি আমার গাড়ীতে তিরোল পেঁছে দেব আপনাদের। অমন হয়।

গ্রামের মধ্যে লোকটার বাড়ী গিয়ে পেঁছলাম।

বাড়ীটার কথা এখানে একটু ভাল করে বর্ণনা করা দরকার। কারণ এর পরবর্তী

ঘটনার সঙ্গে এই বাড়ীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক-এক বার ভাবি সে-রাত্রে যদি সেখানে থাকবার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওদের নিয়ে সোজাসুজি তিরোল চলে যেতুম!

আসলে নিয়তি। নিয়তি যাকে যেখানে টানে। তিরোল গেলেই কি নিয়তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত? ভুল।

বাড়ীটা ও-দেশের চলনমত মাটির দেওয়াল, বিচুলিতে ছাওয়া। বাইরে বেশ বড় এক-খানা বৈঠকখানা, তার দুই কামরা, মাটির দেওয়ালের ব্যবধান। সামনে খুব বড় মাটির দাওয়া, তার সামনে উঠান—উঠানের পশ্চিম ধারে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। বৈঠকখানার দুটো কামরার মধ্যে যেটা ছোট, সেটার পেছনের দোর খুলে কিন্তু বাইরের উঠানে আসা যায় না—সেটি অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথ।

গৃহস্বামীর নাম রসিকলাল ধারা—জাতিতে কৈবর্ত। সুতরাং তাদের রাঁধা ভাত আমাদের চলবে না। রসিকলালের একান্ত অনুরোধে আমরা রান্না করতে রাজি হলাম। জিনিসপত্র, দুধ, শাকসব্জী ছ'জনের উপযোগী এসে পড়ল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রান্না করলে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা আবার সেই আগেকার শান্ত, স্বাভাবিক মূর্তি ধরেছে। তার কথাবার্তা, রান্নার কৌশল, সহজ ব্যবহার দেখে কেউ বলতেও পারবে না কিছুক্ষণ আগে এ গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল।

খেতে বসবার কিছু আগে পূর্ণিমা যেখানে রাঁধছে, সেখানে উঁকি মেরে দেখি গ্রামের অনেক মেয়ে ওকে দেখতে এসেছে, নানারকম কথাবার্তা জিগ্যেস করছে, বুঝলাম পূর্ণিমার কাহিনী গ্রামময় রটে গিয়েছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে, পূর্ণিমা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল খেতে।

আমি বল্লাম—সকলের সঙ্গে আলাপ হল, পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা সলজ্জ হেসে বললে—ওরা সব এসেছে কেন জানেন, নাকি আমায় সবাই দেখতে এসেছে। আমি বললাম, আমি ভাই আপনাদের মতই মেয়ে, দুখানা হাত, দুখানা পা, আমায় দেখবার কি আছে?

ওর দাদা বললে—আর কি কথা হ'ল?

—আর কিছু না। আমাদের বাড়ী কোথায়, আমার বয়স কত—এই জিগ্যেস করছিল।

তার পর বেশ দিব্যি সহজভাবেই বললে—আর বলছিল তোমার বিয়ে হয় নি? আমি বললাম, এ-বছর আমার বিয়ে দেবেন বলেছেন বাবা!

বলেই সে আমাদের পাতে ডাল না কি পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে।

আমি তো অবাক, ওর দাদার দিকে চাইতে সে বেচারী আমায় চোখ টিপলে। পাগল হোক, উন্মাদ হোক, মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাবে কোথায়? বড় কষ্ট হ'ল ভেবে, অভাগীর ও-সাধ এ জীবনে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু এ ধরনের দু-একটা বেফাঁস কথা ছাড়া পূর্ণিমার অন্য সব কথাবার্তা এমন স্বাভাবিক যে, কেউ তার মধ্যে এতটুকু খুঁত ধরতে পারবে না। ওর গলার সুরটা ভারি মিষ্টি—খুব কম মেয়ের গলায় এমন মিষ্টি সুর শুনেছি। এমন একটি সুন্দর চালচলন, নিজের দেহটা বহন করে নিয়ে বেড়ানোর সুশ্রী ধরন আছে ওর যে ওকে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে বলে কেউ ভাবতে পারবে না।

আমায় বললে—আপনাকে আমরা তো বড় কষ্ট দিলুম। আমাদের সয়লাডিতে যাবেন কিন্তু একবার দাদা—

—বেশ, যাব বইকি দিদি, নিশ্চয়ই যাব—

—এই পূজোর সময়েই যাবেন। আমাদের ওখানে দুখানা পূজো হয়, একখানা কলিয়ারীর বাবুরা করে আর একখানা বাজারে হয়। শখের থিয়েটার হয়—

ওর দাদা এই সময় বললে—আর একটা জিনিস দেখবেন—সাঁওতালের নাচ সে একটা

দেখবার জিনিস, আসুন পুজোর সময়—ভারী খুশী হব আমরা আপনি এলে।

পূর্ণিমা উৎসাহের সঙ্গে বললে—তাহলে কথা রইল কিন্তু দাদা। বোনের নেমন্তন্ন রাখতেই হবে আপনার—

এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে দুধ নিয়ে এসে পূর্ণিমাকে বললে—আমাদের সকলকে দুধ দিতে।

পূর্ণিমা বললে—তা হলে একখানা দুধের হাতা নিয়ে এস খুকী—ডালের হাতায় তো দুধ দেওয়া যাবে না।

পূর্ণিমার এই সমস্ত কথাবার্তার খুঁটিনাটি আমার খুব মনে আছে, কারণ পরে এই কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল।

আহারাদির প্রায় আধঘণ্টা পর আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—পূর্ণিমা তার দাদার সঙ্গে বাইরের ঘরের ছোট কামরাটায় এবং আমি বড় কামরাটায়।

এবার আমি নিজের কথা বলি। শরীর ও মন বড় ক্লান্ত ছিল—অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ পরে জানি নে এবং কেন তাও জানি নে, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বুকে যেন পাথরের ভারি বোঝা চাপিয়েছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। ভাবলুম, নিশ্চয়ই নদীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে কিংবা ওই রকম কিছু। অমন হয়। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি, এমন সময় আমার মনে হ'ল পাশের কামরায় কি রকম একটা কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে। হয়তো পূর্ণিমার দাদার নাক ডাকার শব্দ। অদ্ভুত রকমের নাক ডাকা বটে—যেন গোঙানি বা কাৎরানির শব্দের মত। একটু পরেই আর শব্দ শুনতে পেলুম না—আমিও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

পাশের কামরার দোর তখনও বন্ধ। আমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম। আধ ঘণ্টা বেড়ানোর পরে ফিরে এসে দেখি তখনও ওরা কেউ ওঠে নি—এমন কি বাড়ীর লোকও না! আরও আধঘণ্টা পরে গৃহস্বামী রসিক ধাড়া উঠে বাইরের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। আমায় বললে—ঘুমুলেন কেমন বাবু? মশা কামড়ায় নি? এঁরা এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি?

রসিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ চাষবাসের গল্প করলাম। তার পরে সে উঠে কোথাও বেরিয়ে গেল।

এদিকে প্রায় আটটা বাজল। তখনও পূর্ণিমা বা তার দাদার ঘুম ভাঙে নি। সাড়ে আটটার সময় রসিক ফিরে এল। গ্রীষ্মকাল, সাড়ে আটটা দস্তুরমত বেলা, খুব রোদ উঠে গিয়েছে চারিধারে। রসিক আবার জিজ্ঞেস করলে—এঁরা এখনও ওঠেন নি? আমি বললাম—কই না, ওঠে নি তো! গরমে সারারাতে ঘুম হয় নি বোধ হয়, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে আর কি।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। বেলা ন-টার সময়ও যখন ওদের সাড়া-শব্দ শোনা গেল না তখন আমি দরজায় ঘা দিলাম। ঘরের মধ্যে মানুষ আছে বলেই মনে হলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমি পশ্চিম দিকের ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম—ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে নিদ্রিতা, এ অবস্থায় জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে দ্বিধা বোধ করছিলাম কিন্তু একবার দেখাটা দরকার। ব্যাপার কি ওদের?

জানালা দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম বোধ হয়, ঠিক বলতে পারি নে। কারণ আমারও কিছুক্ষণের জন্যে বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, কি যে ঘটেছে, কি না ঘটেছে আমার খেয়াল ছিল না।

প্রথমেই আমার চোখে পড়ল—ঘরে এত রক্ত কেন? চোখে ভুল দেখলাম নাকি? কিন্তু পরমুহূর্তেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। ঘরে একখানা চৌকি পাতা, পূর্ণিমার

দাদা চৌকির উপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেঝেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেঝে ভাসছে—আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেঝের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না। একটা পাশবালিশ চৌকির ওপর থেকে যেন ছিটকে পূর্ণিমার দেহের কাছে পড়ে, সেটাও রক্তমাখা।

আমার চীৎকার অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছিল নাকি। লোকজন চারিধার থেকে এসে পড়ল। আমার জ্ঞান ছিল না, মাথায় জলটল দিয়ে আমায় সকলে চাঙ্গা করে দশ-পনেরো মিনিট পরে।

এদিকে দরজা ভেঙ্গে সকলে ঘরে ঢুকল। তারা দেখলে পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল—সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে পড়ে, পূর্ণিমার শাড়ী ব্লাউজে কিন্তু খুব বেশী রক্ত নেই, কেবল শাড়ীর সামনের দিকটাতে যেন ছিটকে লাগা রক্ত খানিকটা। হতভাগিনী রাত্রে কোন সময় এই বীভৎস কান্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোরে নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত, নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে, আমার যখন জ্ঞান হয়ে ঘরে ঢুকেছি তখনও। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।

নারীর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসমূর্তি সেই ভয়ানক প্রভাতে এক মুহূর্তে আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো—পলকে যে প্রলয় ঘটায়, এক হাতে দেয় প্রেম, অন্য হাতে আনে মৃত্যু, এক হাতে যার খড়্গ, অন্য হাতে বরাভয়।

অতঃপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পাড়ার লোক, গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। পুলিশ এল—আমি মেয়েটির অবস্থা সম্বন্ধে যা জানি খুলে বললাম। তাদের জেরার প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে আমার মনে হ'ল হয়তো বা আমিই পূর্ণিমার দাদাকে খুন করে থাকব। ঘুমন্ত মেয়েটির পাশ থেকে ওর দাদার মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম—মৃতের সকল চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র, বঁটি, বিছানা। উন্মত্ততায় ঘুম সহজে ভাঙে নি তাই রক্ষে—দুপুর পর্যন্ত পূর্ণিমা নিরুদ্বেগে ঘুমুল। পুলিশকেও কষ্ট করে ওর ঘুম ভাঙাতে হলো।

আমি ওর পাশে দাঁড়ালুম এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে। অসহায় উন্মাদিনীর আর কে ছিল সেখানে? যদিও ওর অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক সে-অঞ্চলে ছিল না, কি মেয়ে কি পুরুষ—এমন কি থানার মুসলমান দারোগাবাবু পর্যন্ত।...

সয়লাডি কলিয়ারীতে টেলিগ্রাম করা হলো। ওর বাবা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর তিনটি বন্ধু। ওঁদের মুখে প্রথম শুনলুম, পূর্ণিমা বিবাহিতা। পাগল বলে স্বামী নেয় না—সে কখনও জানে সে বিবাহিতা, কখনও আবার ভুলে যায়। পূর্ণিমার মা নেই তাও এই প্রথম শুনলাম।

ভদ্রবংশের ব্যাপার, এ নিয়ে খুব গোলমাল যাতে না হয়, শুরু থেকেই তার ব্যবস্থা করা হলো। খবরের কাগজে ঘটনাটি উঠেছিল—কিন্তু একটু অন্যভাবে। কয়েকটি প্রভাবশালী লোকের সহানুভূতি লাভ করার দরুণ ব্যাপারের জটিলতার হাত থেকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে রেহাই পেলাম।

পূর্ণিমাকে রাঁচি উন্মাদ আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। ওর বাবাও দেখলুম ওকে আর বাড়ী নিয়ে যেতে রাজি নন। শ্রীরামপুর কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে ওকে মোটরে সোজা আনা হলো হাওড়া। হাওড়া থেকে রাঁচি এক্সপ্রেসে যখন ওঠানো হচ্ছে—তখন একগাল হেসে ও আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের সয়লাডিতে আসবেন কিন্তু একদিন। মনে থাকবে তো?

ওর বাবাকে বললে—দাদা কোথায় বাবা? দাদাকে দেখছি নে। দাদার কাছে কানের

দুল দুটো খোলা রয়েছে, কান বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছে—

এ-সব কয়েক বছর আগের কথা। অনেকেই বুঝতে পারবেন আমি কোন্ ঘটনার কথা বলছি। মানুষ চলে যায়, স্মৃতি থাকে। জীবনের উপর কত চিতার ছাই ছড়ানো, সেই ছাইয়ের সূক্ষ্ম স্তরে বহু প্রিয়-পরিচিত জনের পদচিহ্ন আঁকা।

এই শ্যামলা পৃথিবী, রৌদ্রালোক, পরিবর্তনশীল ঋতুচক্রের আনন্দ থেকে নির্বাসিতা সে হতভাগিনীর কথা মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন ভাবি সে নেই, এত দিনে সুদূর রাঁচির উন্মাদ আশ্রমে তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান হয়ে গেছে—ভগবান আর ওকে কতকাল কষ্ট দেবেন?

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীর মধ্যে আমি সব কাল্পনিক নাম-ধাম ব্যবহার করেছি, কারণ সহজেই অনুমেয়।

সবাই মিলে বাসায় ফিরে এলাম।

এসেই দেখি ঝুমরির মা বাংলোর বারান্দাতে বসে। তার সঙ্গে নাহানপুর গ্রামের কয়েকটি লোক। নাহানপুর শোন নদের ধারে একটা গ্রাম—বেশির ভাগ গোয়ালার বাস এ গ্রামে। শোনের চরে গরু মহিষ চরিয়ে দুধ ঘি উৎপাদন করে। ডিহরি থেকে ঘি চালান যায়। এই নাহারপুর গ্রাম থেকেই তিনটি ছেলে হারিয়েছে গত পনেরো দিনের মধ্যে। ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি যে হয়েছে এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে, সেটাকে নিতান্ত অকারণ বলি কি করে।

একটা লোক এগিয়ে এসে বললে—কি হল বাবু?

আমরা বললাম—কিছু না, তোমরাও তো খুঁজছিলে।

—হাঁ বাবুজি। আমাদেরও কিছু না।

—তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

—বহুৎ দূর, বন-জঙ্গলের দিকে। সে সব দিকে তোমরা যেতে পারবে না। তোমরা চেন না সেদিক। পরে ওরা পরামর্শ করতে বসল। আমরা বাঙালী বাবু, লেখাপড়া-জানা, আমরা কি দিই পরামর্শ ওদের? পনেরো দিনের মধ্যে তিনটি ছেলে উধাও। এখানে বাস করা দায় হয়ে উঠল। ডিহিরি শহর এখান থেকে অনেক দূর। প্রায় ন মাইল রাস্তা। সেখানে গিয়ে পুলিশের সাহায্য চাওয়া কি উচিত নয়?

আগের লোকটার নাম মন্নু আহীর। মন্নু বললে ওই অঞ্চলের হিন্দীতে—বাবু, জঙ্গল পাহাড় অঞ্চলের গাঁ। বেশী লোক থাকে না এক গাঁয়ে। দূরে দূরে গাঁ। এখানে এই রকম বিপদ হলে আমরা কি করে বাঁচি? আপনারা এসেছেন বেড়াতে, মজুমদার সাহেবের কুঠিতে আছেন, তবু কত ভরসা আমাদের। মজুমদার সাহেব বড়লোক, আসেন না আজকাল আর। আগে আগে যখন নতুন কুঠি বানালেন, তখন কত আসতেন।

ওরা সেদিন চলে গেল যখন, তখন রাত দশটা। বেশ দল বেঁধে মশাল জেবলে চলে গেল।

সতীশ গিরির দলপতিত্বে পরদিন হৈ হৈ করে হারানো ছেলে খুঁজতে বেরনো গেল। রোটাস গড়ে ওঠাই হত এবং ঠিক ছিল। কিন্তু একজন মহিষ-চরানো বৃদ্ধ রাখাল আমাদের বারণ করলে। ওখানে কি করতে যাবে বাবুজী, রোটাস গড়ে লোক থাকে না। চৌকিদার একজন আছে, সে সব সময় ওপরে থাকে না, নিচে নেমে আসে। ওখানে যাওয়া মিথ্যে।

বনের মধ্যে একস্থানে আমরা সেদিন বাঘের থাবার দাগ পেলাম। মহুয়া গাছের তলায় দিব্যি বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ। আমাদের মধ্যে একজন বললে—ওদের বাঘে নিচ্ছে না তো? যে বাঘের ভয় এদেশে—

হীরু বললে—তাই বা কি করে সম্ভব? বাঘ গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলে সেখানে তো পায়ের দাগ থাকত।

দুপুরে আমরা খেতে এলাম বাসায়। শোনের চরে বালুহাঁস শিকার করেছিল ধীরেন আজ সকালে, আমাদের বেরোবার আগে। দশ মিনিটের মধ্যে তিনটি। খুব মজা করে

হাঁসের মাংস খাওয়া যাবে সবাই মিলে।

সতীশ গিরি খাওয়ার সময়ে বললে—শিকার করা বর্বরের কাজ তা জান?

আমরা সবাই চুপ।

হীরু বললে—বাজার থেকে মাংস কিনে খাও নি কখনও?

সতীশ গিরি বললে—আমি দেখেশুনে তো সে জন্তুকে মারি নি। আমি না কিনলেও অপরে কিনত।

খাওয়াদাওয়ার পরে হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল। জন-কয়েক লোক এসে হাজির হল বাংলোর কম্পাউণ্ডে ব্যস্তসমস্ত ভাবে। সতীশ গিরি এগিয়ে গিয়ে বললে—কি হয়েছে? কি, কি?

ওরা বললে—আবার ছেলে চুরি গিয়েছে আজ।

আমরা সবাই অবাক। সতীশ বললে—আজ? কোন্ গাঁ থেকে?

—নাহানপুর থেকে দু মাইল ওদিকে। উনাও বলে একটা গাঁ। একটা ছোট ছেলে নিয়ে মা ফিরছিল গাঁয়ের বাইরের মাঠ থেকে। ছোট ছেলেটাকে এক জায়গায় ওর মা রাস্তার পাশে রেখে শালপাতা ভাঙতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে ছেলে নেই।

—বাঘের পায়ের দাগ?

—না বাবু।

—মানুষের?

—অত ভাল করে মেয়েমানুষ কি দেখেছে?

আমরা বাংলো থেকে সন্ধ্যের আগেই বেরিয়েছি। কত জায়গায় খুঁজলাম কিন্তু কোন পাত্তা পাওয়া গেল না খোকার। সেই বনবেষ্টিত পাহাড়-অঞ্চলে সন্ধ্যার পর বেরনো কত বিপজ্জনক আমরা জানি, কিন্তু তবু ছেলেটিকে খুঁজে এনে মায়ের কোলে দেওয়ার আনন্দ যে কত বড়! যদি পারা যায়, যদি খোকার মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারি!

কিন্তু এদিকে রাত হয়ে আসছে। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হীরু। বিদেশবিভুঁই জায়গা, জঙ্গলাবৃত পাহাড় চারিধারে। বাঘের ভয়ও আছে। বৈশাখ মাসের চড়া রোদে পাহাড় তেতে এমন আগুন হয়ে আছে যে একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয় না। তাও সত্যিকার ঠাণ্ডা হয় না। বিদেশে বেড়াতে এসে কি শেষে বাঘের পেটে যাব?

কথাটা ঠিক।

সতীশ মহারাজের কি! তার বাপ নেই, মা নেই। মরে গেলে কাঁদবে না কেউ। আমাদের তা নয়, আমাদের সবাই বেঁচে!

হীরু বললে—আজ কদিন হল আমরা এসেছি এখানে?

আমি বলি হিসেব করে—আজ তেরো দিন।

—আর কতদিন থাকা হবে?

—আর চার-পাঁচ দিন।

—কিন্তু এই হাঙ্গামাটা না চুকলে তো—

—সে তো বটেই।

হীরু বললে—ঘরের পয়সা খরচ করে বেড়াতে এসে কি ফ্যাসাদ!

ধীরেন একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে—কে জানত এমনতর হবে। তাহলে কি—

সতীশ আমাদের মধ্যে সাধু-প্রকৃতির লোক। অনেস্ট, সত্যবাদী, পরোপকারী—ওকে আমরা এইজন্যে সতীশ গিরি, কখনও সতীশ মহারাজ বলে ডাকতাম, অবিশ্যি ব্যঙ্গচ্ছলে।

সতীশ মহারাজ বললে—ওর মায়ের কান্না শোনবার পরেও একথা তোমরা বলতে পারলে?

ও মাঝে মাঝে আমাদের বিবেক জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা পায় এই ভাবে। সেদিন এক বুড়ি টোমাটো নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে ডেকে বললাম—এস টোমাটো কিনব। বুড়ি বাজার দর জানে না বোধ হয়। সে বললে—বাজারে তোমরা কত করে কেনো বাবুজি?

আমরা জানি ছ পয়সা বাজার-দর এক সের টোমাটোর। হীরু বললে—চার পয়সা দর বাজারে, দিবি?

বুড়ি দিয়ে গেল।

কিন্তু সতীশ গিরির তিরস্কারে সে টোমাটো আমাদের মুখে ওঠে নি সেদিন।

হীরুর নির্বুদ্ধিতা, সে গেল বাহাদুরি করতে তা নিয়ে খাবার সময়।

আমরা সবাই খেতে বসেছি। সতীশ মহারাজ গম্ভীরভাবে হেঁকে বললে—'টোমাটোর অম্বল আমার পাতে দিও না।' সবাই অপ্রস্তুত। যে রকম সুরে সে হেঁকে বললে, তার পর সেদিন আর উক্ত তরকারী কারও পাতে পড়তে পারল না। অসম্ভব। যাক গে, আজ কিন্তু সতীশ মহারাজের কথার প্রতিবাদ করলে ধীরেন। বললে—ঝুমরির মা দোর খুলে শুয়েছিল কেন রাত্তিরে?

সতীশ বললে—তাই কি?

--তা না হলে তো ছেলে হারাত না।

—সে নির্বোধ মেয়েমানুষ।

—তাহলে তার এমন হওয়াই উচিত। যখন সবাই জানে একথা যে, গাঁ থেকে বা এ অঞ্চল থেকে ছেলে চুরি যাচ্ছে প্রায়ই—

হীরু বললে—এইবার নিয়ে চারটি ছেলে এভাবে গেল।

ধীরেন বললে—হ্যাঁ, যখন তা সবাই জানে, তখন কি ওর উচিত হয়েছে রাতে দোর খুলে শোওয়া?

সতীশ বললে—এ গরমে করেই বা কি?

—তখন তার যাওয়াই উচিত। আমাদের দোষে তো যায় নি?

আমি ওদের থামিয়ে বলি—শোন, বাজে বকে লাভ নেই। ছেলে চুরি বা হারানো এ অঞ্চলে আমরা এসে পর্যন্ত শুনছি একথা ঠিক। তবু এসব দেশের গ্রাম্য লোকে অত সতর্ক হতে শেখে নি। পরের ছেলে হারিয়েছে—খোঁজবার চেষ্টা করা যাক, বিশেষ করে ওর মা আমাদেরই ঝি। যে কদিন আমাদের ছুটি বাকি আছে, খোঁজ, না পাই কলকাতায় যাবার সময় মনে অন্তত আমাদের ক্ষোভ থাকবে না। এ অজানা বন-জঙ্গলের দেশে আমরা এর বেশি আর কি—

আমাকে সবাই সমর্থন করলে।

সতীশ বললে—কাল চল রোটাস ফোর্টে উঠে দেখা যাক!

ধীরেন বললে—বড্ড সোজা কথা বললে। রোটাস ফোর্টে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। এ গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ওপরে জল নেই। বাঘ সেদিনও বেরিয়েছিল জঙ্গলে। ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলে ঐ বন ভেঙে নিচে নামতে পারব? আমাদের ঘরে বাপ-মা আছে সতীশদা!

আমি বললাম—তা ছাড়া রোটাস ফোর্টে পাহাড়ের ওপর ছেলে নিয়ে গিয়ে তুলবে কে? আমার মনে তো হয় না।

সতীশ বললে—দেখতে দোষ কি?

—তুমি বল যদি, আমি তোমার সঙ্গে যাব, সতীশ। তুমি ভাবতে পার এরা কষ্টের ভয়ে হয়তো যেতে চাইবে না। চল কাল সকালে।

হীরু ও ধীরেন নিজেদের ছোট করতে চায় না। তারা মুখে বললে, আমরাও যাব—কিন্তু মনে মনে বোধ হয় বিরক্ত হল আমার ও সতীশ মহারাজের ওপর।

গ্রামের লোকজন ডাকিয়ে আমরা তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিয়ে এক এক দিকে পাঠালাম। আমরা নিজেরাও বেরিয়ে পড়লাম। নাহানপুরের পথে, ডিহিরি যাবার পথে, শোন নদের ধারে। সব দিকে আমরা বলে দিয়েছি কোনও রকম সন্ধান পেলে যেন বাংলোতে এসে খবর দেওয়া হয়। সেখানে সতীশ মহারাজ স্বয়ং বসে। তাকে কোথাও যেতে দিই নি আমরা। কারও মুখে কোন রকম সন্ধান পেলে যেন বাংলোয় খবর দেওয়া হয়।

সারাদিন কেটে গেল। কেউ কোন খবর নিয়ে এল না। কোন পাত্তাই পাওয়া গেল

না হারানো ছেলের। সন্ধ্যার অনেক পরে আমরা পরিশ্রান্ত দেহে বাংলোর বারান্দায় প দিতে না দিতে সতীশ গিরির দুর্বার জেরা।...কাজে ফাঁকি আমরা দিয়েছি কিনা দেখে নেবে সতীশ। আমরা কি ওখানে গিয়েছিলাম? সেখানে গিয়েছিলাম? অমুক জঙ্গলের পথ কি দেখেছি? একটু চা খাব সারাদিন পরিশ্রমের পরে, তা কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই প্রাণান্ত হবার উপক্রম হল।

খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়া গেল। কাল সকালেই আবার নাকি বেরতে হবে। ধীরেন বললে—চল, পরশু আমরা এখান থেকে খসে পড়ি। আর এ ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না।

আরও দুদিন কেটে গেল। কোনও ছেলেরই পাত্তা পাওয়া গেল না। ঝুমরির মা কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, গ্রামের লোকজন এসে ফিরে যায়। আমরা কদিন খোঁজাখুঁজির পর ক্রমে আলগা দিলাম। ক্রমে আরও দিন কেটে গেল।

সেদিন আমরা জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে রওনা হয়ে পড়লাম। সিমেণ্ট পাহাড়ের গা কেটে পাথর নিয়ে যাচ্ছে ডিহিরিতে, সেই লরিতে আমরা চলেছি। জিনিসপত্র সমেত আমাদের ডিহিরি স্টেশনে পেঁছে দেওয়ার ভাড়া সাত টাকা ধার্য হয়েছে।

লরি ছাড়ল রাত আটটার সময়। পাথর বোঝাই করতে দেরি হয়ে গেল। পাহাড়-জঙ্গলের পথে বোঝাই লরি বেশি জোরে যেতে পারছে না, আমরা দিন কুড়ি পরে কলকাতায় ফিরছি, মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলেছি।

ডিম্‌হা ও বোচাহির পাহাড়ের কাছাকাছি পার্বত্য ক্ষুদ্র নদী পার হতে পাথর-বোঝাই লরির খানিকটা সময় লাগল। হাঁটুখানেক জল নদীতে। ঘন জঙ্গল দুধারে—হরীতকী, মহুয়া ও শাল। কি একটা পাখী কুম্বরে ডাকছে ডিম্‌হা পাহাড়ের ওপরকার বনে। লরি হু হু চলেছে।

এমন সময় লরিওয়ালা বলে উঠল—ও ক্যা বাবুজী? আমরা লরি-ড্রাইভারের পাশেই বসে। তখন দশটা, কোনদিকে লোকালয় নেই সেখানটাতে। চেয়ে দেখি, পথ থেকে রশি-দুই দূরে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। যেন কেউ আগুন পোয়াচ্ছে কি ভাত রেঁধে খাচ্ছে। আমরাও চেয়ে দেখলাম।...কে ওখানে?

কৌতূহল হল দেখবার জন্যে। লরি থামিয়ে রাস্তার একপাশে রাখা হল। আমি ও সতীশ গিরি এগিয়ে গেলাম। আমাদের পেছনে পেছনে ধীরেন, হীরু ও লরি-ড্রাইভার। যখন আধ রশি মাত্র দূরে আছে আগুন তখন আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম হঠাৎ।

অন্ধকার রাত। শোন নদের ধারের কাশচর দূর থেকে সাদা কাপড় পরা প্রেতের মত দেখাচ্ছে। ধীরেন বললে—শোনের ধারে যাস নে ভাই, ওদিকেই কাশবনে বাঘ থাকে। চল্ সিমেণ্টের পাহাড়ের ওপর। সতীশ মহারাজ গম্ভীরভাবে বললে—ওটা সিমেণ্টের পাহাড় নয়। সিমেণ্ট জিনিসটা বালির সঙ্গে আরও জিনিস মিশিয়ে তৈরি করতে হয়। ওটা বেলে পাথরের পাহাড়। যাকে বলে স্যাণ্ডস্টোন।...আমাদের মনের অবস্থা এখন সতীশ গিরির ভূতত্ত্ব-বক্তৃতা শোনবার অনুকূল নয়। আমরা আজ আর খুঁজতে রাজী নই। আর খুঁজবই বা কোথায়?

বড় সিমেণ্টের পাহাড়ের তলায় শালচারা আর কি কি গাছের বনজঙ্গল। সেদিন সন্ধ্যায় এখানে হায়েনার হাসি শোনা গিয়েছিল। সে হাসি গভীর রাত্রে শুনলে প্রেতের অট্টহাসির মত শোনায়; শহুরে ছেলে আমরা, আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। পাহাড়ের ওপর কলকাতার কোন্ ভদ্রলোকের এক বাংলো আছে। কিন্তু তিনি কোনদিন আসেন না। তাঁর বাড়ীর দরজা-জানলায় উই ধরেছে, কাঠের ফটকটা ভেঙে দুলছে কব্জার গায়ে। ভূতের বাড়ী বলে মনে হয় প্রথমটা! লোকে বলে ভূতও নাকি আছে। মহুয়া ফুলের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, বড় বড় মহুয়া গাছগুলোর তলায় পাতা পুড়িয়ে দিয়েছিল গত চৈত্র মাসে মহুয়া ফুল সংগ্রহ করবার জন্যে। পাতা-পোড়া ছাইয়ের গন্ধ বাতাসে। ছাইয়ের ওপর আবার পড়েছে শুকনো পাতার রাশ। খস খস করে কি একটা জন্তু পালিয়ে গেল তার ওপর দিয়ে।

ধীরেন চমকে উঠে বললে—ও কি রে?

আমি বললাম—কিছু না! শেয়াল হবে।
আমাদের চোখে যা পড়ল তা এই—

একটা বড় অগ্নিকুণ্ডের সামনে একজন লোক বসে কি করছে। দূর থেকেই মনে হল লোকটা দীর্ঘাকার—একটু অসম্ভব ধরনের দীর্ঘাকার। কি একটা নাড়ছে-চাড়ছে আগুনের সামনে বসে যেন।

সতীশ গিরি বললে—সন্নিসি।

আমাদের মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই সন্নিসি-টন্নিসি হবে। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে এই গভীর রাত্রে—আচ্ছা সন্নিসি তো! বাঘের ভয়ে দিনমানে এখানে মানুষ আসতে ভয় পায় যে!

আমরা এগিয়ে গেলাম আরও। লোকটাও বেজায় লম্বা—অগ্নিকুণ্ডের ধারে উবু হয়ে ব'সে লোকটা কি একটা আগুনের ওপর ধরে নাড়ছে-চাড়ছে। বেশ বড় ও কালো মত একটা কি। কি ওটা? আলো-আঁধারে সে জিনিসটা দেখাচ্ছে যেন একটা কালো কাপড়ের বাণ্ডিলের মত। আমাদের সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে। কি জিনিস ওটা?

হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। সেই কালো বাণ্ডিলের মত জিনিসটা থেকে যেন একটা ছোট হাত ঝুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সতীশ মহারাজ ও ধীরেন একসঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁ রে, ও তো একটা ছোট ছেলে।

আমরা তখন ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। অদূরে সেই অতি দীর্ঘাকার বিকটদর্শন লোকটাকে রাক্ষসের মত দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসীর সাজ বটে। দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক ওর কপালে, দীর্ঘ জটাজুট, এতখানি লম্বা দাড়ি পড়েছে বুকের ওপর।

লোকটা সামনে অগ্নিকুণ্ডের ওপর একটা ছোট ছেলেকে দুহাতে ধরে ঝলসাপোড়া করছে। বাতাসে মড়া পোড়ার বিকট দুর্গন্ধ।

আমরা কেউ এগোতে সাহস করলাম না। কারও মুখে কথাটি নেই। এই গভীর রাত্রি, নির্জন পাহাড়-জঙ্গল, কোথাও লোকালয় নেই কাছে। সম্মুখে এই নররাক্ষস। কেমন একপ্রকার আতঙ্কে আমরা সবাই মোহগ্রস্ত হয়ে চুপ করে আছি; এক পাও কেউ এগোয় না।

লোকটা আমাদের দেখলে কট্‌মট্‌ চোখে। তার পর যেন বিরক্তমুখে সেই আধ-ঝলসানো ছেলেটাকে কাঁধে ফেলে নিলে আমাদের চোখের সামনে,—ঠিক যেমন লোকে গামছা কাঁধে ফেলে সেই ভঙ্গিতে। তারপর ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে অন্ধকারে বনের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সতীশ গিরির মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে গেল একটা কথা—ছেলে ধরা।

বোমাইবুরুর জঙ্গলে

জঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সার্ভে হইতেছিল। কাছারি হইতে তিন ক্রোশ দূরে বোমাইবুরুর জঙ্গলে আমাদের এক আমীন রামচন্দ্র সিং এই উপলক্ষে কিছুদিন ধরিয়া আছে। সকালে খবর পাওয়া গেল রামচন্দ্র সিং হঠাৎ আজ দিন দুই-তিন হইল পাগল হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া তখনই লোকজন লইয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। বোমাইবুরুর জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, খুব ফাঁকা উঁচু-নিচু প্রান্তরে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, ডাল হইতে সরু দড়ির মত লতা ঝুলিতেছে, যেন জাহাজের উঁচু মাস্তুলের সঙ্গে দড়াদড়ি বাঁধা। বোমাইবুরুর জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে লোকবসতিশূন্য।

গাছপালার নিবিড়তা হইতে দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাশে-ছাওয়া ছোট্ট দুখানা কুঁড়ে। একখানা একটু বড়, এখানাতে রামচন্দ্র আমীন থাকে, পাশের ছোটখানায় তার পেয়াদা আসরফি টিণ্ডেল থাকে। রামচন্দ্র নিজের কাঠের মাচার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। আমাদের দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রামচন্দ্র ? কেমন আছ ?

রামচন্দ্র হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু আসরফি টিণ্ডেল সে কথার উত্তর দিল। বলিল, 'বাবু, একটা বড় আশ্চর্য কথা। আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না। আমি নিজেই কাছারিতে গিয়ে খবর দিতাম, কিন্তু আমীনবাবুকে ফেলে যাই বা কি করে ? ব্যাপারটা এই, আজ ক'দিন থেকে আমীনবাবু বলছেন একটা কুকুর এসে রাত্রে তাঁকে বড় বিরক্ত করে। আমি শুই এই ছোট ঘরে, আমীনবাবু শুয়ে থাকেন এখানে। দু-তিনদিন এই রকম গেল। রোজই ইনি বলেন—আরে কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর আসে রাত্রে। মাচার ওপর বিছানা পেতে শুই, কুকুরটা এসে মাচার নিচে কেঁউ কেঁউ করে, গায়ে ঘেঁষ দিতে আসে। শুনি, বড় একটা গা করি নে। আজ চারদিন আগে উনি অনেক রাত্রে বললেন—আসরফি, শিগগির এস বেরিয়ে, কুকুরটা এসেছে। আমি তার লেজ চেপে ধরে রেখেছি। লাঠি নিয়ে এস।

আমি ঘুম ভেঙে উঠে লাঠি-আলো নিয়ে ছুটে যেতে দেখি—বললে বিশ্বাস করবেন না হুজুর,

কিন্তু হুজুরের সামনে মিথ্যে বলব এমন সাহস আমার নেই—একটি মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলাম। তার পর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি আমীনবাবু বিছানা হাতড়ে দেশলাই খুঁজছেন। উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে?

আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে তো বার হয়ে গেল।

উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেয়াদবি? মেয়েমানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে দুপুর রাতে? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নিচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। নেশা করতে শুরু করেছ বুঝি? রিপোর্ট করে দেব সদরে।

পরদিন রাত্রে আমি সজাগ হয়ে ছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। যেই একটু ঘুমিয়েছি অমনি আমীনবাবু ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আমার ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়েছি, এমন সময় দেখি একটি মেয়ে ওঁর ঘরের উত্তর দিকের বেড়ার গা বেয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। তখনই হুজুর আমি নিজে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। অতটুকু সময়ের মধ্যে লুকোবে কোথায়, যাবেই বা কত দূর? বিশেষ করে আমরা জঙ্গল জরীপ করি, অন্ধি-সন্ধি সব আমাদের জানা। কত খুঁজলাম বাবু, কোথাও তার চিহ্নটি পাওয়া গেল না। শেষে আমার কেমন সন্দেহ হল, মাটিতে আলো ধরে দেখি কোথাও পায়েব দাগ নেই, আমার নাগরা জুতোর দাগ ছাড়া।

আমীনবাবুকে আমি একথা বললাম না আর সেদিন। একা দুটি প্রাণী থাকি এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে হুজুব। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আর বোমাইবুরু জঙ্গলের একটু দুর্নামও শোনা ছিল। ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, বোমাইবুরু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দূরে—একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না রাত্রে ঘোড়ায় করে জঙ্গলের পথে ফিবছিলেন; ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে বলে ওদের 'ডামাবাণু'—এক ধরনের জিনপরী, নির্জন জঙ্গলেব মধ্যে থাকে। মানুষকে বেঘোরে পেলে মেবেও ফেলে।

হুজুর, পরদিন রাত্রে আমি নিজে আমীনবাবুর তাঁবুতে শুয়ে জেগে রইলাম সারারাত। সারারাত জেগে জরীপের থাকবন্দীর হিসেব কষতে লাগলাম। বোধ হয় শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসে থাকবে—হঠাৎ কাছেই একটা কিসের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলাম—দেখি আমীন সাহেব ঘুমুচ্ছেন ওঁর খাটে, আর খাটের নিচে কি-একটা ঢুকেছে। মাথা নিচু করে খাটেব নিচে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আধ-আলো আধ-অন্ধকারে প্রথমটা মনে হল একটি মেয়ে যেন গুটি-সুটি মেরে খাটের তলায় বসে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে—স্পষ্ট দেখলাম, হুজুর, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। এমন কি, তার মাথায় বেশ কালো চুলের গোছা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখেছি। লণ্ঠনটা ছিল যেখানটাতে বসে হিসেব কষছিলাম সেখানে—হাত ছ' সাত দূরে। আরও ভাল করে দেখব বলে লণ্ঠনটা যেমন আনতে গিয়েছি, কি একটা প্রাণী ছুটে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পালাতে গেল—দোরের কাছে লণ্ঠনের আলোটা বাঁকা ভাবে পড়েছিল, সেই আলোতে দেখলাম একটা বড় কুকুর, কিন্তু তার আগাগোড়া সাদা, হুজুর, কালোর চিহ্ন কোথাও নেই তার গায়ে।

আমীন সাহেব জেগে বললেন—কি, কি? বললাম—ও কিছু নয়, একটা শেয়াল কি কুকর ঘরে ঢুকেছিল। আমীন সাহেব বললেন—কুকুর? কিরকম কুকুর? বললাম—সাদা কুকুর। আমীন সাহেব যেন একটা নিরাশার সুরে বললেন—সাদা ঠিক দেখেছ? না কালো? বললাম—না, সাদাই হুজুর।

আমি একটু বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়—সাদা না হয়ে কালো হলেই বা আমীনবাবুর কি সুবিধা হবে তাতে বুঝলাম না। উনি ঘুমিয়ে পড়লেন—কিন্তু আমার যে কেমন একটা ভয় ও অস্বস্তি বোধ হল, কিছুতেই চোখের পাতা বোজাতে পারলাম না। খুব সকালে উঠে খাটের নিচেটা একবার কি মনে করে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে সেখানে একগাছা কালো চুল পেলাম। এই সে চুলও রেখেছি, হুজুর। মেয়েমানুষের মাথার চুল। কোথা থেকে এল এ চুল? দিব্যি কালো কুচকুচে নরম চুল। কুকুর—বিশেষত সাদা কুকুরের গায়ে এত বড়, নরম কালো চুল হয় না। এ হল গত রবিবার অর্থাৎ আজ তিন দিনের কথা। এই তিন দিন থেকে আমীন সাহেব তো এক রকম উন্মাদ হয়েই উঠেছেন। আমার ভয় করছে হুজুর—এবার আমার পালা কিনা তাই ভাবছি।'

গল্পটা বেশ আষাঢ়ে-গোছের বটে। সে চুলগাছি হাতে করিয়া দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মেয়েমানুষের মাথার চুল, সে-বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ রহিল না। আসরফি টিণ্ডেল ছোকরা মানুষ, সে যে নেশা-ভাঙ করে না, একথা সকলেই একবাক্যে বলিল।

জনমানবশূন্য প্রান্তর ও বনঝোপের মধ্যে একমাত্র তাঁবু এই আমীনের নিকটতম লোকালয় হইতেছে লবটুলিয়া—ছয় মাইল দূরে। মেয়েমানুষই বা কোথা হইতে আসিতে পারে অত গভীর রাত্রে—বিশেষ যখন এই সব নির্জন বনপ্রান্তরে বাঘ ও বুনোশুয়োরের ভয়ে সন্ধ্যার পরে আর লোকে পথ চলে না?

যদি আসরফি টিণ্ডেলের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। অথবা এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, এই জনহীন বনজঙ্গল ও ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে বিংশ শতাব্দী তো প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায়ই নাই—ঊনবিংশ শতাব্দীও পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতীত যুগের রহস্যময় অন্ধকারে এখনও এসব অঞ্চল আচ্ছন্ন—এখানে সবই সম্ভব।

সেখানকার তাঁবু উঠাইয়া রামচন্দ্র আমীন ও আসরফি টিণ্ডেলকে সদর কাছারিতে লইয়া আসিলাম। রামচন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, ক্রমশ সে ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। সারারাত্রি চিৎকার করে, বকে, গান গায়। ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে তাহার এক দাদা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

এই ঘটনার একটা উপসংহার আছে, যদিও তাহা ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান ঘটনার সাত-আট মাস পরে, তবুও এখানেই তাহা বলিয়া রাখি।

এ ঘটনার ছ-মাস পরে চৈত্র-মাসের দিকে দুটি লোক কাছারিতে আমার সঙ্গে দেখা করিল। একজন বৃদ্ধ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়; অন্যটি তার ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের বাড়ি বালিয়া জেলায়, আমাদের এখানে আসিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে অর্থাৎ আমাদের জঙ্গলে খাজনা দিয়া তাহারা গরু-মহিষ চরাইবে।

অন্য সব চরি-মহাল তখন বিলি হইয়া গিয়াছে, বোমাইবুরুর জঙ্গলটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, সেইটাই বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাল দেখিয়াও আসিল। খুব খুশি, বলিল, খুব বড় বড় ঘাস হুজুর, বহুৎ আচ্ছা জঙ্গল। হুজুরের মেহেরবানি না হলে অমন জঙ্গল মিলত না।

রামচন্দ্র ও আসরফি টিণ্ডেলের কথা তখন আমার মনে ছিল না, থাকিলেও বৃদ্ধের নিকট তাহা হয়তো বলিতাম না। কারণ, ভয় পাইয়া সে ভাগিয়া গেলে জমিদারের লোকসান। স্থানীয় লোকেরা কেহই ও জঙ্গল লইতে ঘেঁষে না, রামচন্দ্র আমীনের সেই ব্যাপারের পরে।

মাসখানেক পরে বৈশাখের গোড়ায় একদিন বৃদ্ধ লোকটি কাছারিতে আসিয়া হাজির, মহা রাগত ভাব, তার পিছনে সেই ছেলেটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়াইয়া।

বলিলাম—কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—এই বাঁদরটাকে নিয়ে এলাম হুজুরের কাছে দরবার করতে। ওকে আপনি পা থেকে খুলে পঁচিশ জুতো মারুন, ও জব্দ হয়ে যাক্।

—কি, হয়েছে কি?

—হুজুরের কাছে বলতে লজ্জা করে। এই বাঁদর, এখানে এসে পর্যন্ত বিগড়ে যাচ্ছে। আমি সাত-আট দিন প্রায়ই লক্ষ্য করছি—লজ্জা করে বলতে হুজুর—প্রায়ই মেয়েমানুষ ঘর থেকে বার হয়ে যায়। একটা মাত্র খুপরি হাত-আষ্টেক লম্বা, ঘাসে ছাওয়া, ও আর আমি দুজনে শুই। আমার চোখে ধুলো দিতে পারাও সোজা কথা নয়। দু-দিন যখন দেখলাম তখন ওকে জিগ্যেস করলাম, ও একেবারে গাছ থেকে পড়ল হুজুর। বলে—কই, আমি তো কিছুই জানি নে! আরও দু-দিন যখন দেখলাম, তখন একদিন দিলাম আচ্ছা করে ওকে মার। চোখের সামনে বিগড়ে যাবে ছেলে? কিন্তু তার পরেও যখন দেখলাম, এই পরশু রাত্রেই হুজুর—তখন ওকে আমি হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, হুজুর শাসন করে দিন।

হঠাৎ রামচন্দ্র আমীনের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কত রাত্রে দেখেছ?

—প্রায়ই শেষরাত্রের দিকে হুজুর। এই রাতের দু-এক ঘড়ি বাকি থাকতে।

—ঠিক দেখেছ, মেয়েমানুষ ?

—হুজুর, আমার চোখের তেজ এখনও তত কম হয়নি। জরুর মেয়েমানুষ, বয়সেও কম, কোনদিন পরনে সাদা ধোয়া শাড়ি, কোনদিন বা লাল, কোনদিন কালো। একদিন মেয়েমানুষটা বেরিয়ে যেতেই আমি পেছন পেছন গেলাম। কাশের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল, টের পেলাম না। ফিরে এসে দেখি, ছেলে আমার যেন খুব ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে, ডাকতেই ধড়মড় করে ঠেলে উঠল, যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠল। এ রোগের ওষুধ কাছারি ভিন্ন হবে না বুঝলাম, তাই হুজুরের কাছে—

ছেলেটিকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ সব কি শুনছি তোমার নামে ?

ছেলেটি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। সমস্ত দিন জঙ্গলে মহিষ চরিয়ে বেড়াই—রাতে মড়ার মত ঘুমুই, ভোর হলে তবে ঘুম ভাঙে। ঘরে আগুন লাগলেও আমার হুঁশ থাকে না।

বলিলাম—তুমি কোনদিন কিছু ঘরে ঢুকতে দেখনি ?

—না, হুজুর। আমার ঘুমুলে হুঁশ থাকে না।

এ-বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। বৃদ্ধ খুব খুশি হইল, ভাবিল আমি আড়ালে লইয়া গিয়া ছেলেকে খুব শাসন করিয়া দিয়াছি। দিন-পনের পরে একদিন ছেলেটি আমার কাছে আসিল। বলিল—হুজুর, একটা কথা আছে। সেবার যখন আমি বাবার সঙ্গে কাছারিতে এসেছিলাম, তখন আপনি ও-কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন যে আমি কোনও কিছু ঘরে ঢুকতে দেখেছি কি না ?

—কেন বল তো ?

—হুজুর, আমার ঘুম আজকাল খুব সজাগ হয়েছে—বাবা ওই রকম করেন বলে আমার মনে কেমন একটা ভয়ের দরুণই হোক বা যার দরুণই হোক। তাই ক-দিন থেকে দেখছি, রাত্রে একটা সাদা কুকুর কোথা থেকে আসে—অনেক রাত্রে আসে, ঘুম ভেঙে এক-একদিন দেখি সেটা বিছানার কাছেই কোথায় ছিল—আমি জেগে উঠলেই পালায়, সে কেমন বুঝতে পারে যে, এইবার আমি জেগেছি। এরকম তো ক-দিন দেখলাম—কিন্তু কাল রাতে হুজুর, একটা ব্যাপার ঘটেছে। বাপজী জানে না—আপনাকেই চুপি চুপি বলতে এলাম। কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, কুকুরটা ঘরে কখন ঢুকেছিল দেখিনি—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। সেদিকের কাশের বেড়ায় জানলার মাপে কাটা ফাঁক। কুকুর বেরিয়ে যাওয়ার পরে—বোধ হয় পলক ফেলতে যতটা দেরি হয়, তার পরেই আমার সামনের জানলা দিয়ে দেখি একটি মেয়েমানুষ জানলার পাশ দিয়ে ঘরের পেছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি তখুনি বাইরে ছুটে গেলাম—কোথাও কিছু না। বাবাকেও জানাইনি, বুড়োমানুষ ঘুমুচ্ছে। ব্যাপারটা কি হুজুর বুঝতে পারছিনে।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম—ও কিছু নয়, চোখের ভুল। বলিলাম যদি তাহাদের ওখানে থাকিতে ভয় করে, তাহারা কাছারিতে আসিয়া শুইতে পারে। ছেলেটি নিজের সাহসহীনতায় বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমার অস্বস্তি দূর হইল না, ভাবিলাম এইবার কিছু শুনিলে কাছারি হইতে দুইজন সিপাহী পাঠাইব রাত্রে ওদের কাছে শুইবার জন্য।

তখনও বুঝিতে পারি নাই জিনিসটা কত সঙ্গীন। দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল অতি অকস্মাৎ এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দিন-তিনেক পরে।

সকালে সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, খবর পাইলাম কাল রাত্রে বোমাইবুরু জঙ্গলে বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলেটি মারা গিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তখনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি তাহারা যে ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ-জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম, শেষ রাত্রির দিকে উঠিয়া ছেলেকে সে বিছানায় না দেখিয়া তখনই লণ্ঠন ধরিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে—কিন্তু ভোরের পূর্বে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া কোন-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ, মৃতদেহের কাছেই একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়া ছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া

সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ, নরম বালিমাটির উপর ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। মৃতদেহেও কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোমাইবুরু জঙ্গলের এই রহস্যময় ব্যাপারের কোন মীমাংসাই হয় নাই, পুলিশ আসিয়া কিছু করিতে না-পারিয়া ফিরিয়া গেল, লোকজনের মনে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল ঘটনাটি যে, সন্ধ্যার বহু পূর্ব হইতে ও অঞ্চলে আর কেহ যায় না। দিনকতক তো এমন হইল যে, কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরের ধপধপে সাদা, ছায়াহীন, উদাস, নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত কলিকাতায় পালাই, এ-সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশপ্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাহাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।

মহকুমার টাউন থেকে বেরুলাম যখন, তখনই বেলা যায় যায়।

কলকাতা থেকে আসছিলাম বরিশাল এক্সপ্রেসে। বারাসাত স্টেশনে নিতান্ত অকারণে (অবশ্য যাত্রীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) উক্ত বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট কেন যে দাঁড়িয়ে রইল দারুব্রহ্মবৎ অনড় অবস্থায় তা কেউ বলতে পারলে না। গন্তব্যস্থান বনগাঁয়ে পৌঁছে দেখি রাণাঘাট লাইনের গাড়ী চলে গিয়েচে।

বেলার দিকে চাইলাম। বেশ উঁচুতেই সূর্যদেব, লিচুতলা ক্লাবে খানিকটা বসে আড্ডা দিয়ে চা খেয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেও এই পাঁচ মাইল পথ সন্ধ্যার আগেই অতিক্রম করতে পারা কঠিন হবে না।

রামবাবু, শ্যামবাবু, যদু ও মধুবাবু সবাই বেলা পাঁচটার সময় ক্লাবে বসে গল্প করছিলেন। আমায় দেখে বললেন—এই যে বিভূতি, এসময় কোত্থেকে?

—কলকাতা থেকে।

—বাড়ী যাবে? ট্রেনে গেলে না?

—ট্রেনটা ফেল হয়ে গেল, বরিশাল এক্সপ্রেস চল্লিশ মিনিট লেট।

—এসো, খুব ভাল হয়েছে এক্সপ্রেস লেট হয়ে। বোসো চা খাও।

তারপর গল্পগুজবে (যার বারো আনা পরনিন্দা) সময় হু হু করে কেটে গিয়ে কখন যে গোধূলির পূর্বমুহূর্ত উপস্থিত হয়েচে, তা কিছু বলতে পারি নে। যেতে হবে এখনো অনেকটা রাস্তা, আর দেরি করলে পথেই অন্ধকার হয়ে যাবে, বৃষ্টিও আসতে পারে, কারণ বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। বড় রাস্তায় উঠে-সত্যিই দেখলাম আড্ডা দিতে গিয়ে সময়ের আন্দাজ বুঝতে পারি নি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম, পশ্চিম আকাশে মেঘ করে আসচে।

চাঁপাবেড়ে ছাড়িয়েচি, রাস্তায় জনমানব নেই, পথের দুপাশে ঘন জঙ্গলে পটপটির ফুল ফুটেচে, গন্ধ ভেসে আসছে জোলো বাতাসে, শেয়াল খস্ খস্ শব্দ করে চলে গেল পাতার ওপর দিয়ে দিয়ে, বিলিতি চটকা গাছের ডাল বেয়ে ঝুলে পড়েচে মাকাললতা। কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে বেশ লাগচে এই নির্জনতা।

চাঁপাবেড়ের পুল ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েচি, এমন সময় দেখি একটি লোক কাঁধে বাঁক নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্চে।

আমার পায়ের শব্দে সে চমকে পিছন ফিরে আমার দিকে চাইলো।

ওকে এপথে একা দেখে একটু আশ্চর্য হয়েচি। এ বনপথে এ সময় কেউ একা বড় একটা হাঁটে না।

বললাম—কোথায় যাবি?

—আজ্ঞে, গোপালনগরে।

—বাঁকে কি রে?

—দই আছে।

—এত দই কি হবে?

—নিবারণ ময়রার বাড়ী বায়না আছে। তেনাদের বাড়ী আজ খাওয়ান দাওয়ান।

—তোদের বাড়ী কোথায়? দই আনচিস কোথা থেকে?

—আজ্ঞে, বেনাপোল থেকে।

—বলিস কিরে, এই দশ মাইল দূর থেকে দই আনচিস! তা এত দেরি করে ফেললি কেন?

লোকটার কণ্ঠস্বরে মনে হয়েছিল ও আমাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে বাঁচলো এই সন্দেবেলা। একা যেতে ওর নিশ্চয় ভয় করছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে গল্প জুড়ে দিলে কেন তার দেরি হল দই নিয়ে রওনা হতে। ওদের একটা গোরু হারিয়ে গিয়েছিল আজ পাঁচদিন। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আজ দুপুরের পর হিজোলতলার বাঁওড়ে সেই গোরুকে চরতে দেখা গেল। তারপর ওরা দল বেঁধে বেরুলো গোরু আনতে। গিয়ে দেখে বাঁওড়ের ধারে একটা লোক বসে আছে, তার কাছেই ছ'টা গোরু একসঙ্গে চরচে। সবগুলোই বিভিন্ন গ্রামের হারানো গোরু, ক্রমে জানা গেল। লোকটা ত ওদের দেখেই দৌড়—ইত্যাদি।

এইবার বেশ সন্দে হয়ে এসেচে।

বাঁশ-আমবনের ভেতরে ভেতরে ঘুলি ঘুলি অন্ধকার।

সামনে একখানা শুকনো কাঠ উঁচু চটকা গাছের মাথা থেকে ভেঙে পড়তেই ও চমকে উঠে বললে—ও কি? আমি হাসি চেপে বললাম—চটকা গাছের ডাল। লোকটা আশ্বস্ত

হয়ে বললে—ও।

—তোমার নাম কি?

—নিধিরাম।

—বাড়ী?

—কটক জিলা।

—সত্যি? তুমি তো বেশ বাঙালীর মত কথাবার্তা বলচো।

—তা হবে না বাবু? বেনাপোলের কাছে কাসুন্দিয়াতে আমার পনেরো বছর কেটে গেল। ওখানে আমার গোরুর বাথান। কুড়িটা গাইগোরু, পনেরো-ষোলটা বক্‌না বাছুর, মস্ত বাথান। রোজ আধ মণ দুধ হয়। এঁড়ে বাছুর আমরা রাখিনে, শুধু বক্‌না বাছুর রেখে দিই। এঁড়ে বিক্রী করে ফেলি বাবু—

লোকটা একটু বেশি বকে। আমাকে পেয়ে ওর বকুনি আর থামতে চায় না। একা যাচ্ছিল, আমায় পেয়ে ও ভারি খুশি হয়েচে, ভরসা পেয়েচে, এই সন্দেবেলা।

বললে—বৃষ্টি আর হল না বাবু, কি বলেন?

—সেই রকমই তো দেখচি।

—এবার বড় দুব্বচ্ছর। আমন ধানের রোয়া হল কই? বীজপাতা ছিল দু কাঠা ভুঁই। সে বীজ লালচে হয়ে আসচে। ওই দেখুন, কেমন মেঘ করে আসছিল, আবার ফর্সা হয়ে এল! এবার আমাদের এদিকে খুব কম বৃষ্টি হয়েচে। আমন ধানের রোয়া হয়নি, চাষামহলে হাহাকার পড়ে গিয়েচে, ধানের দর ছিল চারটাকা মণ। এখন উঠেচে সাড়ে সাত টাকা মণ! গরিব দুঃখী লোকেরা এর মধ্যে উপোস শুরু করে দিয়েচে।

আমায় আবার বললে—গোরুগুলো অনেক কষ্ট করে মানুষ করা। এবার বিচুলি অভাবে মারা পড়বে বাবু।

—কাঁচা ঘাস কেটে খাওয়াবে। বর্ষাকালে কোনো গোরু বিচুলি খায়? সবই কাঁচা ঘাস খেয়ে বাঁচে।

—বেত্‌না নদীর ধারে আগে আগে কত কাঁচা ঘাস পাওয়া যেতো, এখন সব আঁটি বেঁধে এনে এনে বনগাঁ শহরে বিক্রী করে। শহুরে বাবুরা চার আনা চোদ্দ পয়সা এক আঁটি কিনচে। আমাদের গোরুর ঘাস নিয়েই মুশকিল। ওটা কি বাবু?

এইবার লোকটা চমকে উঠে যেন আমার গা ঘেঁষে এসে থমকে দাঁড়ালো।

আমি বললাম—কই, কি?

—ওই যে সাদা মত?

চেয়ে দেখলাম, কিছুই না। মাকাললতার মোটা সাদা লতা গাছের ডাল থেকে ঝুলে দুলচে অন্ধকারে। লোকটা দেখচি বিষম ভীতু।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগলো।

আমায় ও বললে—বাবু, আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি একটু গিয়ে ডানদিকের রাস্তায় নেমে যাবো। ওখানেই আমার গাঁ।

—গোপালনগর এখন কতদূর আছে?

—তা দেড় মাইল।

—পথে কোনো ভয়-টয় নেই তো?

আমি জোরে ঘাড় নেড়ে বললাম—না, ভয় কিসের। এ অঞ্চলে বাঘ-টাঘ নেই। বুনো শুয়োরও নেই। সে বললে—আমি বাঘের কথা বলিনি বাবু—বলি এই—সন্দেবেলা আবার নাম করতে নেই—সেই তাঁদের—

—ও, ভূতপ্রেতের?

—ও নাম করবেন না সন্দেবেলা। রাম রাম রাম রাম! ও নাম কি করতে আছে এ সময়? রাম রাম রাম রাম—

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে বললাম—ও, বুঝিচি। তবে একটা কথা, যখন তুমি বিদেশী লোক, তখন তোমাকে সব খুলে বলাই ভালো।

—কি বাবু?

—দাঁড়াও এখানে। আমি তো এখুনি নেমে যাবো, তুমি একা যাচ্চ এতটা পথ—অন্ধকারে—পথে জনপ্রাণী নেই—। আমার বর্ণনার বহর শুনে লোকটা আরও আমার দিকে ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে—তারপর বাবু?

—তারপর আর কি, তোমাকে বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু যখন জিগ্যেস করলে তখন না বলাটাও তো ঠিক নয়। বিশেষ করে একা যখন যাচ্চ। সঙ্গে নেই লোক। ওই যে একটা সাঁকো আছে রাস্তার ওপর বনের পাশে, ওই সাঁকোটা বড় খারাপ জায়গা।

—কেন বাবু?

—ও জায়গাটাতে ভূত—মানে ওঁরা সব আছেন কিনা! পাশে যে বড় বাগান, ওটার নাম গলায়-দড়ের আমবাগান। বড্ড খারাপ জায়গা। অনেক দিন আগে তখন আমি ছেলে-মানুষ, একবার একজন এই তোমার মতই বিদেশী লোক একা যাচ্ছিল গোপালনগরে, সন্দের পর। তার পরদিন সকালবেলা দেখা গেল কিসে তার ঘাড়টা ভেঙে মেরে ফেলে রেখেচে সাঁকোর তলায়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। কথাটা তোমায় বলা উচিত নয়, তবে যখন জিগ্যেস করলে, তখন চেপে রাখাও তো উচিত নয়। একটা বিপদ হতে দেরি লাগে না, তখন তুমি বলতে পারো বাবু আপনি জেনে-শুনেও আমায় বলেন নি কেন। সন্দের পর কেউ ও পথে যায় না। প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। আজ বছর দুই আগে এক রাখাল ছোঁড়া দিনদুপুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সাঁকোর তলায়। যাক সে, তুমি রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও, কোনো ভয় নেই।

—বাবু, আপনি কি নেমে যাবেন?

—হ্যাঁ, আগে আমার গাঁয়ে রাস্তা নেমে গেল। আমি এইবার চলে যাবো।

—তাই তো বাবু, একা আমি কি করে যাবো?

—রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে? কপালে মৃত্যু থাকলে কেউ সামলাতে পারে না। না থাকলে কেউ মারতে পারে না। রাম রাম বলতে বলতে চলে যাও। দাঁড়াও, আজ আবার তিথিটা কি? চতুর্দশী। তিথিটা ভালো নয়। অমাবস্যে, চতুর্দশী, প্রিতিপদ এই তিথিগুলো খারাপ।

—কেন, কেন বাবু?

—সে আর তোমাকে বলে কি হবে? তুমি সন্দের অন্ধকারে একা রাস্তার ওপর—যেতে হবে এখনো তোমায় এক ক্রোশ পথ। ক্রমশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আসচে। তবে তোমায় বলা আমার উচিত—বিদেশী লোক, তোমায় সব কথা খুলে না বলাটাও ঠিক নয়। একটা বিপদ হোতে কতক্ষণ? তখন তুমি আমায় দোষ দিতে পারো। এই সব তিথিতেই ভূত প্রেত—পিশাচ ব্রহ্মদত্যি—

লোকটা বলে উঠলো—রাম রাম রাম রাম—ও সব নাম করবেন না বাবু—

—মানে ওঁরা সব বার হয়ে থাকেন কিনা—

—তাই নাকি? তবে তো—

—আবার কি জান, এই চতুর্দশী তিথিতে গলায় দড়ি দিয়ে অপমৃত্যু ঘটেছে এমন ভূতেরা বার হয়। আমি একবার বড় বিপদে পড়েছিলুম—

লোকটা আড়ষ্ট সুরে বললে—কি বাবু?

—একটা শ্মশানের ধার দিয়ে সেবার যাচ্ছিলাম। সেও এই ভূতচতুর্দশী তিথি। দেখি যে অন্ধকারে গাছের ডাল থেকে কি একটা যেন ঝুলচে—কাছে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে-মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে আর হিঃ হিঃ করে হাসচে—

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে—কি সর্বনাশ!

—যাক্, ওই আমার রাস্তা নেমে গেল। আমি চললাম এবার। যাও তুমি, একটু সাবধানে যাও, সাবধানের মার নেই।

কথা শেষ না করেই আমি আমাদের গ্রামের পথে নেমে পড়লাম।

ও কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে—বাবু, আমাকে একটু এগিয়ে নিয়ে সাঁকোটা পার করে দ্যান যদি—

আমি শিউরে বলে উঠি—আমি? আমার কম্ম নয়। আমাকে তারপর এগিয়ে দেবে

কে? বাবারে, প্রাণ হাতে করে যাওয়া ওসব জায়গায়! একে আজ ভূতচতুর্দশী—

—রাম রাম রাম রাম!

—তুমি চলে যাও একটু জোর পায়। আবার রাস্তাও তো কম নয়, তোমাকে যেতেও হবে একমাইল দেড়মাইল রাস্তা—আর এই অন্ধকার! আচ্ছা চলি—তুমি বিদেশী লোক, জিগ্যেস করলে তাই এত কথা বলা। নইলে কি দরকার?

আমাদের রাস্তায় নেমে কয়েক পা মাত্র এগিয়েচি, লোকটা দেখি ডাকচে—বাবু, বাবু, একটা কথা শুনুন—ও বাবু—

পিছন ফিরে দেখি কাঁধের বাঁকটা একটি শিশুগাছের তলায় নামিয়ে দাঁড়িয়েচে।

বললাম—কি?

—দইগুলো নিয়ে আমি এখন কি করি বাবু?

—কি আর করবে? বায়না রয়েচে, একমুঠো টাকা। দিয়ে এসো। রাত হয়ে গিয়েচে, ওদের খাওয়ানো দাওয়ানোর সময় হল। রাম ব'লে এগিয়ে পড়ো—সাবধানে যেও—। আর কোনো কথা না বলে আমি হন হন করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

ও শুনলাম আবার ডাকচে—ও বাবু, ও বাবু—শুনে যান—একটা কথা, ও বাবু—! দূরে ওর গলার সুরটা যেন আর্তনাদের মত শোনাচ্ছিল।

—"এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।"

আমি সবিস্ময়ে সেই ভগ্নস্তূপের পানে দেখিলাম। এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী? সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দিনান্তের অস্পষ্ট আলোক যাই যাই করিয়াও আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। পরিশ্রান্ত বিহগকুলের অবিশ্রাম কূজন ধ্বনি রহিয়া রহিয়া তখনও আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া দিতেছিল। গঙ্গার অপূর্ব তরঙ্গভঙ্গ চিত্তলোকে এক অজ্ঞাত চেতনার সঞ্চার করিতেছিল। সেই প্রদোষের ম্লান দ্যুতিবিকাশের অন্তরালে আমি প্রাতঃস্মরণীয় সুবিখ্যাত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। গঙ্গার ঠিক তীরভূমিতে অগণিত লতাপল্লবে মণ্ডিত হতশ্রী প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। নদীস্রোতের অবিরাম আঘাতে সে প্রাসাদের অনেকখানিই ভাঙিয়া চুরিয়া কোন্ অনির্দেশের পথে বহিয়া গিয়াছে। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ যাহা এখনও বর্তমান আছে, তাহা সেই হতগৌরবের কঙ্কালবিশেষ; এখন যেন সেখানে সেই দুর্দান্তপ্রতাপ প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রেতাত্মা বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতি তাহাকে আজ নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছে, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য তাহাকে শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গার বক্ষে

একটি নৌকা পাল তুলিয়া পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। একটি মাঝি গান গাহিতেছিল। তাহার সেই ক্লান্ত কণ্ঠস্বর সন্ধ্যাপ্রকৃতির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া কোন্ দূরান্তরের এক অপূর্ব সাড়া বহিয়া আনিতেছিল।

পলাশপুরের প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর নাম শোনে নাই এমন লোক খুব কমই আছে। একদা তাঁহার প্রতাপে সারা পলাশপুর তটস্থ হইয়া থাকিত। কিংবদন্তী আছে যে সেকালে নাকি বাঘে গরুতে নির্বিবাদে একই ঘাটে জল পান করিত। অতবড় ক্ষমতাশালী বর্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী জমিদার সেকালে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বের সূচনার দিন হইতে পলাশপুরের চৌধুরীবংশের উদ্ভব। ইংরেজ-বাহাদুরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী এই পলাশপুরের জমিদারি লাভ করেন। ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী চৌধুরী-বংশের আদিপুরুষ। তাঁহারই পৌত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে বারাকপুরের বিদ্রোহদমনে ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন লরেন্স সপরিবারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসে সেসব কথা নাই বটে তবে সকলেই সে কথা জানিত। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ কালো করিয়া দিয়াছিল, বিজয়নারায়ণ সে সময়ে বারাকপুরে। সেদিনও এমন ছিল। ক্যাপ্টেন লরেন্স বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর কর্মকুশলতায় তাঁহাকে স্বীয় তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। বহুকাল সেই তরবারি চৌধুরী বংশের প্রাচীরে অতি সন্তর্পণে অতীত-গৌরবের চিহ্নস্বরূপ টাঙানো ছিল।

বেলেডাঙার কমল হালদারের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দেশে গিয়াছিলাম বেড়াইতে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশপুরের চৌধুরীবাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। কমল বলিল, এই সে প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।

ইতিপূর্বে চৌধুরীবংশের অতীত কাহিনীর আমি অনেক কিছুই শুনিয়াছি। তাঁহাদের সেই বিরাট প্রাসাদের এই দুর্দশা দেখিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া গেলাম। এখন মানুষ সেখানে বাস করে না। সেটি এখন হিংস্র পশুর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর সময় চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। চতুর্দিকে চৌধুরীবংশের প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপনারায়ণের সময়ে যেমন চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল, সেই প্রতাপনারায়ণের সময়েই তাহার আবার ভাঙন শুরু হয়। অমানুষিক দুশ্চরিত্রতা ও প্রচুর মকদ্দমার ফলে তাঁহার পতন শুরু হয় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল-সাম্রাজ্য যেমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই আবার তাহার পতন শুরু হয়। বৃদ্ধ সম্রাট বহু দুঃখেই দূরে দাক্ষিণাপথে প্রাণত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন চরিত্রবান ও ধার্মিক, আর প্রতাপনারায়ণ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার অভিধানে চরিত্র বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। মদ ও মেয়েমানুষ তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। আর এ ছাড়া যেটুকু সময় পাইতেন তাহাতে মামলা-মকদ্দমার তদ্‌বির করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিখুঁত ভাবে মকদ্দমা তদ্‌বির করিতে সেকালে খুব কম লোকই পারিত। অথচ লেখাপড়ার তিনি ধার ধারিতেন না, আইন তো দূরের কথা। কত সতীরমণীর আর্তক্রন্দনে নিঃশব্দরাত্রে চৌধুরীবংশের সুদীর্ঘ রঙমহল যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের সেই ব্যাকুল কণ্ঠধ্বনি ঝিল্লীরবের সহিত তালে তালে শব্দিত হইয়া মরিতেছে। তাহাদের বিকট অট্টহাস্য হয়তো এখনও ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছে।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরীকে আর ভালবাসিয়াছিলেন পত্নীর বিধবা ভগিনী আভাময়ীকে। ক্ষীরোদাসুন্দরীর প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই। আর বাল-বিধবা আভাময়ী প্রতাপনারায়ণের প্রেমের তরঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া আত্মীয়-স্বজনের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর প্রতাপনারায়ণ আর ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখদর্শন করেন নাই। সেই অভাগী রমণী চার মাসের শিশুপুত্র সূর্যনারায়ণ চৌধুরীকে বুকে লইয়া স্বামীর দৃষ্টিপথের অন্তরালে জীবন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আর প্রতাপনারায়ণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা গেল বাড়িয়া। তিনি বাহিরবাড়ীতেই দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আভাময়ীর প্রতি সমাজের এই অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিকার-স্বরূপ তিনি তাঁহার প্রজাদের শান্তির সংসারে দিতে লাগিলেন আগুন জ্বালাইয়া। গৃহস্থবধূ বা গৃহস্থকন্যা তাঁহার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিত। সারাদিন পথে পথে পাখীমারা বন্দুক কাঁধে লইয়া পাখী মারিয়া ফিরিতেন। সে পথে কোন স্ত্রীলোকের বাহির হইবার সাহস ছিল না। আর তাঁহার সঙ্গে থাকিত কানা কালু সর্দার। কানা হইলে কি হয়, চক্ষুষ্মানকেও সে হার মানাইতে পারিত। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে প্রতাপনারায়ণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত সহজেই। ইংরেজ-রাজত্বের এমন ধরাবাঁধা আইন তখন ছিল না। প্রতাপনারায়ণের মহল্লার তাঁহার বিখ্যাত লাঠিয়ালদের দৌলতে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার সামর্থ্য ছিল না। লাঠির জোরেই রাজত্বজয় হইত আর লাঠির জোরেই রমণীর সতীত্বলুণ্ঠন হইত। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করিতেন সর্বান্তঃকরণে। নারী নরকের দ্বার। এই নারীই তাঁহার জীবনে দিয়াছিল দাবানল জ্বালাইয়া।

সেবার দুরন্ত বর্ষার এক অবিশ্রান্ত ধারাপতনের দিনে কালু কোথা হইতে এক অজ্ঞাতনামা রমণীকে বহিয়া আনিল। রাত্রি তখন দশটা। চারিদিকে সেই বর্ষাপ্রকৃতির গুঞ্জন কোন্ এক বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। কাহাকে হারানোর বেদনা যেন সারা বিশ্ব মথিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতাপনারায়ণ তখন সুর্মা দিয়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে রেখাপাত করিতেছিলেন। কালু আসিয়া ডাকিল,—মহারাজ!

প্রতাপনারায়ণ হাঁকিলেন, কে?...ও।

—এসেছে।

—বিশ্রাম করতে বল্।—কতদূর থেকে আসছে?

—সাত ক্রোশ।

—কেমন?

—আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত।

—উত্তম।

প্রতাপনারায়ণ দ্রুত সাজ সমাধা করিয়া প্রমোদগৃহে উপস্থিত হইলেন। অভাগিনী তখন সেই বিলাসগৃহের এক কোণে বস্ত্রখণ্ডে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাঁদিয়া মরিতে-ছিল। মনুষ্যপদশব্দে সে প্রতাপনারায়ণের পানে চাহিয়াই বিকট শব্দে আঁতকাইয়া উঠিল। তাহার আয়ত আঁখি, সর্বোপরি তাহার সেই ভীতিসুন্দর দেহলতা প্রতাপনারায়ণের প্রাণে এক উন্মাদনা জাগাইয়া দিল। প্রতাপনারায়ণ তাহার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম?

কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরায় বলিলেন, এই যে বিরাট প্রাসাদ, এই অতুল বিভব, সবই তোমার। তুমি আজ আমার রানী।

সেই রমণী কহিল, না—না, আমি রানী হ'তে চাই না। আমায় ভিখিরি থাকতে দিন।

আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে আমার স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে দিন।

কথা শেষে সে প্রতাপনারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িল। প্রতাপনারায়ণ উৎকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, অসম্ভব।

জীবনে এমন নিখুঁত রূপ প্রতাপনারায়ণ আর দ্বিতীয়টি দেখেন নাই। তাহার সেই বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রতাপনারায়ণের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল। সেই রমণী কহিল, আমায় ছেড়ে দিন, আপনার ভাল হবে।

প্রতাপনারায়ণ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার ভাল আমি চাই না।

—আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। আপনার সর্বনাশ হবে। আমার অভিশাপে এ বাড়ীঘর জ্বলে পুড়ে যাবে।

প্রতাপনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন। সে পুনরায় বলিল, যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তবে আমার অভিশাপ কখনও সহ্য করতে পারবেন না। আপনি নির্বংশ হবেন।

অবলা রমণীর যে এমন করিয়া মানুষকে অভিশাপ দিবার ক্ষমতা আছে ইহা ছিল প্রতাপনারায়ণের বিশ্বাসের অতীত। কিন্তু তিনি পরিণামদর্শী ছিলেন না আদৌ। তিনি ঐ অবলার সাবধান-বাণী শুনিলেন না। এই তাঁহার জীবনের শেষ শিকার।

পরদিন সারা প্রাসাদে একটা দুরপনেয় বিষাদের ছায়াপাত হইল। সেদিন হইতে সেই রমণী আর উঠিল না বা আহার গ্রহণ করিল না। দুই দিন পূর্ব হইতেই সে উপবাস করিতেছিল। তিল তিল করিয়া সে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। সকলে মূক বিস্ময়ে অভাগীর পানে চাহিয়া রহিল। প্রতাপনারায়ণ ভয়-ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। উহার বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস সহ্য করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে রানী শ্রীক্ষীরোদা-সুন্দরীও তাঁহার দীর্ঘকালের শুচিতা ত্যাগ করিয়া এই নরককুণ্ডে আসিয়াছিলেন অভাগিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। কিন্তু তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 'যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তো চৌধুরী-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে'—এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী নারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার সাতদিন পর প্রতাপনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। পথে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

সূর্যনারায়ণও পিতাকে অনুসরণ করিতে চলিলেন! অল্প বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া মোসাহেবের সহায়তায় তাঁহার ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। পর-স্ত্রীতে লোভ তাঁহার ছিল না সত্য, তবে তাঁহারও নেশা ছিল। শহর অঞ্চল হইতে সব বিখ্যাত বিখ্যাত বাইজি আনার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহার জন্য তিনি মুক্তহস্তে ধনব্যয় করিয়া যাইতেন। লখ্‌নউ, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি সকল শহরের সুপ্রসিদ্ধা বাইজি-কুলের পদরেণুপাতে তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহের পবিত্র প্রাসাদ ধন্য করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দিনরাত তাহাদের সুরলহরী ও রূপমাধুরীতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিবাহ করিয়াছিলেন যথাসময়ে। যদিও পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নীকে ঘৃণা করিতেন না তথাপি তাঁহার দিন কাটিত বাহির-বাড়ীতে। গভীর রাত্রে অতিরিক্ত তাগাদার ফলে মাঝে মাঝে টলিতে টলিতে অন্দর-বাড়ীতে উঠিয়া যাইতেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। অধিকাংশ রাত্রিই তাঁহার এই বাহির-বাড়িতে কাটিত। তাহা ছাড়া দেশভ্রমণ তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। একটির পর একটি করিয়া তিনি দেশ দেখিয়া বেড়াইতেন।

কত তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন, অথচ দেবতা দর্শন করেন নাই। দেবমন্দিরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিতেন, জীবনে তো অনেক পাপ করেছি, মিথ্যে পবিত্র দেবমন্দির আর কলুষিত করি কেন!

অকস্মাৎ একদিন সূর্যনারায়ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া না কহিয়া অতি অসময়ে বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকে দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবাইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শঙ্করনারায়ণ যখন সাবালক হইলেন তখন তিনি তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বনেদী বংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া চৌধুরীপরিবার বিভীষিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। গহনা বিক্রি করিয়া শঙ্করনারায়ণ মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি কিন্তু মানুষ হইলেন তাঁহার পিতা বা পিতামহের বিপরীত প্রকৃতি হইয়া। ইংরেজি শিক্ষার তিনি ধার ধারিলেন না। তবে অবিচলিত চিত্তে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে কেমন যেন ধর্মভাব জাগিয়া উঠিল ; তিনি অল্প বয়স হইতেই ধার্মিক হইয়া পড়িলেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের পূজায় ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। বাড়ীতে খাইতেন আর ত্রিতলের ঘরে বসিয়া থাকিতেন। কোথাও বাহির হইতেন না। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিয়া গেরুয়া বসনে সর্বাঙ্গ মণ্ডিত করিয়া তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বেহালাখানায় বসিয়া ছড়ি ঘষিতেন। রাত্রির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া সেই রাগিণী কোন বন্দিনী বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় শুনাইত। ক্ষয়িষ্ণু চৌধুরীবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী যেন ঐ ভাষায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরিত।

শঙ্করনারায়ণও তাঁহাদের বংশের ধারা বজায় রাখিয়া অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং খুব অল্প বয়সেই তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নী কল্যাণীকে ঘৃণা করেন নাই সত্য, তবে তাঁহাকে যে ভালবাসিতেন একথা হলফ করিয়া বলা যায় না। তিনি পত্নীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন মাত্র। সারাদিন প্রায় তাঁহার গৃহদেবতার ধ্যানধারণায় কাটিত। তিনি নিত্য অত্যন্ত শুচিতা সহকারে দেবতার আরাধনা করিতেন। গভীর রাত্রে পূজায় বসিতেন। যাহা জুটিত সেই সামান্য দুটি শাকান্ন মুখে দিয়া তিনি আবার তাঁহার সেই ত্রিতলের গৃহে যাইতেন। বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না আদৌ। দিনদিন চৌধুরীবংশ যে নিশ্চিহ্ন হইবার পথে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া তিনিও ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিলেন। আর ততই গৃহদেবতার পূজার মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইল—বিত্ত চাই, অর্থ চাই, ঐশ্বর্য চাই। তিনি কেবল প্রার্থনা করিতেন দেবতা আবার যেন চৌধুরী-বংশের নষ্ট-সম্পদ ফিরাইয়া দেন।

এহেন কালে একদা চৈত্রের এক অমাবস্যা রজনীতে শঙ্করনারায়ণ স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী চৌধুরীবংশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অপূর্ব জ্যোতিতে বিশ্বভুবন আলোকিত। একটা সুস্নিগ্ধ সুবাসে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। শঙ্করনারায়ণ ত্বরিতপদে উঠিয়া গিয়া দেবীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী তাঁহার বিষণ্ণ মুখে যেন বলিলেন, বাছা, পথ ছাড়, আমায় যেতে দে।

শঙ্করনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন,—মা, আমাদের এমনি করে ছেড়ে যাচ্ছ মা?

দেবী নিষ্ঠুরভাবে হাসিলেন।

—নিত্য না খেয়ে তোমার পূজার আয়োজন করেছি মা, তবু তোমার ক্ষুধা দূর হয় নি?

—না। আমি রক্ত চাই!

—কার রক্ত মা?

—তোর ছেলের।

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অমনি শঙ্করনারায়ণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী, এ কি পরীক্ষা তোর! তখনও তাঁহার সেই গৃহে দেবীর পদ্মগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শঙ্করনারায়ণ বিচলিত হইলেন না। চৌধুরীবংশ তাঁহার পুত্রের চেয়ে অধিক মূল্যবান। তিনি বলিলেন, তাই হবে মা, তাই হবে। তুমি এ অভাগাকে ত্যাগ করো না।

তার পর তিনি ধীরপদক্ষেপে তাঁহার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অতি সন্তর্পণে। কল্যাণী তখন ঘুমাইতেছিলেন আর তাঁহার পুত্র মাতার স্তনপান করিতেছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। শঙ্করনারায়ণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেই খোকাকে মাতার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া আনিলেন। কল্যাণী সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। তিনি একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন মাত্র। শঙ্করনারায়ণ খোকাকে পরম স্নেহে তাঁহার বুকের মধ্যে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সোঁ-সোঁ শব্দে সারা প্রকৃতি যেন উন্মাদ তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। খোকা পিতার বাহুমধ্যে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর খোকাকে গৃহদেবীর সম্মুখে নিজ হাতে বলি দিলেন। একবার হয়তো সে কাঁদিয়াছিল; কিন্তু বাহিরের সেই ঝড়জলের মধ্যে সে কান্না হয়তো শোনা যায় নাই। রক্তধারায় সারা-গৃহ ছাইয়া গেল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি কিন্তু দিশাহারা হইলেন না বা বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িলেন না। হোমের জন্য যে বালি ছিল তাহা আনিয়া সারারাত্রি তিনি সেই রক্তচিহ্ন মুছিতে লাগিলেন। চৌধুরীবংশ বড় হইবে জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার পূরণ হইয়াছে, এই সান্ত্বনায় পরম তৃপ্তিতে সেই বালির উপরই রাত্রিশেষের দিকে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিনের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কল্যাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে জাগাইলেন, ওগো, খোকা কোথা গেল?

শঙ্করনারায়ণ স্ত্রীর পানে চাহিতে পারিলেন না। খোকার মৃতদেহ তখন ভাগীরথীর খরস্রোতে কোন্ দূরান্তরে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তমাখা বালুকারাশিই তাহার শেষ চিহ্ন। কল্যাণী আবার ডাকিলেন. ওগো. কথা কও, কথা কও! আমার খোকাকে এনে দাও!

শঙ্করনারায়ণ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। জীবনে আর তিনি খুব কমই কথা বলেন। যাহা হৌক ব্যাপারটা আর চাপা রহিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণী ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারই অবগত হইলেন। সারাদিন তিনি আর উঠিলেন না, খাইলেন না। সেইদিন রাত্রে তিনিও কুলপ্লাবিনী জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে আত্মবিসর্জন দিয়া তাঁহার বড় আদরের খোকার সহিত মিলিত হইলেন।

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এ ঘটনার কিছুদিন পর শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকেও আর পাওয়া গেল না। আজও পর্যন্ত তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই!

সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। গৃহলক্ষ্মী এখনও সেই ভগ্নপ্রায় বংশহীন চৌধুরী বাড়ীর অন্তরালে বন্দিনী আছেন কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি পরম পরিতৃপ্তির সহিত বাহির হইয়া আসে। সেদিনও

এমনি ঝড় উঠিয়াছিল ; সেদিনও পশ্চিমের আকাশে একটা কালো মেঘ দিগন্ত ছাইয়া রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেদিনও হয়তো ঐ শ্মশানঘাটের নিষ্পত্র ঝাউগাছটার মাথায় বসিয়া একটা শকুন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া মরিতেছিল।

আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল।

বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওপারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে।

এ অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারোটার সময় নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে-গুজবে সময় কাটতে লাগল।

সময়টা পুজোর পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝে মাঝে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হ'ল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হ'ল।.....

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লুম—শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে নোয়াখালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগল। অপরিসর খালের দুধারে বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধোঢাকা চতুর্দশীর জ্যোৎস্না চিক্‌মিক করছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ। শটি, বেত, ফার্নগাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে।.....বাইরে একটু ঠাণ্ডা থাকলেও আমি ছই-এর বাইরে ব'সে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম.....বরিশালের সে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি, ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, দশ-পনেরো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমেই হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। আর একটু রাত হল। খালের দু'পাড়ের নির্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। এ অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই ; শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হোগলা গাছ।

আমার সঙ্গী বললেন—এত রাতে আর বাইরে থাকবেন না, আসুন ছই-এর মধ্যে। এসব জঙ্গলে—বুঝলেন না?

তারপর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর এক কাকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, তাঁরই লঞ্চে ক'রে তিনি একবার সুন্দরবনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন—সেই সব গল্প।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হ'ল।

মাঝি আমাদের নৌকোয় ছিল মোটে একটি। সে ব'লে উঠল—বাবু, একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পারব না। এখানেই নৌকো রাখি।

নৌকো সেখানেই বাঁধা হ'ল। এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল, দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দু'ধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্যন্ত চুপ করেছে।.....সঙ্গীকে বললুম—মশায়, এই তো সরু খাল—পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না তো নৌকোর ওপর?

সঙ্গী বললেন—না পড়লেই আশ্চর্য হবো!

শুনে অত্যন্ত পুলকে ছই-এর মধ্যে ঘেঁষে বসলুম। খানিকটা ব'সে থাকবার পর সঙ্গী বললে—আসুন একটু শোয়া যাক। ঘুম তো হবে না, আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে থাকি।

খানিকটা চুপ ক'রে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে ব'লে মনে হ'ল না ; ভাবলুম, তবে আমিই বা কেন মিথ্যে মিথ্যে চোখ চেয়ে চেয়ে থাকি—মহাজনদের পথ ধরবার উদ্যোগ করলুম।

তারপর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন-ঝোপের ওপাশে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে।.....তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম—গ্রামোফোন? এ বনে এত রাত্রে গ্রামোফোন বাজাবে কে? কান পেতে শুনলুম—গ্রামোফোন না। অন্ধকারে হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ কণ্ঠে আর্তকরুণ সুরে কি বলছে।.....খানিকটা শুনে মনে হ'ল সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতলার ছাদে গ্রামোফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট, অথচ বেশ একটা একটানা সুরের ঢেউ এসে কানে পৌঁছয়—এও অনেকটা সেই ভাবের। মনে হ'ল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে গেল—কিন্তু ধরতে পারা গেল না কথাগুলো কি। শব্দটা মাত্র মিনিটখানেক স্থায়ী হ'ল, তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল, আবার তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল..... তাড়াতাড়ি ছই-এর বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকোর তলায় ভাঁটার জল কল্‌কল ক'রে বাধছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়া-ঝোপে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাবলাম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাবলুম বেচারীরা ঘুমুচ্ছে, ডেকে কি হবে, তার চেয়ে বরং নিজে জেগে ব'সে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম ; তারপর আবার ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাব, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন্ অংশ থেকে সুস্পষ্ট অতি উচ্চ আর্তকরুণ ঝিঁঝি পোকার রবের মত তীক্ষ্ণস্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল—ওগো নৌকাযাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ.....আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে ম'লাম.....আমাদের ওঠাও ওঠাও..... আমাদের বাঁচাও।

নৌকোর মাঝিটা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠল। আমি সঙ্গীকে ডাকলুম—মশায়, ও মশায়, উঠুন উঠুন।

মাঝি আমার কাছে ঘেঁষে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপছিল। বললে—আল্লা! আল্লা! শুনতে পেয়েছেন বাবু?

সঙ্গী উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কি, কি মশায়? ডাকলেন কেন? কোন জানোয়ার-টানোয়ার নাকি?

আমি ব্যাপারটা বললুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছই-এর বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে কান খাড়া ক'রে রইলুম। চারিদিক আবার চুপ.....ভাঁটার জল নৌকোর তলায় বেধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল।.....

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি তবে.....

মাঝি বললে—হ্যাঁ বাবু, বাঁয়েই কীর্তিপাশার গড়।

সঙ্গী বললেন—তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো রাখলি কেন? বেকুব কোথাকার!.....

মাঝি বললে—তিনজন আছি ব'লেই রেখেছিলাম বাবু। ভাঁটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবার তো জো ছিল না।

কথাবার্তার ধরণ শুনে সঙ্গীকে বললুম—কি মশায়, কি ব্যাপার? আপনি কিছু

জানেন নাকি?

ভয়ে যত না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গী বললেন—ওরে তোর সেই কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল্। আলো জেবলে ব'সে থাকা যাক—রাত এখনও ঢের।

মাঝিকে বললুম—তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি?

সে বললে, হ্যাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই তো আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আরও দুবার নৌকো বেয়ে যেতে যেতে ও ডাক শুনেছি।

সঙ্গী বললেন—এটা এ অঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এ জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় ব'লে আর এ অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই ব'লে, শুধু নৌকোর মাঝিদের কাছেই এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয়—সেইটে আপনাকে বলি শুনুন।

তারপর ধূমায়িত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে ব'সে সঙ্গীর মুখে কীর্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলুম।

তিন শ' বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার। এ অঞ্চলে তখন বারভুঁইয়ার দুই প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ঈশা খাঁ মশনদ-ই আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহানার বাহির সমুদ্র, যাকে এখন সন্দ্বীপ চ্যানেল বলে, সেখানে তখন মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা শিকারান্বেষণে শ্যেনপক্ষীর মত ওৎ পেতে ব'সে থাকত।

সে সময় এখানে এরকম জঙ্গল ছিল না। এ সমস্ত জায়গা তখন কীর্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল—মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেকবার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসামন্ত, কামান, যুদ্ধের কোষা সবই ছিল। সন্দ্বীপ তখন ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এ অঞ্চলের সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় ক'রে গড়তে হ'ত। এ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর একটা খাল বড় নদীতে পড়ত বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে।

কীর্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দর মেয়ে কমই ছিল, যে তাঁর অন্তঃপুরে একবার না ঢুকেছে। তা ছাড়া তিনি নিজেও এক প্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় ছিপ ছিল। আশপাশের জমিদারী এমন কি নিজের জমিদারীর মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী-কন্যা লুঠপাট করা রূপ অসৎ কার্যে সেগুলি ব্যবহৃত হ'ত।

কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল কীর্তি রায়ের এক বন্ধুর। এঁরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়দের পত্তনিদার। অবশ্য সে সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে বেশী ছিল। কীর্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণবয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। নরনারায়ণ তখন নবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান। নরনারায়ণ কীর্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী বন্ধু।

সেবার কীর্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাঁর রাজ্যে দিনকতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মী দেবী স্বামীর বন্ধু নরনারায়ণকে দেবরের মতন স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। দু'একদিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হয়ে উঠতে হ'ল। নরনারায়ণ রায় তরুণবয়স্ক হলেও একটু গম্ভীর-প্রকৃতি। বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যঙ্গ-পরিহাসে গম্ভীর-প্রকৃতি নরনারায়ণের

মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ল। স্নান ক'রে উঠেছেন, মাথার তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না, নানাজায়গায় খুঁজে হয়রান হয়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুলতে গিয়ে দেখেন তার নীচেই তাজ চাপা আছে—যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নীচে খুঁজেছেন।.....তাঁর প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বার হারিয়ে গেল, আবার পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল। তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হ'তে লাগল, যা কোন কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়।.....তরল-মস্তিষ্ক বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচার-জর্জরিত নরনারায়ণ রায় ঠিক করলেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি একটু ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুশি হ'লেও বাইরে স্ত্রীকে বললেন—দু'দিনের জন্য এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যে রকম বিব্রত ক'রে তুলেছ, ও আর কখনো এখানে আসবে না।

দিন-কয়েক এ রকমে কাটবার পর কীর্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হ'ল। নরনারায়ণ রায়ও বন্ধুপত্নী কখন কি ক'রে বসে, সেই ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করবার পর নিজের বজ্‌রায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মী দেবী ব'লে দিলেন—এবার আবার যখন আসবে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাত-দিন তোমার জিনিসপত্র ঘরে ব'সে চৌকি দেবে—বুঝলে তো?

নরনারায়ণ রায়ের বজ্‌রা রায়মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জল-দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ল। তখন মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্রে বজ্‌রার দক্ষিণ দিকের দিগ্‌বলয়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝক্‌ঝক্‌ করছিল, সমুদ্রের সে অংশে এমন কোনো নৌকো ছিল না—যারা সাহায্য করতে আসতে পারে। সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সামনেই বার সমুদ্র—সন্দ্বীপ চ্যানেল, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি। নরনারায়ণের বজ্‌রার রক্ষীরা কেউ হত হ'ল, কেউ সাংঘাতিক জখম হ'ল। নিজে নর-নারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে উরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞা-শূন্য হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হ'লে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন, তাঁর সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে।.....খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন, যাকে নক্ষত্র ব'লে মনে হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেজের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে।

আরো ক'দিন আরো ক'রাত কেটে গেল। কেউ তাঁর জন্যে কোন খাদ্য আনলে না। তিনি বুঝলেন, যারা তাঁকে এখানে এনেছে, তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু! সামনে নির্মম মৃত্যু!.....

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন-দেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গবাক্ষ-পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল।..... তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শয্যায় ক্ষুধা-কাতর দেহ প্রসারিত ক'রে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।.....প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে যেন সেই দয়াময়ী মৃত্যু-তন্দ্রা এসে তাঁকেও আশ্রয় করলে। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিনি বুঝতে পারলেন না—হঠাৎ আলো চোখে লেগে তাঁর তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন, তাঁর সামনে প্রদীপ-হস্তে দাঁড়িয়ে

তাঁর বন্ধু পত্নী লক্ষ্মী দেবী। কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন। লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। একবার নরনারায়ণের সন্দেহ হ'ল—এসব স্বপ্ন নয় ত? কিন্তু ঐ যে দীপশিখার উজ্জ্বল আলোয় আর্দ্র ভিত্তিগাত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায়।.....

নরনারায়ণ শক্তিমান যুবক, ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচবার উৎসাহে তিনি দৃঢ়পদে অগ্রবর্তিনী, ক্ষিপ্রগামিনী বন্ধুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পার হবার পর তিনি দেখলেন যে তাঁরা কীর্তি রায়ের প্রাসাদের সামনের খাল-ধারে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ্মী দেবী একটা ছোট বেতেবোনা থলি বার ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এতে খাবার আছে, এখানে থেও না, তুমি সাঁতার জানো, খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর যত শীগ্‌গির পারো পালিয়ে যাও।

ব্যাপার কি নরনারায়ণ রায় একটু একটু বুঝলেন। তাঁর বিস্তৃত জমিদারী কীর্তি রায়ের জমিদারীর পাশেই এবং তাঁর অবর্তমানে কীর্তি রায়ই দনুজমর্দনদেবের বংশ-ধরদের ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অত বড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি সৈন্যসামন্ত কীর্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্য করবেন? কীর্তি রায় যে মাথা নাচু ক'রে আছেন, তার এই কি কারণ নয় যে, তাঁর একপাশে বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ—অন্যপাশে ভুলুয়ার প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য?

প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখলেন, তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখে সে চটুল হাস্যরেখার চিহ্নও নেই, তাঁর মুখখানি সহানুভূতিতে-ভরা মাতৃমুখের মতন স্নেহ-কোমল হয়ে এসেছে। তাঁদের চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার ওপর আকাশের বুক চিরে দিগন্ত-বিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়াপথ, নিকটেই খালের জল জোর ভাঁটার টানে তীরের হোগলা গাছ দুলিয়ে কল্‌কল্‌ শব্দে বড় নদীর দিকে ছুটেছে।.....নরনারায়ণ আবেগপূর্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, চণ্ডলও কি এর মধ্যে আছে?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—না ভাই, তিনি কিছু জানেন না। এসব শ্বশুরঠাকুরের কীর্তি। এই জন্যে তাঁকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন, এখন আমার মনে হচ্ছে। গৌড়-টৌড় সব মিথ্যে।

নরনারায়ণ দেখলেন, লজ্জায় দুঃখে তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মী দেবী আবার বললেন—আমি আজ জানতে পারি। খিড়কি গড়ের পাইক সর্দার আমায় মা বলে, তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই .....

নরনারায়ণ বললেন—বৌ-ঠাকরুণ, আমার এক বোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল—তুমি আমার সেই বোন, আজ আবার ফিরে এলে।

লক্ষ্মী দেবীর পদ্মের মতন মুখখানি চোখের জলে ভেসে গেল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—ভাই, বলতে সাহস পাইনে, তবুও একটা কথা বলছি—বোন ব'লে যদি রাখ.....

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা বৌ-ঠাকরুণ?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—তুমি আমার কাছে ব'লে যাও ভাই যে শ্বশুরঠাকুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি করবে না?

নরনারায়ণ রায় একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌ-ঠাকরুণ, তোমার কাছে ব'লে যাচ্ছি—তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার শ্বশুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা করব না।

বিদায় নিতে গিয়ে নরনারায়ণ একবার জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, তুমি ফিরে যেতে পারবে তো?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—আমি ঠিক যাব, তুমি কিন্তু যত দূর পার সাঁতরে গিয়ে তারপর ডাঙায় উঠে চ'লে যেও।

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে প'ড়ে মিলিয়ে গেলেন.....

লক্ষ্মী দেবীর প্রদীপটা অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়েছিল—তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে ফিরলেন। একটু দূরে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, পাশের ছোট খালটায় দু'খানা ছিপ মশালের আলোয় সজ্জিত হচ্ছে—ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জ'মে গেল—সর্বনাশ! এরা কি তবে জানতে পেরেছে? দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখে এসে তিনি দেখলেন সুড়ঙ্গের পথ খোলাই আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কীর্তি রায় বুঝতেন নিজের হাতের আঙুলও যদি বিষাক্ত হয়ে ওঠে তো তাকে কেটে ফেলাই সমস্ত শরীরের পক্ষে মঙ্গল।.....পরদিন আবার দিনের আলো ফুটে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মী দেবীকে আর কোন দিন কেউ দেখেনি। রাতের হিংস্র অন্ধকার তাঁকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল।.....

নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে ব'সে সব শুনলেন—গুপ্ত সুড়ঙ্গের দু'ধারের মুখ বন্ধ ক'রে কীর্তি রায় তাঁর পুত্রবধূর শ্বাসরোধ ক'রে তাঁকে হত্যা করেছেন। শুনে তিনি চুপ ক'রে রইলেন।.....এর কিছুদিন পরে তাঁর কানে গেল.....বাশুন্তার লক্ষ্মণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চণ্ডলের বিয়ে।

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোয় সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দৃঢ়চিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও চোখের পাতা যেন ভিজে উঠল। তাঁর মনে হ'ল তাঁর অভাগিনী বৌ-ঠাকুরাণীর হৃদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে.....মনে হ'ল, তাঁরই অন্তরের শ্যামলতায় জ্যোৎস্না-ধৌত বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল-সুন্দর শ্রী...নীরব আকাশের তলে তাঁরই চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নব-মল্লিকার মতন ফুটে উঠেছে।.....নরনারায়ণ রায়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দুর্ধর্ষ ভূম্যধিকারী দস্যু—হঠাৎ পূর্বপুরুষের সেই বর্বর রক্ত নরনারায়ণের ধমনীতে নেচে উঠল, তিনি মনে মনে বললেন—আমার অপমান আমি এক রকম ভুলেছিলাম বৌ-ঠাকরুণ, কিন্তু তোমার অপমান আমি সহ্য করব না কখনও।

কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন এক শীতের ভোর রাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কীর্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে, সুলুপে, জাহাজে ভ'রে গিয়েছে। তোপের আওয়াজে কীর্তি রায়ের প্রাসাদ দুর্গের ভিত্তি ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগল। কীর্তি রায় শুনলেন, আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়, সঙ্গে দুরন্ত পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাণ্টিও গঞ্জালেস্। উভয়ের সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোষা খালের মুখে চড়াও হয়েছে, পুরা বহরের বাকি অংশ বাহির নদীতে দাঁড়িয়ে।

এ আক্রমণের জন্য কীর্তি রায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন—কেবল প্রস্তুত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে গঞ্জালেসের যোগদানের জন্য। রাজা রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর ধ'রে শত্রুতা চ'লে আসছে, এ অবস্থায় গঞ্জালেস্ যে তাঁদের পত্তনিদার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে—এ কীর্তি রায়ের

কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তা হ'লেও কীর্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চলল।

গঞ্জালেস্ সুদক্ষ নৌ-বীর। তার পরিচালনে দশখানা সুলুপ চড়া ঘুরে গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুকতে গিয়ে কীর্তি রায়ের নওয়ারার এক অংশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রখর যে খালের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস্ দু'খানা কামান-বাহী সুলুপ ছোট খালের মুখে রেখে বাকিগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালে। গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্যতম জলদস্যু —মাইকেল রোজারিও ডি ভেগা এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক আক্রমণ করবার জন্যে আদিষ্ট হ'ল।

অতর্কিত আক্রমণে কীর্তি রায়ের নওয়ারা শত্রু-বহর কর্তৃক ছিপি-আঁটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আটকে গেল—বার নদীতে গিয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারলে না। কীর্তি রায়ের নৌ-বহর দুর্বল ছিল না, কীর্তি রায়ের গড় থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আড্ডা সন্দ্বীপ খুব দূরে নয়, কাজেই কীর্তি রায়ের নৌ-বহর সুদৃঢ় ক'রে গড়তে হয়েছিল।

বৈকালের দিকে রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিকটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।.....নরনারায়ণ রায় দেখলেন প্রায় ত্রিশখানা কোষা জখম অবস্থায় খালের মুখে প'ড়ে, কীর্তি রায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ, নদীর দু'পাড় ঘিরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঊর্ধ্বে নিস্তব্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র এক ঝাঁক শকুনি কীর্তি রায়ের গড়ের উপর চক্রাকারে ঘুরছে.....হঠাৎ বিজয়োন্মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধু-পত্নীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদভরা ম্লান মুখখানি, কাতর মিনতিপূর্ণ সেই চোখ দুটি মনে পড়ল—তীব্র অনুশোচনায় তাঁর মন তখনি ভরে উঠল।.....তিনি করেছেন কি! এই রকম করে কি তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রাণদাত্রীর শেষ অনুরোধ রাখতে এসেছেন?.....

নরনারায়ণ রায় হুকুমজারি করলেন—কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়।

একটু পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নেই। নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিনি তখনি নিজে গড়ের মধ্যে ঢুকলেন। তিনি এবং গঞ্জালেস্ গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন—দেখলেন সত্যিই কেউ নেই। পর্তুগীজ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুঠপাট করতে গিয়ে দেখলে মূল্যবান দ্রব্যাদি বড় কিছু নেই। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লুঠপাট চলল.....কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না। অপরাহ্নে কেবলমাত্র দু'খানা সুলুপ খালের মুখে পাহারা রেখে নরনারায়ণ রায় ফিরে চলে গেলেন।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে, পর্তুগীজ জলদস্যুর দল লুঠপাট ক'রে চ'লে গেলে, কীর্তি রায়ের এক কর্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে পেলে একজন আহত মুমূর্ষু লোক তাকে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে সে লোকটাকে চিনলে—লোকটি কীর্তি রায়ের পরিবারে এক বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারী। তাঁর মৃত্যুকালীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্মচারীটি মোটামুটি যা বুঝলে, তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠল। সে বুঝলে কীর্তি রায় তাঁর পরিবারবর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নীচের এক গুপ্তস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটিই একমাত্র তার

সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই থাকত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে দিলে তা থেকে বেরুবার উপায় ছিল না।.....কোথায় সে মাটির নীচে ঘর, তা স্পষ্ট ক'রে বলবার আগেই আহত লোকটি মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্ অংশে সে গুপ্ত-গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারলে না।

এই রকমে কীর্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গড়ের যে কোন্ নিভৃত ভূগর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তার আর কোন সন্ধানই হল না.....সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্বতপ্রমাণ মাটি-পাথরের চাপে হতভাগ্যদের সাদা হাড়গুলো কোন্ বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূ-কক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার খবর পর্যন্ত জানে না।

ওই ছোট খালটা প্রকৃতপক্ষে সন্দ্বীপ চ্যানেলেরই একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিত কীর্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্তমান আছে দেখা যাবে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শূলোকাঁটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দীঘি চোখে পড়বে। তারই দক্ষিণে কুচো ইঁটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্ধ-প্রোথিত হাঙ্গর-মুখো পাথরের কড়ি, ভাঙ্গা থামের অংশ—বারভূঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে, বর্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে। দীঘির যে ইষ্টক সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে উঠত, এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা-কেউটে সাপের দল ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায়।

বহুদিন থেকেই এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বন-ভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে.....সন্দ্বীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মুখে জোনাকির মতন জ্বলতে থাকে.....তখন খাল দিয়ে নৌকো বেয়ে যেতে যেতে মোম-মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করছে—ওগো পথযাত্রীরা ওগো নৌকাযাত্রীরা.....আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম.....দয়া করে আমাদের তোল.....ওগো আমাদের তোল.....

ভয়ে বেশী রাত্রে এ-পথে কেউ নৌকো বাইতে চায় না।

প্রবাসী. আষাঢ়, ১৩৩১

হাসি

স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভেতরে বাইরে কোথাও অন্য লোক ছিল না, বেয়ারাটাকেও ডেকে ডেকে পাওয়া গেল না। অগত্যা চায়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কয় বন্ধুতে বেশ ক'রে র‍্যাগ টেনে নিয়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

মাঘের শেষ যদিও, শীত কিন্তু বাংলা দেশের পৌষ মাসের চেয়েও বেশী। রমেন বললে—ওহে, তোমরা যা বোঝো করো, আমি কিন্তু চা নইলে রাত কাটাতে পারবো না। বসো তোমরা, একটা ব্যবস্থা দেখি.....

দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীক্ষ্ণ শীতল পশ্চিমে বাতাস তীরের মত ঘরে ঢুকতেই আমরা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলাম.....রমেন ততক্ষণে চলে' গিয়েছে। খোলা দোরটা বন্ধ করে দিতে গিয়ে চেয়ে দেখি বাইরে বেজায় কুয়াসা। পৃথ্বীশ আমাদের দলের দার্শনিক। এতক্ষণ সে র‍্যাগ দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে শুয়েছিল, হঠাৎ মুখ খুলে গম্ভীরভাবে বললে—দেখ, আমার কিন্তু একটা Uncanny Sensation হচ্ছে, কেন বল তো?

আমি বললাম—কি ভাবের Uncanny? ভূত টুত?

সে র‍্যাগ খুলে ফেলে ইজি-চেয়ারে উঠে বসলো। চারিধারে চেয়ে দেখে বললে—তা ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন যেন.....

আমরা সকলেই ততক্ষণে পুনরায় খাড়া হয়ে উঠে বসেছি। সলিল বললে—বিচিত্র নয়। আমি একটা ব্যাপার জানি, এই রকম একটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত দশটার পরে লোক থাকতে পারতো না। শুধু তাই নয়, একবার অনেক রাত্রের ট্রেনে এক ভদ্রলোক নেমে রাত্রের মত স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই ছিলেন—সকালেও তিনি ওঠেন না দেখে সকলে তুলতে গিয়ে দেখলো তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মুখ উপুড় করে পড়ে আছেন। তারপর অনেক যত্নে তাঁর জ্ঞান হয়। তিনি সকলের কাছে বলেন, শেষরাত্রির দিকে এক সাহেব এসে তাঁকে ওঠায়। পরে হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা ক্ষুর বার করে নিজের গলায় বসিয়ে এমন জোরে টানতে থাকে যে কাঁচা চামড়া কাটার অস্বস্তিকর খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজে তাঁর সারা শরীর শিউরে ওঠে। তিনি চীৎকার করে লোক ডাকতে যেতেই দেখেন কেউ কোথাও নেই, সাহেবের চিহ্নও নেই ঘরে—তারপর কি হোল তিনি আর জানেন না। সেই স্টেশনে ওয়েটিংরুমের বাথরুমটার মধ্যে এক ছোকরা সাহেব এঞ্জিনীয়ার কি জন্যে একবার ঠিক ওই ভাবে গলায় ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারপর থেকেই এই ব্যাপার.....

আমরা সকলে আমাদের বাথ-রুমটার দিকে চেয়ে দেখলাম। লুপ-লাইনের নির্জন পাহাড়ে জঙ্গলের ধারে, লাইনের ও-পারে কেবল স্টেশন-মাস্টারের কোয়াটারটা এবং লেভেল-ক্রসিং-এর ফটকে দারোয়ানের গুমটি। ওয়েটিংরুমের বাইরে স্টেশনের হাতার পরেই একটা ছোট্ট পান-সিগারেটের ও চা-এর দোকান। দিনমানে এমন কি.....সন্ধ্যার একটু পর পর্যন্তও দেখেছিলাম, তার পর থেকেই আর দোকানীর পাত্তা নেই—দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে।

গল্প ভাল করে জমতে না জমতে হঠাৎ দোরটা খুলে গেল। একটা কুলীর হাতে কাঁসার থালার ওপর গোটা আষ্টেক পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে ঢুকলো হাসিমুখে রমেন। ঢুকেই বললে—দেখছো? Where there is a will, there is away। বলেছিলাম না চায়ের ব্যবস্থা করবোই? স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, তাঁর বাড়িও আমাদের জেলায়। তিনি বললেন—বিলক্ষণ, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, বাঙালী. চা খাবেন এ তো সৌভাগ্য। ছাড়লেন না কিছুতেই, নিজের বাসা থেকে তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন.....

রমেনের কথা শেষ হতে না হতে দোর ঠেলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। রমেন প্রায় খেলার পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে বললে—এই যে মিত্তির-মশায়,—আসুন আসুন। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—ইনিই এখানকার স্টেশনমাস্টার হরিদাসবাবু। আসুন

বসুন।

ততক্ষণে হরিদাসবাবু টেবিলের সামনের হাতলশূন্য বেতের কেদারাটাতে আমাদের সকলের উদ্দেশে অভিবাদনের জন্যে হাত উঁচু করে গরুড়ের মত বসে আছেন। মিত্তির-মশায়ের বয়স পঁতাল্লিশের কম নয়, দোহারা গড়ন, কানের পাশের চুলগুলোতে বেশ পাক ধরেছে—গোঁপ-দাড়ি কামানো। পশ্চিমের আটা-জলে বেশ স্বাস্থ্যবান শরীর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখানে কত দিন আছেন মিত্তির-মশায়?

—আজ্ঞে, এই আসছে ফেব্রুয়ারীতে দেড় বছর হবে। বড় কষ্ট মশাই, মাছ তো একেবারে মেলে না, বাঙালীর মুখ মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আপনারা আজ এসেছেন শুনে ভারী আনন্দ হোল। উনি চায়ের কথা যেমন তুললেন, আমি বললাম—তার আর কি, আমার বাসা যখন নিকটেই রয়েছে, তখন কি আর.....তা আপনারা কতদূর যাবেন সব?

—আমরা সাইকেলে দিল্লী যাবো বলে বেরিয়েছি, ও-পার থেকে আসছি কি না? এইখানে নদী পার হয়ে ভাগলপুরের পথ ধরে গিয়ে গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডে উঠবো ইচ্ছে আছে—ভাগলপুরের গাড়িটা ঠিক এখানে ক'টায় পাওয়া যাবে কাল সকালে?

তারপর অনেক কথাবার্তা ও আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এবং কথিত ট্রেন-ঘটিত নানা আবশ্যকীয় সংবাদের আদানপ্রদানের পর কথাবার্তার বেগ মন্দীভূত হয়ে পড়লো।

কারুরই ঘুম পাচ্ছিল না, বিশেষ করে গরম চা খাবার পরেই আলস্য ও তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেরই শরীর যেন বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। নির্বাণোন্মুখ কথাবার্তার শিষটাকে পুনরায় খোঁচা দিয়ে প্রতীপ্ত করার জন্যেই আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এ ওয়েটিংরুমের বাথ-রুমে ভূতটুত নেই তো? এ প্রশ্নের পরে সলিলের সেই অজ্ঞাত স্টেশনটির বাথ-রুম ও ছোকরা এঞ্জিনীয়র সাহেবের গল্প পুনরায় ফিরে এল। পুনরায় আমাদের একচোট হাসি হোল এবং কেউ কেউ এমন ভাবের ভান করলেন যে এ-স্টেশনের বাথ-রুম সম্বন্ধেও তাঁরা ভয়ের ধারণা পোষণ করেন।

রমেন বললে—যত সব গাঁজাখুরি.....

হরিদাসবাবু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। আমাদের উপহার দেওয়া সিগারেটের চতুর্থটির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি হাই তুলে খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন—আপনারা হাসবেন হয়তো কিন্তু আমার নিজের জীবনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি শুনুন।

পরে তিনি পঞ্চম সিগারেটটি ধরিয়ে নিজের অদ্ভুত গল্পটি বলে' গেলেন।

অনেকদিনের কথা। আমার বয়স তখন খুব বেশী না হলেও বারো-তেরোর কম নয়। আমার এক কাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন এবং সে সময়ে তিনি খুলনা মরেলগঞ্জ আউট-পোস্টে থাকতেন। একবার কি উপলক্ষে তা এখন ঠিক স্মরণ হয় না, আমি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে কাকার কাছে বেড়াতে যাই। কাকা তখন ছিলেন খুলনার বাসাতে, সেইখানেই অনেকদিন আমরা ছিলাম। বেশীদিন থাকবার কথাবার্তা হওয়াতে আমি সেখানকার একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমরা পূজোর পরটাতেই সেবার খুলনা যাই। কয়েক মাস পড়বার পরে গ্রীষ্মের ছুটি হোল প্রায় একমাসের ওপর। কাকাকে ধরলাম তাঁর সঙ্গে তাঁর-কার্যস্থান মরেলগঞ্জে যাবো। কাকা আমায় নিয়েও গেলেন। সেই সময়টা মোম-মধু সংগ্রাহকদের লাইসেন্স নতুন করে করবার সময়। কেউ ফাঁকি দিয়ে পুরানো লাইসেন্সের বলে জঙ্গলে মোম-

মধু সংগ্রহ করে কিনা পাহারা দেবার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বোট ও স্টীমলঞ্চ সব সময় সুন্দরবনের নদী, খাড়ি ও খালের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিত। কতবার আমি কাকার সঙ্গে এই সরকারী বোটে সুন্দরবনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছি!

আমার মনে এই সুন্দরবনের একটা অপূর্ব স্বপ্নছবি মুদ্রিত আছে। তখন আমি ছেলেমানুষ, সবে তেরো—শহর থেকে গিয়েছি। সুন্দরবনের অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য এই এক মাসের প্রতিদিন আমার ক্ষুধার্ত ব্যগ্র বালক-মনে কি আনন্দের বার্তা বয়ে আনতো তা আমি মুখে আপনাদের বোঝাতে পারি না। আর কখনও সে-দেশে যাইনি, অনেক-দিনের কথা হলেও এখনো মাঝে মাঝে সুন্দরবনের—বিশেষ ক'রে জ্যোৎস্না-ওঠা সুন্দর-বনের ছবি.....অপরিসর খালের শঠির জঙ্গলে ভরা ঢালু পাড়.....নতুন পাতা-ওঠা গাব-গাছের ও বন্য গোল-গাছের সারি.....খাড়ির মুখে জোয়ারের শব্দ, যখনই মনে হয়, একটা জিনিসের জন্যে বেদনায় এই বয়সেও মনটা কেমন করে ওঠে।

সেদিনের কথাটা আমার বেশ মনে আছে। সুন্দরবনের সেই অংশটা তখন জরীপ হচ্ছিল—তাদের একটা বড় লঞ্চ বড়-গাঙের মাঝখানে বাঁধা থাকতো। দুপুরবেলা সেদিন সেই লঞ্চটাতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। চার-পাঁচজন আমীন, একজন কানুনগো, একজন কেরানী—সবাই বাঙালী, সবসুদ্ধ সাত-আটজন লোক লঞ্চটাতে। খাওয়া-দাওয়াটা খুব গুরুতর রকমের হোল, তারপর একটু গান-বাজনাও হোল। বেলা পড়ে গেলে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের বজরাটা ছাড়লাম।

ক্রমে রাত হোল, জ্যোৎস্না উঠলো। খালের দু'ধারের নতুন পাতা-ওঠা বনের মাথাটা জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্‌ করছিল। দূর থেকে নৈশ পাখীর দু'একটা অদ্ভুত রকমের ডাক কানে আসছিল। জোয়ারের জলে মগ্ন গোল-গাছের আনত শাখাগুলো ভাঁটার পরে একটু একটু করে জল থেকে উঠতে লাগলো.....বাঘের উপদ্রবের ভয়ে সব সময় আমাদের বজরাতে দু'জন বন্দুকধারী সিপাহী থাকতো, তারা বজরার ও-ধারের তোলা-উনুনে রান্না চাপিয়ে দিলে।

রাতটা বড় গরম, গুমোট ধরনের। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল না, চারিদিকে একটা নীরব থমথমে ভাব। ছই-এর ভেতরে থাকবার উপায় নেই। বজরার ছাতে তক্তার পাটাতনের ওপর এ-সব গ্রীষ্মের রাতে শুয়ে থাকতে খুব আরাম বটে, কিন্তু অপরিসর খালের দু'ধারের ঘন বন থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বার ভয়ে সেখানে থাকবার যো ছিল না। ছই-এর মধ্যে বসে কাকা ও বিনোদবাবু দাবা খেলছিলেন। ছই-এর ঘুলঘুলিগুলো সব খোলা, আমি নিকটে বসে বই পড়ছি।

খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেল দশটার বেশী। সিপাহীদের রান্না হয়ে গেল।

কাকা কি-একটা কঠিন চাল সামলাবার কথা একমনে ভাবছেন—আমি মিটমিটে আলোতে আখ্যান-মঞ্জরী পড়ছি—বিনোদবাবু খেলোয়াড়কে সমস্যায় ফেলবার আত্মপ্রসাদে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘুলঘুলির বাইরে ভাঁটার টান ধরা জলের দিকে চেয়ে আছেন। দীর্ঘ বন-গাছের ছায়া পড়েছে জলের ওপর।

এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটলো।

সামনের ঘন বনের মধ্যে অনেক দূর থেকে একটা উচ্চ সুস্পষ্ট কর্কশ অট্টহাসির রব উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.....

অবিকল মানুষের গলার আওয়াজের মত হলেও মনে হোল যেন এটা অমানুষিক অস্বাভাবিক স্বর। আমরা কিছু ভাববার পূর্বেই সেইরকম আর একবার এবং তারপর আবার।.....হাসির শব্দটা এত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ যে মনে হোল বনের গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে.....মাটি যেন কাঁপছে.....বোটটা যেন দুলছে!

সিপাহীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে এল। কাকা, বিনোদবাবু, আমি সকলেই ছই-এর বাইরে এলাম। গাছপালা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হাওয়া নেই, পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না—সুমুখে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ বন-গাছের আড়ালে ঢলে পড়ছে।.....

বিনোদবাবু বললেন—কি মশাই রামবাবু? ব্যাপারটা কি?

মাঝিরা ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বজরার মাস্তুলের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছে।

আমরা সকলে ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় আবার সেই হাসির শব্দটা উঠলো— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.....

শব্দটা এত ক্রূর ও মর্মস্পর্শী যে আমাদের সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাঝিরা দুই কানে হাত দিয়ে বলে উঠলো—আল্লা! আল্লা! কাকা ও বিনোদবাবু ছই-এর মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কাকা বললেন—কি মশাই, হায়েনা নাকি? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে ও গলার সুরে মনে হলো, তিনি কথাটা নিজেই বিশ্বাস করেন না। তারপর পরামর্শ হোল নৌকোটা সেখান থেকে সরানো যায় কি না। কিন্তু ভাঁটার টান এত বেশী যে, বড়-গাঙের টান ঠেলে তত রাত্রে কোন মতেই অত ভারী বজরাটা উজানে নেওয়া চলে না। অগত্যা সেইখানেই রাত কাটাতে হোল। সবাই জেগে রইলো, কারুর চোখে ঘুম এল না সে রাত্রে।

শেষরাত্রে আর একবার শব্দটা শুনলাম। বনভূমি তখন নিস্তব্ধ—চাঁদ ডুবে গিয়ে নদী আকাশ বন সব অন্ধকারে একাকার! আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে, এমন সময় অন্ধকার-ভরা গভীর বনভূমির দিক থেকে আর একবার সেই বিকট হাসির রোল উঠলো। শেষ রাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে সেটা এত অমানুষিক, এত পৈশাচিক ঠেকলো যে তখন আমার বালক-বয়স হলেও হাসিটার প্রকৃত রূপ বুঝে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

সকালে জোয়ারের মুখে বজরা ছেড়ে আমরা দুপুরের সময় স্টীমলঞ্চে ফিরে এলাম। সেখানে সব কথা শুনে প্রধান সারেং খালাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বললে, ঐ শব্দটা এর আগেও তারা শুনেছে, তবে স্থানটা বড় গভীর বনের মধ্যে বলে' সে-দিকটায় লোক চলাচল খুব কম। শোনা গেল, ঐ বনের মধ্যে নাকি অনেক দূর গেলে প্রাচীন কালের ঘরবাড়ির চিহ্ন পাওয়া যায়। জংগলের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ বৃদ্ধ বকুল-গাছের সারি দেখে মনে হয় কোনো সময়ে সে-সব স্থানে লোকের বাস ছিল।

সে যাই থাকুক—আজও এতদিন পরে যখনই কথাটা মনে পড়ে তখনই এই কথাটাই মনে হয়, গভীর রাত্রির অন্ধকারে জনহীন জনপদের ধ্বংসস্তূপের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান কোন অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক উল্লাসভরা অট্টহাসিই সেদিন কানে গিয়েছিল।.....তাই হাসির রোলটা যখনই মনে আসে, আজও এতকাল পরেও যেন সারা শরীর শিউরে ওঠে।

প্রত্নতত্ত্ব

আমি এ গল্প আমার বন্ধু সুকুমারবাবুর মুখে শুনেছি।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহারা কিছু আলোচনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই কাছে ডাক্তার সুকুমার সেনের নাম সুপরিচিত। ডাক্তার সেন অনেক দিন গবর্ণমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। পাটনা excavation-এর সময়ে তিনি স্পুনার সাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন। মধ্যে দিনকতক তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের Curator-ও ছিলেন। বৌদ্ধ Iconography-তেও তিনি সুপণ্ডিত। "প্রাগ্-গুপ্ত যুগের মূর্তি-শিল্প" ও "ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের ক্রমবিকাশ" নামক তাঁর প্রসিদ্ধ বই দু'খানা ছাড়া এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে এবং বহু দেশী সাময়িক পত্রিকায় এ

বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর পড়বার ঘরটায় নানা স্থানের ভাঙা পুরনো ইট, ভাঙা কাঠের তক্তিবসানো তুলট কাগজ ও তালপাতার পুঁথির স্তূপ এবং কালো পাথরের তৈরী দেবদেবীর মূর্তির ভিড়ে পা দেওয়ার স্থান ছিল না। এই সব মূর্তির শ্রেণীবিভাগ করতে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। কোনো নতুন-আনা মূর্তি পেলে তিনি বেশ ভাল করে দেখতেন, তারপর টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—তারা"। দিনকতক পরে এ বর্ণনা তাঁর মনঃপূত হোত না। তিনি আপন মনে বলতেন—উঁহু, ওটা ললিতক্ষেপ pose হোল যে, তারা কি করে হবে? তারপর আবার 'লেন্স' হাতে মূর্তিটার এ-পিঠ ও-পিঠ ভাল করে দেখতেন। মূর্তিটার যে হাত ভাঙা, সেটার দিকে চেয়ে বলতেন—এ হাতটায় নিশ্চয় পদ্ম ছিল। হুঁ—মানে—বেশ বোঝা যাচ্ছে কি না? তারপর আবার পুরানো টিকিটের ওপর নতুন টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—জম্ভলা"। তাঁর এ ব্যাপার দেখে আমার হাসি পেত। আমার চেয়েও বিজ্ঞ লোকে ঘাড় নেড়ে বলতো—হ্যাঃ, ওসব চাকরিবাজী রে বাপু, চাকরিবাজী! নইলে কোথাকার পাটলিপুত্র কোথায় চলে' গেল, ওঁরা আজ খোঁড়া ইটপাথর সাজিয়ে হুবহু বলে দিলেন—এটা অশোকের নাট-মন্দিরের গোড়া, ওটা অশোকের আস্তাবলের কোণ; দেখতে দেখতে এক প্রকাণ্ড রাজবাড়ী মাটির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠলো!.....চাকরি তো বজায় রাখা চাই? কিছু নয় রে বাপ, ও-সব চাকরিবাজী!

তবে এ-সব কথার মূল্য বড়ই কম; কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার ও এ-সব বিজ্ঞ লোকের চিরদিন ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

সেদিন দুপুর বেলা ডাঃ সেন যখন তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে সেনরাজাদের শাসনকাল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, আমি তখন একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের মত সেখানে গিয়ে হঠাৎ হাজির হলাম। আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খানিকক্ষণ খোশ-গল্প করে সেখানে সারাদিনের মানসিক পরিশ্রম দূর করতে বুঝলাম তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। এ-কথা সে-কথার পর ডাঃ সেন বললেন—চা আনাই, একটা গল্প শোনো। এটা আমি কখনো কারুর কাছে বলিনি, তবে স্পুনার সাহেব কিছু কিছু শুনেছেন।

বাইরে সে দিন খুব শীত পড়েছিল। দরজা বন্ধ করে সুকুমার বাবুর গল্প শোনবার জন্য বসলাম। চা এল, চা খেতে খেতে সুকুমারবাবু তাঁর গল্প বলতে লাগলেন।

বিক্রমপুরের পুরানো ভিটার কথা বোধহয় কিছু কিছু শুনে থাকবে। এটা কতদিনের, তা সেখানকার লোকে কেউ বলতে পারে না। অনেক দিন ধরে ঢিবিটা ঐ রকমই দেখে আসছে—এটা কার বা কোন সময়ের তা তারা কিছুই বলতে পারে না।

ঢাকা মিউজিয়ম থেকে সেবার ঐ ঢিবিটা খোঁড়বার কথা উঠলো। এর পূর্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ শাখা থেকে ওটা কয়েকবার খোঁড়বার প্রস্তাব হয়—কিন্তু টাকার যোগাড় করতে না পেরে তাঁরা পিছিয়ে যান। আমার কাছে যখন কথা উঠলো, তখন আমারও মত ছিল না। কারণ, আমার মনে মনে ধারণা ছিল খরচ যা পড়বে তার তুলনায় আমাদের এমন বিশেষ কিছু পাবার আশা নেই। অবশেষে কিন্তু আমার আপত্তি টিকলো না। ওটা খোঁড়বার জন্যে টাকা বরাদ্দ হোল। আমি বিশেষ অনুরোধে পড়ে তত্ত্বাবধানের ভার নিলাম।

গিয়ে দেখলাম, যে-ঢিবিটা কাটাতে হবে তার কাছে আর একটা ঠিক তেমনি ঢিবি আছে। এই ঢিবির কাছে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তা প্রায় মজে এসেছে। ঢিবি দুটো খুব বড় বড়। ময়নাকাঁটার বন আর বড় বড় আগাছায় পশ্চিমদিকের ঢিবিটার ওপরের অংশ একেবারে দুর্গম। পূর্বদিকের ঢিবিটা একটু ছোট, তার পেছনের ঢালু দিকটায়

খানিকটা ফাঁকা ঘাসের জমি আছে। স্থানটা কতকটা নির্জন।

সাধারণতঃ খননকার্য আরম্ভ করবার সময় আমরা প্রথমটা প্ল্যান তৈরী করে নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। তারপর কাজ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আন্দাজে কতকটা খুব ক্ষীণ সূত্র ধরে, আমরা সেই প্ল্যান ক্রমে ক্রমে বদলে চলি। পাটনা excavation-এর সময় এতে খুব কাজ হয়েছিল। কিন্তু ছোটো দুটো গ্রাম্য ঢিবি খুঁড়ে তুলতে আমি এ-সব করবার আবশ্যক দেখলাম না। আমাদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন-কার্য চালিয়েছে এমন কোনো লোক ছিল না। তার কারণ এই যে, ওটা খোঁড়া হচ্ছিল ঢাকা P. W. D. থেকে।

এই ঢিবি দুটোর বড়টাকে ওখানকার লোকে বলে "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" ও ছোটটাকে বলে "টোলবাটীর ভিটা"। কারুর মতে এই নাস্তিক পণ্ডিত হলেন, বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রকার বল্লভাচার্য। তিনি শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম ত্যাগ করে, শাঙ্কর বেদান্তের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য দেশের লোকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে নারাজ হয়। কেউ কেউ বলেন, লল্লভাচার্য বিক্রমপুরের ত্রিসীমানায়ও জন্মান নি। তাঁদের ওটা ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ভিটা। যাক সে কথা। আমি কিন্তু জানতে পেরেছি ওখানে কে বাস করতেন। আমি যা জানতে পেরেছি, পূর্বে কেউ তা আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু জোর করে' কিছু বলতে পারেন নি। আমি জোর করে বলতে পারি, কিন্তু বলি নি। কেন বলি নি, আর কেমন করে আমি তা জানলাম, সেই-টেই বলবো।

কিছুকাল ধরে' ঢিবির ওপরকার বন কাটানো হোল। তারপর প্রকৃতপক্ষে খননকার্য শুরু হোল। আমার সঙ্গে বন্ধু ঢাকা মিউজিয়মে'র ক—বাবু ছিলেন। তিনি শুধু প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার চেয়ে বেশী—প্রত্নতত্ত্বগ্রস্ত। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে ও উৎসাহে আমরা এ কাজে হাত দিই। দিনের পর দিন ঢিবি দুটোর সামনে একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া-নিম গাছের ছায়ায় ক্যাম্প-চেয়ার পেতে আমরা তীর্থের কাকের মত বসে' থাকতাম। আমার বন্ধুর চোখ মুখের ভাব ও উৎসাহ দেখে আমার মনে হোত, তিনি আশা করেন, খুঁড়তে খুঁড়তে একটা পুরানো আমলের রাজবাড়ি-টাড়ি বা একটা তাল-পাতায় লেখা আস্ত বাংলা ইতিহাসের পুঁথি, অভাবপক্ষে সেই অজ্ঞাত নাস্তিক পণ্ডিতের fossil শরীরটাই বা মাটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে।

খুঁড়তে খুঁড়তে প্রথমে বেরুলো একটা মাটির ঘট। ও-রকম গড়নের ঘট এখন আর বাংলার কোনো জায়গায় তৈরী হয় কি না জানি না। ঘটের গলার নিচে থেকে তলা পর্যন্ত curve-টি যে দিয়েছিল, সে গ্রাম্য কুমোরটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। ঘটটার মধ্যে প্রায় আধঘট কড়ি। হিন্দুরাজত্বে কেনা-বেচার জন্যে কড়ি ব্যবহার হোত তা জান তো? কোন্ অতীত দিনে গৃহস্বামী ভবিষ্যৎ দুর্দিনের ভয়ে কড়িগুলো সযত্নে ঘটে ভরে' মাটির মধ্যে পুঁতে রেখে দিয়েছিলেন, সে ভবিষ্যৎ কত দিন হোল সুদূর অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে, সঞ্চিত অর্থের আর প্রয়োজন হয় নি। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক জিনিস বেরুতে লাগলো। আরও মাটির অনেক ভাঙা ঘট, কলসী, একখানা মরিচাধরা লাল রঙের তলোয়ার, একটা প্রদীপ, ভাঙ্গা ইটের কুচো এবং সকলের শেষে বেরুলো একটা কালো পাথরের দেবীমূর্তি। এই মূর্তিটিকে নিয়েই আমার গল্প, অতএব এইটাই ভাল করে বলি।

দেবীমূর্তিটা পাওয়া যায় টোলবাড়ির ভিটায়। মূর্তিটি রাজমহলের কালো পাথরের তৈরী, চক্‌চকে পালিশ করা। বহু দিন মাটির তলায় থেকে সে পালিশ যদিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মোটের ওপর তখনও যা ছিল, তা খুব কম মূর্তিতেই আমি দেখেছি।

মূর্তিটি সরস্বতী দেবী হলেও, তাতে বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের কিছু প্রভাব আছে বলে মনে হয়েছিল। হাতে বীণা না থাকলেও দেবী না হয়ে দেবমূর্তি হলে, তাকে মঞ্জুশ্রী মূর্তি বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারতো।

মূর্তিটা যখন পরিষ্কার করে আমার সামনে আনা হোল, তখন তার দিকে চেয়েই আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। অনেক মূর্তি গত পনরো বৎসর ধরে পরীক্ষা করে আসছি—কিন্তু এ কি? বাটালির মুখে পাথর থেকে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে কি করে! খানিকক্ষণ একদৃষ্টে মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলাম। আমি খুব কল্পনাপ্রবণ নই, কিন্তু সেদিন সেই নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় পত্রবিরল ঘোড়া-নিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অল্পক্ষণ.....অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যে মনের মধ্যে এক অপূর্ব ভাব.....সৌন্দর্যে ঝলমল চক্‌চকে কালো পাথরের পালিশ করা নিটোল সে দেবীমূর্তির, তার মুখের দৃঢ়রেখাগুলির, দেহের গঠনের শিল্পভঙ্গির হাতের আঙ্গুলগুলি বিন্যাসের সুন্দর ধরনের.....সকলের ওপর মূর্তির মুখের সে হাসি-মাখা জীবন্ত সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শিল্পের যে প্রভাব কালকে তুচ্ছ করে, যুগে যুগে মানুষের প্রাণ স্পর্শ করছে, তার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় সেই আমার প্রথম হোল। জয় হোক সে অতীত যুগের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর .....জয় হোক তার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার!

মূর্তিটাকে বাড়ি নিয়ে এসে, আমার লাইব্রেরীতে কাগজ-চাপা ধ্যানিবুদ্ধের দলের মধ্যে তাকে রেখে দিলাম। রোজ সকালে উঠে দেখতাম—দীর্ঘ ভ্রূ-রেখার নীচে বাঁশপাতার মত টানা চোখ দুটোর কোণ হাসিতে যেন দিনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন ধরে নানা কথা মনে হতে লাগলো। খুঁড়তে খুঁড়তে এমন কোনো জিনিস পাই নি, যাতে মূর্তিটির বা ভিটার সময় নিরূপণ করতে পারি। তবে মূর্তিটি গুপ্তযুগের পরবর্তী সময়ের এবং পূর্ববঙ্গের শিল্পীর হাতে তৈরী, এটা আমি তার মাথার ওপর ছাতার মত চিহ্ন দেখে কতকটা আন্দাজ করতাম। পাথরের মূর্তির মাথার ওপর এই গোল ছাতার মত চিহ্ন, পূর্ববঙ্গের ভাস্কর্যের একটা রীতি—এ আমি অন্য অন্য মূর্তিতেও দেখেছি।

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যাবেলাটা আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে এক বাজী দাবা খেলে সকাল সকাল শুতে গেলাম।

এইবার যে কথা বলবো, সে কেবল তুমি বলেই তোমার কাছে বলছি—অপরের কাছে এ কথা বলতে আমার বাধে ; কারণ, তাঁরা আমায় বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাতে কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কিসের অত্যন্ত সুগন্ধ পেলাম। পূজার মন্দিরে যেমন ধূপধুনো গুগ্‌গুল, ফুল, ঘি-চন্দন সবসুদ্ধ মিলে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ পাওয়া যায়, এটা ঠিক সেই ভাবের। সুগন্ধটা আমার নিদ্রালস মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে আমায় কেমন একটা নেশায় অভিভূত করে ফেললো। রাত ক'টা হবে ঠিক জানি না.....মাথার কাছে ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছিল.....হঠাৎ দেখলাম, খাট থেকে কিছু-দূরে ঘরের মেঝেয় কে একজন দাঁড়িয়ে.....তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, পরণে বৌদ্ধ পুরোহিতের মত হলদে পরিচ্ছদ.....মুখের হাতের অনাবৃত অংশের রং যেন সাদা আগুনের মত জ্বলছে.....বিস্মিত হয়ে জোর করে চোখ চাইতেই সে মূর্তি কোথায় মিলিয়ে গেল!.....বিছানায় তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো.....ভাল করে চোখ মুছলাম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম আরে গেল যা, রাত দুপুরের সময় এ যে দেখছি ছেলেবেলাকার সেই Abu Ben Adhem (may his tribe increase)! খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থাকবার পর ঠিক করে নিলাম, ওটা ঘুমের ঘোরে কি রকম চোখের ধাঁধা দেখে থাকবো। তারপর আবার শুয়ে পড়লাম, একটু পরে বেশ ঘুম এল।

কতক্ষণ পরে জানি না, আবার কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল.....ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সুগন্ধটা পেলাম.....আবার সেই নেশা! এবার নেশাটা যেন আমায় পূর্বের চেয়েও বেশী অভিভূত করে' ফেললে.....তার পরই দেখি, সেই মুণ্ডিত-মস্তক পীতবসন জ্যোতির্ময় বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার খাটের অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন!.....

তারপর আরও কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটলো।

হঠাৎ আমার ঘরের দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল.....দেখলাম, এক বিস্তীর্ণ স্থান, কত বাড়ি শ্বেত-পাথরের বাঁধানো কত চত্বর, কত গম্বুজ, দেউল .....অনেক মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর মত পরিচ্ছদ-পরা লোকেরা এ-দিক ও-দিক যাতায়াত করছেন, অসংখ্য ছাত্র ঘরে ঘরে পাঠনিরত.....একস্থানে অশোক-বৃক্ষের ছায়ার শ্বেত-পাথরের বেদীতে একদল তরুণ যুবক পরিবৃত হয়ে বসে আমার পরিচিত সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু! দেখে মনে হোল, তিনি অধ্যাপনায় নিরত এবং যুবক-মণ্ডলী তাঁর ছাত্র। অশোক-কুঞ্জের ঘন পল্লবের প্রান্তস্থিত রক্ত-পুষ্পগুচ্ছের পাপড়ি গুরু ও শিষ্যবর্গের মাথার ওপর বর্ষিত হতে লাগলো।

দেখতে দেখতে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল.....আমার তন্দ্রালস কানের মধ্যে নানা বাজনার একটা সম্মিলিত সুর বেজে উঠলো.....এক বিরাট উৎসবসভা! উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে সভা ভরে ফেলেছে.....সব যেন অজন্তার গুহার চিত্রিত নরনারীরা জীবন্ত হয়ে উঠে বেড়াচ্ছে। কোন্ প্রাচীন যুগের হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছদ.....সভার চারিধারে বর্শাহাতে দীর্ঘদেহ সৈনিকরা দাঁড়িয়ে, তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াগুলো মূল্যবান সাজ পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে.....সভার মাঝখানে রক্তাম্বর-পরণে চম্পক-গৌরী কে এক মেয়ে.....মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ইস্পাতের বর্ম আঁটা এক যুবক, তার কোমরে ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের খাপে বাঁকা তলোয়ার দুলছে.....গলায় ফুলের মালা .....মুখে বালকের মত সরল সুকুমার হাসির রেখা। মেয়েটির নিটোল সুন্দর হাতটি ধরে যুবকের দৃঢ় পেশীবহুল হস্তে যিনি স্থাপন করলেন—ভাল করে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার রাতের বিশ্রামের ব্যাঘাতকারী সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

বায়স্কোপের ছবির মত বিবাহ-সভা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমার হাত-পা যেন খুব ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো। শীতে দাঁতে দাঁত লাগতে লাগলো.....পায়ের আঙুল যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। চোখের সামনে এক বিস্তীর্ণ সাদা বরফের রাজ্য,.....ওপর থেকে বরফ পড়ছে—তুষার-বাষ্পে চারিধার অস্পষ্ট.....সামনে পেছনে সুউচ্চ পর্বতের চূড়া..... সামনে এক সংকীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে উচ্চ হতে উচ্চতর পার্বত্য প্রদেশে উঠে গিয়েছে। এক দীর্ঘদেহ ভিক্ষু সেই ভীষণ দুর্গমপথ বেয়ে ভীষণতর হিম-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে পথ চলছেন.....তাঁর মাথা যেন ক্রমে নুয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে.....কিন্তু তবু তিনি না থেমে ক্রমাগত পথ চলছেন.....বহুদূরের এক উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া কিসের আলোয় রক্তাভ হয়ে দৈত্যের হাতের মশালের মত সে বিশাল তুহিন-রাজ্যের দূর প্রান্ত আলোকিত করে ধ্বক্ ধ্বক্ করে' জ্বলছে।.....

তুষার-বাষ্প ঘন হতে ঘনতর হয়ে সমস্ত দৃশ্যটা ঢেকে ফেললো। তারপরই চোখের সামনে—এ যে আমারই চিরপরিচিত বাংলা দেশের পাড়াগাঁ.....খড়ের ঘরের পেছনে ছায়াগহন বাঁশবনে বিকাল নেমে আসছে। বৈঁচি-ঝোপে শালিক পাখীর দল কিচ কিচ করচে! কাঁটালতলায় কোন গৃহস্থের গরু বাঁধা! মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে এক তরুণ যুবক! তার সামনে আমার খুড়ে-বার-করা সেই দেবীমূর্তি!.....দেখে মনে হোল যুবকের অনেক দিনের স্বপ্ন ঐ পাথরের মূর্তিতে সফল হয়েছে.....বর্ষাসন্ধ্যার মেঘমেদুর

আকাশের নিচে ঘনশ্যাম কেতকী-পল্লবের মত কালো ভাবগভীর চোখদুটি মেলে সে পাথরের মূর্তির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।.....

হঠাৎ সে দেখিও মিলিয়ে গেল। দেখি, আমি আমার ঘরে খাটেই শুয়ে আছি, পাশে সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু। এবার তিনি কথা বললেন। তাঁর কথাগুলো আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বললেন—তুমি যে মূর্তিটি মাটি খুঁড়ে বার করেছ, তারই টানে অনেক দিন পরে আজ আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। নয় শ' বৎসর আগে আমি তোমার মতই পৃথিবীর মানুষ ছিলাম। যে স্থান তোমরা খুঁড়েছ, ওই আমার বাস্তুভিটা ছিল। তুমি জ্ঞানচর্চায় সমস্ত জীবন যাপন করেছ, এই জন্যেই তোমার কাছে আসা আমার সম্ভব হয়েছে ; এবং এই জন্যেই আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমার জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা তোমাকে দেখালাম। আমি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান,—নয়পালদেবের সময়ে আমি নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির ছিলাম। ভগবান তথাগতের অমৃতময়ী বাণীতে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল ; সে জন্য দেশের হিন্দু-সমাজে আমার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। দেশের টোলের অধ্যাপনা ছেড়ে আমি নালন্দা যাই। বুদ্ধের নির্মল ধর্ম যখন তিব্বতে অনাচারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তখন ভগবান শাক্যশ্রীর পরে আমি তিব্বত যাই সে ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্যে। আমার সময়কার এক গৌরবময় দিনের কথা আজও আমার স্মরণ হয়। আজ অনেকদিন পরে পৃথিবীতে—বাংলায় ফিরে এসে সে-কথা বেশী করে মনে পড়েছে।.....চেদীরাজ কর্ণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে দেশ জয় করতে করতে গৌড়-মগধ-বঙ্গের রাজা নয়পালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে যে-দিন সন্ধি করলেন, আমি তখন নালন্দায় অধ্যাপক। মনে আছে, উৎসাহে সে-দিন সারারাত্রি আমার নিদ্রা হয়নি। এই সন্ধির কিছুদিন পরেই কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে নয়পালদেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের যে বিবাহ হয়, আমিই সেই বিবাহের পুরোহিত ছিলাম।.....অল্প বয়সে আমি একজন গ্রাম্য শিল্পীর কাছে পাথরের মূর্তি গড়তে শিখি এবং অবসর মত আমি তার চর্চা রাখতাম। তারপর আমি যখন পিতামহের টোলে সারস্বত ব্যাকরণের ছাত্র, তখন সমস্ত শক্তি ও কল্পনা ব্যয় করে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক মূর্তি গড়ি। মূর্তিটি আমার বড় প্রিয় ছিল। ওই মূর্তিটির টানেই অনেক দিন পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। দেশের লোকে আমায় নাস্তিক বলতো ; কারণ, আমি একেই বৌদ্ধ ছিলাম, তার ওপর সাধারণভাবের ধর্মবিশ্বাস আমার ছিল না। যে অরুণচ্ছটারক্ত হিমবান্ শৃঙ্গ জনহীন তুষার-রাজ্যে আলোকিত করেছে—বা তোমায় দেখিয়েছি, তা সত্যের রূপ! সাধারণ লোকের পক্ষে সে-সত্য দুরধিগম্য। আমার কথা ধরি না, কারণ আমি নগণ্য। কিন্তু যে বিশাল সঙ্ঘারাম আমাদের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার সমস্ত অধ্যাপকই সে উচ্চ দার্শনিক সত্যতে চিরদিন লক্ষ্য রেখে চলেছিলেন। আমিও অনেক বিপদ মাথা পেতে নিয়ে, সাধ্যমত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম। যেখানে এখন আছি, সেখানে সে-সব যুগপূজ্য জ্ঞান-তাপসরা আমার নিত্য সঙ্গী। তোমরাও অমৃতের পুত্র—সে লোক তোমাদের জন্যেও নির্দিষ্ট আছে।.....অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযান জয়যুক্ত হোক।.....

বৌদ্ধ-ভিক্ষু কোথায় মিলিয়ে গেলেন।.....কিসের শব্দে চমক্ ভেঙে গিয়ে দেখি, ভোর হয়েছে বাইরের বারান্দায় চাকরের ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ সেন গল্প শেষ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মূর্তিটা কোথায়?

ডাঃ সেন বললেন—ঢাকা মিউজিয়মে।

রহস্য

আমার বন্ধুর মুখে শোনা এ গল্প। বন্ধুটি বর্তমানে কলকাতার কোন কলেজের প্রফেসার। বেশ বুদ্ধিমান, বিশেষ কোনরকম অনুভূতির ধার ধারেন না, উগ্র বৈষয়িকতা না থাকলেও জীবনকে উপভোগ করার আগ্রহ আছে, সে কৌশলও জানা আছে।

সেদিন রাত্রে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। নানারকম গল্প হচ্ছিল গরম চা ও আনুষঙ্গিক খাদ্যের সঙ্গে মজিয়ে। অবিশ্যি ভূতের গল্পই হচ্ছিল। আমার বন্ধু একটা গল্প বললেন, আশ্চর্য লাগল গল্পটা। একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক যখন এই গল্পটা করলেন তখন এর একটা মূল্য আছে ভেবেই এই গল্পটা বলছি। তাঁর নিজের কথাতেই বলি—

সেবার আমি বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছি, অনার্স পরীক্ষা হয়ে যাবার পরে দিন চার-পাঁচ ছুটি পাওয়া গেল। কিসের ছুটি তা আমার এতকাল পরে মনে নেই। ভবতারণ ঘোষাল বলে আমার এক বন্ধু ছিল, ওর বাড়ি ছিল বেলঘরেতে। ভবতারণ ক্লাসে খুব পান খেত, ক্লাসের বাইরে ঘন ঘন সিগারেট খেত, অশ্লীল কথাবার্তা বলত, লম্বা লম্বা কথা বলত, চালবাজির অন্ত ছিল না। তার আমার সঙ্গে খুব বনত, এইজন্যে যে আমি নিজেও একজন দস্তুরমত চালবাজ ছেলে ছিলাম তখন। এখন সেসব কথা ভাবলে হাসি পায়। তারপর যা বলছিলাম।

অনার্স পরীক্ষা শেষ হবার দিন ভবতারণ আমায় টেনে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। যাবার সময় ট্রেনে গেলুম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হল, কারণ ওদের বাড়িটা প্রায় গঙ্গার ধারের কাছে। কিছুক্ষণ ওর বাড়ি থেকে হঠাৎ কি একটা বিষয়ে ঘোর তর্কাতর্কি হল, ওর আর আমার মধ্যে। এমন চরমে উঠল সে তর্ক যে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম। হায় রে সে সব দিন! এই রোদ এই মেঘ—তখনকার জীবনে তাই ছিল স্বাভাবিক।

যাই হোক, আমি ভয়ানক রেগে ওদের বাড়ি থেকে সেই সন্ধ্যাবেলাই বেরিয়ে পড়লুম। এমন জায়গায় ভদ্রলোকের থাকতে আছে?

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বেয়ে হন্-হন্ করে হাঁটছি কলকাতা-মুখে। দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। মাঝে মাঝে এক-আধখানা মোটর দ্রুতবেগে চলেছে কলকাতার দিকে। সম্পূর্ণ নির্জন রাস্তা, একবার একটা মাতাল কুলি ছাড়া আর কোন লোকের দেখা পাইনি।

হঠাৎ আমার মনে হল এতটা রাস্তা একটানা হাঁটতে পারব না, একটু বিশ্রাম দরকার। ডাইনে বায়ে চাইতে চাইতে কিছুদূর গিয়ে একটা বাগান বাড়ি দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাইরে থেকেই আমার মনে হয়েছিল এ বাগান-বাড়িতে লোকজন কেউ থাকে না, আছে হয়ত একটা-আধটা উড়ে মালী, তাকে দু-চারটি পয়সা দিলে বাগানের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম করতে দেবে এখন। নিশ্চয় একটা পুকুর আছে বাগানে, নিশ্চয় তার ঘাট বাঁধানো। এমন গ্রীষ্মের দিনে জ্যোৎস্না রাত্রে পুকুরের বাঁধা ঘাটে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার আনন্দ অনেক দিন পরে হয়ত কপালে জুটে যাবে।

বাগানের মধ্যে ঢুকে মনে হল এ বাগানে লোকজন কেউ বাস করে না। ঘন ঘন কেউ আসেও না। লাল কাঁকরের পথগুলোর ওপরে এক হাত লম্বা উলু ঘাস, ফুলের খেত আর আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। আরও একটু অগ্রসর হয়ে মনে হল এ বাগান-বাড়ি খুব বড়লোকের, অন্তত যে সময়ে এ বাগান-বাড়ি তৈরি হয়েছিল সে সময়ে মালিকের অবস্থা ছিল খুব ভাল। সৌখীন রুচির পরিচয় আছে এর প্রত্যেকটি গাছপালায়, প্রত্যেকখানি ইঁটে, পাথরে। আগাছাভরা ফুলের ক্ষেতের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে পাথরের অপ্সরী

মূর্তি। দু-একটার হাত ভাঙা নাক ভাঙা, অনেক এমন অপ্সরী মূর্তি আছে বাগানের এদিকে ওদিকে। কোনটার পিঠ দেখা যাচ্ছে, কোনটার মুখ—ঝোপের আড়ালে আড়ালে। একটু দূর গিয়ে বাঁদিকের চওড়া পথ ধরলাম, পুকুরে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে। তবে, যে ধরনের পুকুর আশা করেছিলাম এ তা নয়। অনেক কালের পুরোনো পুকুর, বাঁধা ঘাট এক সময় ছিল। এখন তার মাঝামাঝি প্রকাণ্ড বড় ফাটল ধরেছে, রানার দু-পাশে বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে, সে ঘাটে নামাও যায় না সিঁড়ির সাহায্যে। এ রাত্রে তো সাপের ভয়ে সেদিকে যেতেই আমার সাহস হল না।

ঘাটের থেকে কিছু দূরে একখানা বেঞ্চি পাতা, ক্লান্ত শরীরে বেঞ্চির ওপরে শুতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। আমার তন্দ্রা যখন ছুটে গেল, তখন অনেক রাত। সামনের দিকে চাইতেই একটা অদ্ভুত সন্দেহ হল আমার মনে।

আমার বেঞ্চিখানা থেকে কিছু দূরে যে অপ্সরী মূর্তি আমার দিকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটার দিকেই ঘুম ভেঙে আমার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এতক্ষণ সে মূর্তিটা অন্য কি কাজ করছিল বা অন্যদিকে অন্যভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে জাগতে দেখেই সেটা চট্ করে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে আবার পূর্ববৎ ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি অবাক হয়ে সোজা হয়ে বসলাম, চোখ মুছলাম ভাল করে। ঘুমের ঘোরে? কিন্তু তা বলে তো মনে হল না! আমি ঘুম ভেঙে স্পষ্টই দেখেছি, ও পুতুলটা কি একটা করতে যাচ্ছিল, আমার সাড়া পেয়ে সামলে নিয়েছে।

সমস্ত শরীর যেন অবশ, ভারি। ঘুমের ঘোর ভাল কাটে নি। রাস্তা হাঁটবার ইচ্ছে নেই মোটে। আবার সেই বেঞ্চিখানাতেই শুয়ে পড়লাম। শোয়া-মাত্র আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম আসবার পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু একটা কৌতূহল আমার মনে বার বার উঁকি দিয়েছে। পুতুলটা কী করতে যাচ্ছিল? আমায় ঘুম ভেঙে উঠতে দেখে কী করতে করতে ও সামলে গেল?

অনেক রাতের ঠাণ্ডা ফিরফিরে হাওয়ায় আমি গাঢ় ঘুমেই অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। আবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশের গাছপালার পেছনে। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। তবে পশ্চিম দিক থেকে লম্বা লম্বা গাছের ছায়া পড়েছে ফুলের ক্ষেতে আগাছার জঙ্গলে।

ঘুম ভেঙে উঠেই আমার মনে হল আমি প্রথম যখন এ বাগানে ঢুকি তখন বাগানে যা ছিল, এখন তা নেই। কোথায় কি একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে বাগানের। ঘুমের ঘোর যতই ভাঙতে লাগল আমার মনে এ ধারণা ততই বদ্ধমূল হতে লাগল। আগে যা ছিল তা এখন যেন নেই। কী একটা বদলে গিয়েছে। অথচ কি সেটা বুঝতে পারছিনে। কী বদলে গেল কোথায়? হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সামনে। চোখ ভাল করে মুছলাম। পরিবর্তন ওখানেই হয়েছে যেন। আগে যা ছিল, এখন তা নেই।

কিন্তু কী পরিবর্তন? কী বদলে গেল? এক মিনিট কি দেড় মিনিট কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে বিদ্যুতের স্রোতের মত বয়ে গিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও অবশ করে দিয়ে আসল সত্যটি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

ঐ উচ্চ বেদিটার ওপর বসানো সে অপ্সরী পুতুলটা কোথায় গেল? বেদিকা খালি পড়ে আছে। পুতুলটা নেই।

প্রথমটা যেন বিশ্বাস হল না। সত্যি কি ওখানে অপ্সরী মূর্তিটা ছিল? অন্য জায়গায় ছিল হয়ত। আমি ভুল দেখেছিলাম। তা কি কখনো হয়? পাথরের অত বড় পুতুলটা গভীর রাত্রে কে নিয়ে যাবে? আমারই ভুল।

কিন্তু এই অপ্সরী মূর্তিই তো অন্য দিকে চেয়ে কি একটা করতে যাচ্ছিল, আমি ঘুম ভেঙে দেখেছিলাম। এই বেদিটার ওপরেই সেই পুতুলটা ছিল। না থাকলে আমি এই বেঞ্চিতে শুয়ে দেখলাম কী করে? বেশ মনে আছে, প্রথম এই বেঞ্চিতে শুয়ে পুতুলটা প্রথম আমার চোখে পড়েছিল। আমার দিকে ওর পাশ ফেরানো ছিল। এও ভাবলাম আমার মনে আছে, এ ধরনের পুতুল কি ইটালি থেকে আসে? না, এ দেশে তৈরী হয়?

এত সব একেবারে ভুল হয়ে যাবে? কিন্তু তা যদি না হয়, তবে সে অপ্সরী মূর্তিই বা যাবে কোথায়? এত রাত্রে কে উঠিয়ে নিয়ে গেল মূর্তিটা? চোরে নিয়ে গেল?

তাই যদি হয়, এতকাল এ বাগান অরক্ষিত ভাবে পড়ে আছে, এতদিন কেউ চুরি করলে না, আর একজন জলজ্যান্ত মানুষ শুয়ে আছে সামনের বেঞ্চিতে, আজই চোর এসে এত বড় ভারি মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যাবে?

না। তাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

কেন জানি না, আমার কেমন ভয় হল। গা ছম-ছম করতে লাগল। রাত আর বেশি নেই। এ বাগানে আর শুয়ে থাকার দরকার নেই। আস্তে আস্তে কলকাতা-মুখো হাঁটা দি।

যেমন এ কথা মনে আসা, অমনি আমি বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লাম। পুকুরের ঘাটে নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে নেব বলে ঘাটের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় আবার অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাঁধা ঘাটের ঠিক ওপরেই আমলকি-তলায় যে স্ট্যাচুটা ছিল, সেটাই বা কই? সেটার হাত ভাঙা ছিল বলে আরও বেশি করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐ তো তার শূন্য বেদীটা পড়ে আছে।

মনে কেমন সন্দেহ হল। বাগানের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। কত পুতুল ছিল এখানে ওখানে। বনের ঝোপের মধ্যে, আড়ালে আড়ালে। সাদা পাথরের পুতুলগুলো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ঝক-ঝক করছিল। এখানে তেমনি সাদা জ্যোৎস্না বাগানের সর্বত্র, কিন্তু কই সে অপ্সরী পুতুলগুলো? একটাও তো নেই!

এক রাত্রে কি বাগানের সব পুতুল চুরি গেল? এই রাত্রিটার জন্যেই কি চোরেরা ওত পেতে বসে ছিল?

আশ্চর্য! বোকার মত চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। এতক্ষণে বুঝলাম, ঘুম ভেঙে উঠে যে ভাবছিলাম বাগানের কোথায় কি পরিবর্তন হয়েছে, সে হল এই পরিবর্তন। বাগানময় এই মস্ত পরিবর্তনটা সাধিত হয়েছে আমার ঘুমের মধ্যে।

ততক্ষণে পায়ে পায়ে আমি গিয়ে পুকুরের বাঁধা ঘাটের ওপরটাতে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ পুকুরের জলের দিকে চাইতে আমার কেমন যেন হয়ে গেল। সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল ভয়ে, বিস্ময়ে।

বাগানের সব অপ্সরী পুতুলগুলো জলে নেমে সাঁতার দিচ্ছে, দিব্যি সাঁতার দিচ্ছে, এপার ওপার যাচ্ছে—কিন্তু একটা জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সেগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। আড়ষ্টভাবেই, পুতুল রূপেই সাঁতার দিচ্ছে!

এইখানে আমাদের মধ্যে বন্ধুকে কে প্রশ্ন করলে—আপনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন?

অধ্যাপক বন্ধুটি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—অনেক দিনের কথা হয়ে গেল বটে, কিন্তু আমি আজও ভুলি নি সে রাত্রের কথা। সে দৃশ্য আজও দেখছি চোখের সামনে। মাঝে মাঝে যেন দেখি। বিশ্বাস করা না করা অবিশ্যি আপনাদের ইচ্ছে। আমি কাউকে বলিও নে বিশ্বাস করতে।

আমি বললাম—সিদ্ধি খেয়েছিলেন বন্ধুর বাড়ি বেলঘরেতে? বা—

—আমি ওসব ছুঁতাম না তখন, এখনও তাই। বিশ্বাস করুন এ কথাটা—

সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলাম। আমরা বললাম—তারপর? বন্ধু বলতে আরম্ভ করলেন আবার ঃ

তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে। আমার মনে হল আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিংবা আমার কোন শক্ত রোগ হয়েছে। যা দেখছি এসব কী? বেশ মনে আছে পশ্চিম দিকের পাঁচিলের গায়ে একটা তাল কি নারকেল গাছ ছিল। চাঁদ তখন গাছটার ঝাঁকড়া মাথার ঠিক আড়ালে। সে ছবিটা বেশ মনে আছে আমার। আবার তখনই চোখ নামিয়ে পুকুরের দিকে চাইলাম—সেখানে সেই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অস্বাভাবিক দৃশ্য! সব সাদা সাদা বড় মর্মর মূর্তিগুলো জীবন্তের মত জলকেলি করছে পুকুরের জলে। আমার মাথা ঘুরে গেল যেন। নিজের ওপর কেমন একটা অবিশ্বাস

হল। সেখান থেকে মারলাম টেনে ছুট—একেবারে সোজা দৌড় দিয়ে ফটকের কাছে এসে যখন পেঁছেছি তখন আমার মনে হল—অবিশ্যি হলপ করে বলতে পারব না সত্যি কি না—তবে আমার মনে হল, যেন অনেকগুলো মেয়ে খিল খিল করে একযোগে হেসে উঠল। হাসির একটি ঢেউ যেন আমার কানে এসে পেঁছল। পরক্ষণেই আমি একেবারে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে এসে পড়লাম।

এবার আপনারা যে প্রশ্ন করবেন তা আমি জানি। সেখানে আর আমি গিয়েছিলাম কিনা? পরদিনই গিয়েছিলাম, একা নয়, তিনটি বন্ধু সঙ্গে করে। গিয়ে দেখলাম, পুরনো ভাঙা বাগানবাড়ি। আগাছার জঙ্গলে ভরা ফুলের ক্ষেত। কতকগুলো হাত-ভাঙা নাক-ভাঙ অপ্সরী পুতুল এদিকে ওদিকে বনে-জঙ্গলের আড়ালে পাথরের বেদীর ওপরে দাঁড় করানো। কোথাও কোনদিকে অস্বাভাবিকতার কোন চিহ্ন নেই।

হঠাৎ আমার এক বন্ধু আমাকে ডাক দিলে। ঘাটের ওপরে আমলকিতলায় যে হাত-ভাঙা পুতুলটা দাঁড়িয়ে আছে, একটা মোটা বিছুটিলতা মাটি থেকে গজিয়ে উঠে সেটার দুখানা পা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে—অন্তত এক বছরের পুরনো লতা। গত বর্ষায় এ বিছুটিলতা গজিয়ে উঠেছিল এমনও মনে হয়।

লতাটার কোথাও ছেঁড়া নেই, ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল।

অথচ আমি হলপ করে বলতে পারি এ পুতুলটাও কাল জলে নেমেছিল, অন্তত এ বেদিকা আমি কাল খালি দেখেছি। এই ঘাটের ধারেই তো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বন্ধুরা বললেন—তাহলে বিছুটিলতাটা এমন থাকে কী করে? এই জড়ানো তো এক বছরের জড়ানো। রাতারাতি গাছটা গজায়নি!

ওদের যুক্তি অকাট্য।

কী উত্তর দেব ওদের?? আমার নিজেরই যখন ক্রমশ অবিশ্বাস হচ্ছে আমার নিজের ওপর!

লাহোর মিউজিয়ামে যখন চাকরী করতাম সে সময় লাহোরের বিখ্যাত "দেশবন্ধু" কাগজের সম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয়। মিঃ সিং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাঁদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয়, রাজপুতানার কোটা রাজ্যে তিনপুরুষ পূর্বে তাঁর পিতামহ রাজকার্য উপলক্ষে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন, সেই থেকেই তাঁরা দেশছাড়া। সন্ধ্যার পরে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেওয়ালে টাঙানো পুরানো আমলের বর্ম, কুঠার, পতাকা, বল্লম প্রভৃতি রাজপুরে যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড় ভালো লাগতো। রাজপুতানার, বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মিঃ সিংয়ের জ্ঞান খুবই গভীর।

কিন্তু এ-সকল কথা নয়। আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা বলবো। মিঃ বিনায়ক দত্ত সিংয়ের মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এ কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার পরে মিঃ সিংয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেচি। ভীষণ শীত সেদিন। দু'পেয়ালা গরম চা পানের পর তাওয়ার তামাক টানচি (মিঃ সিং ধূম-পানে অভ্যস্ত নন)। হঠাৎ কি মনে করে জানিনে, আমি তাঁকে বল্লাম—মিঃ সিং, আপনি অপদেবতায় বিশ্বাস করেন?

মিঃ সিং একটু চিন্তা করে বল্লেন—হ্যাঁ, করি।

—দেখেচেন ভূতটুত?

মিঃ সিং গম্ভীর সুরে বল্লেন—না, এ আমার কথা নয়। আমার ছোট ঠাকুরদাদার জীবনের ঘটনা। যদি এ ঘটনা না ঘটতো আমাদের বংশে, তবে আজও আমরা কোটা রাজ্যে মস্ত বড় খানদানি তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম। লাহোরে এসে চাকরি করতে হ'ত না। সে বড় আশ্চর্য ঘটনা।

—আমি বল্লাম—কি রকম?

—শুনুন তবে। আমার ছোট ঠাকুরদা আমার পিতামহের আপন ভাই নন, বৈমাত্র ভাই। তিনি মস্ত বড় সৌখীন মানুষ ছিলেন—আর ছিলেন খুব সুপুরুষ।

আমি বিনায়ক দত্ত সিংহের দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সে কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তখন আমার বয়স খুব কম। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ!—এক দম। কেন তিনি উন্মাদ হ'লেন, সেই ইতিহাসের মূলেই এই গল্প। তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তাঁর ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হাতছাড়া—সে কথা যাক্ গে। আসল গল্পটা বলি—

বিনায়ক দত্ত সিং তাঁর অনবদ্য উর্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলুম, সে সব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমার ঠাকুরদাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন—মদ খেয়ে স্ফূর্তি করতে। তাঁর দু'একজন বন্ধু সেখানে ছিল, তাদের সঙ্গের নেশাতেই সেখানে যাওয়া! একবার জ্যোৎস্নারাত্রে তিনি আর তাঁর দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বরী নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন।

বরী নদী মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীল গতিতে বয়ে গিয়েচে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন এই ত্রিস্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না, মাঝের শাখাটিতে হাঁটুখানেক জল—তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া—তার ওপারে আসল ধারা, অনেকখানি জল তা'তে।

যাবার পথে একজন বন্ধুর খেয়াল হ'ল তিনি প্রথম ধারার বালির ওপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন—আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না। বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা অগত্যা তাঁকে সেখানেই বালুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ফেলে চল্লেন এগিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনজনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না।

আমার ঠাকুরদাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বরী নদীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠাকুরদাদা বল্লেন—ওদিকে কি দেখছ চেয়ে?

বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুরদাদাকে চুপ করে থাকতে বল্লে। ঠাকুরদা চেয়ে দেখলেন বালুর চড়ার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরণের কতকগুলি মনুষ্যমূর্তি—চক্রাকারে ঘুরছে! কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল ওরা যেই হোক্, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করচে। সেই নির্জন স্থানে রাত্রিকালে কাদের এমন আমোদ লেগেচে যে লোকচলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে বুঝতে না পেরে তাঁরা দু'জনেই অবাক হয়ে রইলেন। কাছে কেউ কেন গেলেন না, সে কথা আমি বলতে পারব না, কারণ, শুনি নি। হয়তো এঁদের মত অবস্থাই সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী, এই ভেবে তাঁরাও কাউকে কথাটা বলেনও নি সেই সময়।

এর পরে আরও বছর তিনেক কেটে গেল।

ত্রিস্রোতা বরী নদীর প্রধান স্রোতোধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে, এর নাম 'নাহারা নিপট' অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ। এই হ্রদের দূরে দূরে এঁকেবেঁকে প্রায় চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পাহাড়শ্রেণী—এই পাহাড়শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উঁচু, কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশী উঁচু। হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হ'ত

ব্যবসাদারদের।

আমার ঠাকুরদাদা পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলে বালি-হাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন। গভীর রাত্রে বালি-হাঁসের দল হ্রদের জলে দলে দলে চরে' বেড়ায়, একথা তিনি শুনেছিলেন। একটা ঘাসের লতাপাতার ছোট্ট ঝুপড়ি বেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনমান থেকে—কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দল আর নামবে না।

সব ঠিকঠাক হ'ল, কিন্তু দু'একজন বৃদ্ধলোক নিষেধ করলে, রাত্রিকালে নাহারা হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয়। কেন, তারা স্পষ্ট করে কিছু বল্লে না—শুধু বল্লে জায়গাটা ভালো নয়! ভৈজি নামে একজন বৃদ্ধ ভীল আমাদের প্রজা ছিল, সে বল্লে,—কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবন বয়সে। উক্ত বেনিয়ার লবণের গুদাম আর আড়ৎ ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে। সে সময় সে দেখেছে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাত্রে যেন দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো—কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে। মোটের উপর রাত্রে হ্রদের ধারে কেউ যায় না—অনেক দিন থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এ ভয় রয়েচে। একবার এক মেষপালক রাত্রিকালে হ্রদের ধারে কাটিয়েছিল, সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নিমকের গুদামের কাছে পায়চারী করতে দেখা যায়।

আমার ঠাকুরদাদা এ সব গালগল্প শুনবার লোক ছিলেন না। তিনি বুঝতেন স্ফূর্তি, শিকার, হল্লা, হৈচৈ। লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে ধরণের। তিনি যাবেনই ঠিক করলেন।

বৃদ্ধ ভীল তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁসের দল যদি জলে নামে, তবে সে রাত্রে কোনো ভয় নেই জানবেন! ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করলেন—কিসের ভয়? বাঘের?

—তার চেয়েও ভয়ানক কোনো জানোয়ার হতে পারে—কি জানি হুজুর, আমার শোনা কথা মাত্র। ঠিক বলতে পারিনে—

—তুই সঙ্গে থাক না? বকশিশ দেবো—

—মাপ করবেন, হুজুর। এক শো রূপেয়া দিলেও না, রাত কাটাবে কে নাহারা নিপটের ধারে? প্রাণের ভয় নেই? আমরা ভীল, বাঘের ভয় রাখি নে—এই হাতে তীরে কত বাঘ মেরেচি, কিন্তু হুজুর, বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোনো জীব কি দুনিয়ায় নেই?

আমার ঠাকুরদাদা নাহারা হ্রদ ভালো জানতেন না। ঠিক আমাদের অঞ্চলে হ্রদটা নয়, আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তখনই তিনি ভীলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাত আট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতল ভূমিতে নামলেন, দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্ত জলরাশি প্রখর সূর্যতাপে চক্ চক্ করচে। জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে।

বেলা তখনও অনেকখানি আছে, এমন সময় ঠাকুরদাদা হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলেন এবং নলখাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণ মত তৈরি করে নিলেন জলের ধারেই, যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন. হাঁসের দল তাঁকে না টের পায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুন্দর চাঁদ উঠলো পূবের পাহাড় ডিঙিয়ে, কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত্রি। একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল।

নির্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর হ্রদ।

দুই দণ্ড পরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো হ্রদের বুকে। ধবধবে জ্যোৎস্না—কৃষ্ণা

দ্বিতীয়ার। দুদিন মাত্র আগে হেমন্তপূর্ণিমা চলে গিয়েচে—যত রাত বাড়ে, তত শীত নামে।

শীতের মুখে বালি-হাঁস আসবার সময়—কিন্তু কই একটা হাঁসও আজ নামচে না কেন?

বৃদ্ধ ভীলের কথা মনে পড়লো ঠাকুরদাদার। হাঁসের দল যদি নামে তবে সে রাত্রি বিপদহীন বলে জানবেন।—যদি না নামে তবে কিসের বিপদ? বাঘ জল খেতে আসে পাহাড় থেকে?

রাত্রি ক্রমে গভীর হ'ল। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল, মরুভূমির নোনা বালি রহস্যময় হয়ে উঠেচে—কোনো শব্দ নেই কোনো দিকে। ঠাকুরদাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হ'লেও তাঁর যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো—জ্যোৎস্নার সে ছদ্মছাড়া অপার্থিব রূপে। তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরক সেবন করলেন।

হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠলো। জ্যোৎস্না-লোকেও আকাশের নীচে একদল বালি-হাঁস নামচে। জ্যোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধের মত পাখাগুলো কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালির চরে বসলো।

জায়গাটা ঠাকুরদাদার ঝুপড়ি থেকে দু'শো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি। এতদূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না, বিশেষ এই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠাকুরদাদা ভাবলেন, দেখি ওরা কাছে আসে কিনা, বা আরও হাঁসের দল নামে কিনা। শিকারীর পক্ষে ধৈর্যের মত গুণ আর কিছু নেই। একদৃষ্টে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করাই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে নিজের চোখ বার বার মুছলেন। আরক খেয়েচেন বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানহারা হবার বা চোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই?

অতঃপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা মিষ্টার ব্যানার্জি, কিন্তু এ গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেচি—আমাদের বংশের ঘটনা—কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বলচি বানিয়ে, অন্তত এটুকু ভাববেন না। ঠাকুরদাদা দেখলেন, সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মত নয়—অনেক বড় অনেক—অনেক বড়। হাঁসের মত তাদের চালচলন নয়। তার পরেই মনে হ'ল সেগুলো হাঁসই নয় আদপে। সেগুলো মানুষের মত চেহারা বিশিষ্ট। বেচারী ঠাকুরদাদা আবার চোখ মুছলেন। আরক ঐটুকু খেয়েই আজ আবার এ কি দশা। পরক্ষণেই সেই জীবগুলি জলে নামলো এবং হাঁসের মত সাঁতার দিয়ে, তিনি যেখানে লুকিয়ে আছেন, তার কাছাকাছি জলে এসে গেল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীত চকিত, দুঃসাহসী, আরকসেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যিই হাঁস নয়—একদল অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে! শুভ্র তাদের বেশ—জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্‌ করচে; তাদের হাসি, মুখশ্রী সবই অতি অদ্ভুত ধরণের সুন্দর। কতক্ষণ ধরে তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করলে জলে, রাজহংসের মত সুঠাম ধরনে, নিঃশব্দে, সুন্দর ভঙ্গিতে হ্রদের বুকে সাঁতার দিতে লাগলো। তারপর কতক্ষণ পরে—তা ঠাকুরদাদার আন্দাজ ছিল না। কারণ, তখন ঠাকুরদাদা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচেন—ওরা সবাই জল থেকে উঠলো এবং অল্পপরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—হ্রদের তীরের বাতাস তখনও তাদের অপূর্ব দেহগন্ধে ভরপুর।

আমার ঠাকুরদাদা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তখন তাঁর আরকের নেশা ছুটে গিয়েচে। একটু পরে রাত ফর্সা হয়ে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে হ্রদের পার থেকে হেঁটে চলে এলেন পাহাড়ের কোলে।

সেখান থেকে পৌঁছলেন ভীলদের গ্রামে।

বৃদ্ধ ভীল ভৈজি তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁস নেমেছিল কাল?

ঠাকুরদাদা মিথ্যা কথা বলেন। হাঁস নেমেছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারেন নি।

কেন মিথ্যা বল্লেন শুনুন।

কি এক দুর্বার মোহ তাঁকে টানতে লাগলো দুপুরের পর থেকেই—আবার তাঁকে যেতে হবে, নাহারা হ্রদের তীরে রাত্রিকালে। ভৈজিকে সত্য কথা বল্লে পাছে সে বাধা দেয়।

কিন্তু সে রাত্রে বুনো বালি-হাঁসের দল নামলো হ্রদের জলে। আসল হাঁসের দল।

পর পর কয়েক রাত্রি শুধু বন্য-হংসের দল নামে খেলা করে। আমার ঠাকুরদাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে থাকেন, বন্দুকের গুলি করতে তাঁর মন সরে না।

তারপর আর একদিন শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বনাহংসের বদলে নামলো সেই অদ্ভুত জীবের দল।

এদিন তারা আরও কাছে এল, বন্য রাজহংসের মত সাঁতার দিয়ে বেড়াল জলজ ঘাসের বনের পাশে পাশে—তাদের অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে ঠাকুরদাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কতবার পড়লো। রাত ভোর হবার বেশি দেরী নেই, তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না আছে; আমার ঠাকুরদাদা কি ভেবে, আরকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানি নে ঝুপড়ি থেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চল্লেন। বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গেলেন। অমনি ত্রস্ত বন্যহংসের মত সেই অলৌকিক জীবের দল তাড়াতাড়ি সাঁতরে কে কোথায় দূরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই শেষরাত্রের বিলীয়মান চন্দ্রালোকে তাদের লঘু দেহ ভাসিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হ'ল।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার ঠাকুরদাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের ধারের বালির চড়ায় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈক জেলে তাঁকে ভীলদের গ্রামে পৌঁছে দেয়। বৃদ্ধ ভৈজি ঘাড় নেড়ে বল্লে—আমি বলেছিলাম হাঁসের দল যেদিন না নামে সেদিন বড় ভয়।

ঠাকুরদাদা মাঝে মাঝে ভাল হতেন, আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন। ভাল অবস্থায় বাড়ীতে এ গল্প করেছিলেন, একবার নয় অনেকবার। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে থেকে তাঁর মোটেই ভাল অবস্থা আসেনি। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিনায়ক দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম—খুব অদ্ভুত ঘটনা, তবে—

মিঃ সিং বললেন—তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত। সে আমিও জানি। আমাদের দেশেও সবাই বিশ্বাস করে না। এ আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলচি। কেউ বলে ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত আরক সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা, বন্যহংসকে ভেবেচেন আকাশ-পরী; আবার কেউ বলে, না—আকাশপরী দেখলেই লোকে পাগল হয়। সেই বৃদ্ধ ভীল ভৈজি সেই কথাই বলতো। কি করে বলব কোন্‌টা সত্যি, কোনটা মিথ্যে। তখন আমার জন্মই হয় নি।

শারদীয়া মৌচাক, আশ্বিন ১৩৪৯

ছায়াছবি

এক বন্ধুর মুখে এ গল্প শোনা।

আমার বন্ধুটি অনেক দেশ বেড়িয়েচেন, লোক হিসেবে অমায়িক, রসিক ও শিক্ষিত। কলকাতাতেই থাকেন।

যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন গল্পে গল্পে অনেক সময় সারারাত কেটে যায়।

প্রকৃতপক্ষে ঠিক মনের মত লোক পাওয়া বড় দুষ্কর। অনেক কষ্টে একজন হয়তো মেলে। অধিকাংশ লোকের সঙ্গে যে আমাদের আলাপ হয়, সে সম্পূর্ণ মৌখিক। তাদের সঙ্গে আমাদের হয়তো ব্যক্তিগত অভ্যাসে, চরিত্রে, মতে, ধর্মবিশ্বাসে, বিদ্যায় যথেষ্ট তফাত। কিন্তু একই আফিসে কি কলেজে কি কোর্টে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, দু-বেলা দেখা হয়—দাদা কিংবা মামা বলে সম্বোধন করতে হয়, কৌটাস্থ পানের খিলির বিনিময়ও হয়তো হয়ে থাকে—কিন্তু ওই পর্যন্ত। মন সায় দিয়ে বলে না তার সঙ্গে দুবেলা দেখা হোলে গল্প করে বাঁচি। কোনো নিরালা বাদলার দিনে আফিসের হরিপদ-দার সঙ্গ খুব কাম্য বলে মনে হবে না।

আমার বন্ধুর নাম—থাক গে, নামের দরকারই বা কি? আবার লোকে তাঁকে বিরক্ত করবে। কৌতূহলী লোকের সংখ্যা সর্বত্রই বেশি। কোনো কাজ নেই—গিয়ে আনন্দ করবে আর বকবক বকাবে। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। হাতে পয়সা এবং কলকাতায় বাড়ী আছে। বাড়ীর গ্যারেজে মোটর গাড়ী থাকবার অন্য কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু আমার বন্ধু আড়ম্বর ও বিলাসিতা পছন্দ করেন না।

ভূমিকা এই পর্যন্ত।

সেদিন খুব বর্ষার দিন। একা বাড়ী বসে বসে ভালো লাগলো না। একখানা ট্রেন ধরে কলকাতায় পেঁছুলাম। ভীষণ বর্ষায় ট্রাম বন্ধ। বাস ক্বচিৎ দু-একখানা চলচে। জল ভেঙে হেঁটে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পেঁছুলাম।

বন্ধু আমায় দেখে অত্যন্ত খুশি হোলেন বলাই বাহুল্য। তখনই গরম চা ও খাবারের ব্যবস্থা হোল। পরস্পরের কুশল-জিজ্ঞাসার ভদ্রতা বাদ গেল না। তাঁর বৈঠক-খানার গদিআঁটা আরাম কেদারায় ততক্ষণ বেশ হাত-পা এলিয়ে বসে পড়েছি।

সন্ধ্যার পরে আবার সজোরে বৃষ্টি নামলো। বেশি ঠাণ্ডাবোধ হওয়াতে পাখা বন্ধ করতে হোল।

বন্ধুর আতিথেয়তা আমার সুপরিচিত। তিনি বললেন—ঘরে স্টোভ আছে, চলুন দোতলার ঘরে। এই বৃষ্টিতে আর কেউ আসবে না। খিচুড়ি চড়িয়ে দিই। ডিম আছে, আলু আছে—

—চমৎকার।

—মাছ দেখতে পাঠাবো রঘুয়াকে?

—কোনো দরকার নেই। আমাদের ওতেই হয়ে যাবে।

—চলুন ওপরের ঘরে। রাতে এখানে খাবেন এবং থাকবেন।

—নইলে আর যাচ্ছি কোথায়?

—যেতে চাইলেও যেতে দেওয়া হবে না।

ওপরের বসবার ঘরটিতে বন্ধুর লাইব্রেরী। দেওয়ালের গায়ে সারি দেওয়া কাঁচের আলমারি, সাধারণতঃ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালে বড়-বড় অয়েল পেণ্টিং—প্রতিকৃতি নয়—সবই ল্যাণ্ডস্‌কেপ। ভাল চিত্রকরের হিমালয় অঞ্চলের দৃশ্য। আমার বন্ধু হিমালয়কে অত্যন্ত ভালবাসেন। হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। অনেকদিন রাত্রে হিমালয় ভ্রমণের নানা মনোরম গল্পে রাত্রি কখন কেটে

গিয়েচে, টেরও পাই নি।

ওপরের ঘরে যখন গিয়ে বসলুম, তখন টেবিলের ওপর একখানা ছবিওয়ালা বই খোলা পড়ে আছে। বন্ধু হাতে নিয়ে বললেন—এখানা দেখেচেন? হিমালয়ান জর্নাল। সোয়েন হেদিনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেরিয়েচে।

—কোথাকার?

—কাশ্মীর।

—এমন শৌখীন স্থানে সোয়েন হেদিন বেড়াতেন বলে তো জানতাম না! কোথায় তাক্‌লা মাকান্‌, কোথায় কারাকোরম—এ সব দূর দুর্গম স্থান ছাড়া তিনি—

—না। চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা করেচেন এ লেখাটায়, দেখবেন।

—দেখবার চোখ ছিল ভদ্রলোকের—যা সকলের থাকে না।

—একশো বার সত্যি।

তারপর আমাদের গল্প আরম্ভ হোল প্রধানতঃ কাশ্মীর নিয়েই। কাশ্মীর আমার বন্ধুটির জীবনের একটি তীর্থক্ষেত্র—অনেকবার তিনি ক্লান্ত নাগরিকের মন ও চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বেরুতেন আমি জানি। কাশ্মীরেও গিয়েচেন অনেকবার। কাশ্মীরের কথায় সাধারণতঃ তিনি পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। এবার কিন্তু একটা নতুন বিষয় নিয়ে তিনি কথা পাড়লেন। সেটা হোল তাঁর একটি অতি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা, যেটা কাশ্মীরের পথেই ঘটেছিল।

বন্ধু বললেনঃ

সেবার পুজোর পরে আমার বাল্য-সুহৃদ রতিকান্ত মৈত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তারই মোটরে দু'জনে কাশ্মীর যাত্রা করা গেল। রতিকান্ত প্রতিবৎসর নিজের মোটর নিয়ে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে কোথাও না কোথাও যাবে। এবার আমারই কথায় সে কাশ্মীর রওনা হোল। পথের আনন্দ ও কষ্ট ভোগ করতে করতে আমরা দিল্লী গিয়ে পেঁছুলাম। সেখানে দিন দুই বিশ্রাম করে আমরা আবার মোটর ছাড়লুম।

বাকি পথটুকু বেশ কাটলো। সে বর্ণনা বিস্তৃতভাবে করবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

কোহালায় পেঁছুলাম দিল্লী থেকে রওনা হবার তিন দিন পরে সন্ধ্যার দিকে। মোটর থামিয়ে কোহালার বাজারে একটি চায়ের দোকানে চা পান করতে বসলাম দু-জনে। গাড়ীতে রইল ক্লিনার রামদীন ও ভৃত্য নাথু বাগ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামটি অবাঙালীর মত শোনালেও প্রকৃতপক্ষে ওর বাড়ী মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় এবং সে বাঙলা ছাড়া অন্য প্রদেশের ভাষা জানে না।

চা পানের সময় দোকানদারকে আমাদের রাত্রির জন্যে একটু বিশ্রামস্থানের সন্ধান দিতে বললাম। সে দু-একটা সন্ধান দিলে। বড় পরিশ্রান্ত ছিলাম সেদিনটা। রাত্রিটাতে একটু ভাল ঘুমের দরকার। নাথুকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে (কারণ তার দ্বারা এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই পাওয়া সম্ভব নয়) রামদীন ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাসার সন্ধানে বার হই।

রতিকান্ত বললে—গাড়ীর একটা আস্তানাও তো খুঁজতে হবে?

আমি বললাম—খুঁজে পেলে ভাল হয়। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা। নাথু তো শীতে জমে যাবে গাড়ীতে থাকলে বাইরে।

—রামদীন বরং পারে।

রামদীন বললে—হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া নেহি হুজুর—

কিন্তু বাসা কোথাও পাওয়া গেল না। কোহালা বড় জায়গা নয়। বাজারের সরাই-গুলো পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভিড়ে পরিপূর্ণ। একখানা দোকানের পেছনদিকে একটা ঘর আছে বটে, দোকানদার দেখালে।—কিন্তু সে ঘর এত অপরিষ্কার ও আলোবাতাস-হীন যে, সে ঘরে রাত্রি কাটানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া সে ঘরে বিশ্রাম করতে গেলে মোটর বাইরে পড়ে থাকে। রামদীন মুখে বলেছে বলেই তাকে হিমবর্ষী রাত্রে বাইরে শুইয়ে

রাখা যায় না।

রতিকান্ত বললে—উপায়?,

আমি এর আর কি উপায় বলবো!

পরামর্শ করা গেল সেই চায়ের দোকানীর কাছে আবার যেতে হবে। তাকে গিয়ে এমনভাবে ধরা হোল যেন এই পার্বত্য দেশে সে-ই আমাদের একমাত্র রক্ষক ও অভিভাবক। তারই মুখ চেয়ে আমরা বাড়ী থেকে এই দু-হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে এসেচি।

দোকানদার লোক ভালো। সে বলে দিলে বাজারের পেছন দিয়ে যে পথটা ছোট্ট পাহাড়টা ডিঙিয়ে চলে গেল, ওরই ওপারে এক বৃদ্ধ জাঠের বাড়ী। সে বাড়ীতে অনেক সময় লোকজনদের আশ্রয় দেয়।

আমরা দু'জনে দোকানদারের কথামত সেখানে গেলাম।

বাড়ীখানা কাঠের দোতলা। দেখে মনে হয়, এক সময়ে বাড়ীর মালিকের অবস্থা ভালই ছিল।

আমাদের ডাকাডাকিতে একজন বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা লম্বা সুপুরুষ ব্যক্তি দোর খুলে রুক্ষস্বরে জিগ্যেস করলে—কিস লিয়ে হল্লা মচাতে হো? কৌন হ্যায় তুম্ লোক?

আমরা বিনীতভাবে আমাদের আসবার কারণ ব্যক্ত করলাম। আমরা নিরীহ পথিক, কোনো গোলমাল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বৃদ্ধ বললে—কোথা থেকে আসচ তোমরা?

অবশ্য হিন্দীতেই বলেছিল কথা।

আমরা বললাম কলকাতা থেকে।

—ঘরভাড়া আমি দিই না।

—মেহেরবানি করে একটু জায়গা দিতেই হবে।

—কে বললে এখানে জায়গা আছে?

—বাজারে শুনলাম।

—আমি ঘরভাড়া দিই না।

—ভাড়া না দেন, একটু আশ্রয় দিন।

বৃদ্ধ একটুখানি কি ভেবে বললে—কজন লোক?

—চার জন। তবে একজন মোটরে শুয়ে থাকবে বাজারে।

—একখানা ঘরের বেশি দিতে পারবো না।

—তাই আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করবো।

—আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম লোকটি আমাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক আছে বলে আমাদের মনে হোল না। সিঁড়ির বাম দিকের কোণের ঘরে সে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললে—এই ঘরটা আমি দিতে পারি। আর ঘর নেই। কারপেটখানা পেতে নেবেন। বাইরের টবে জল আছে। গরম জল দিতে পারব না—কিন্তু—বলেই লোকটা চুপ করে গেল।

আমাদের ভয় হোল পাছে সে আবার মত বদলায়।

আমরা উভয়েই জোর করে বললাম—আপনার খুব মেহেরবানি। চমৎকার ঘরটি।

—জিনিসপত্র কোথায়?

—মোটরেই আছে। আরও দু-জন লোক মোটরে আছে। তদের একজনকে নিয়ে আসি।

—কি খাবেন রাত্রে? এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না।

—কোন দরকার নেই। আমরা দোকান থেকে আনিয়ে নেবো। চলুন, আমরাও নিচে যাই। বাজারে যাবো।

আধ ঘণ্টা পরে আমরা আবার এসে ঘরে বিছানাপত্র পেতে নিলাম। রামদীন মোটরেই রইলো। রতিকান্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। তারই অনুরোধে আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, তারপর আমি নিজে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

বাজারের রাস্তা সামনের ছোট পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যে উপত্যকায় নেমেছে, তারই

এপারে এই ছোট্ট দোতলা কাঠের বাড়ীটি। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেচে, সামনের নিম্ন-ভূমি অর্থাৎ উপত্যকায় বেঁটে ওক, চেনার ও সরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব শোভা। বাতাস বেশ শীতল। আমার যেন চোখে ঘুম আসচে না, এই সুন্দর বনাবৃত উপত্যকার শান্ত কুটিরখানি সারারাত্রি জেগে ভোগ করি এই যেন আমার মনের গূঢ় বাণী। কিন্তু শরীর মানলো না। পথক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়তে চাইছিল শয্যায়। অগত্যা শয্যা আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি জেগে উঠে বিছানার ওপরে বসলাম। কি একটা শব্দ যেন আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছি, তাতেই ঘুম ভেঙেচে। শব্দটা তখনও হচ্চে, আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়লো নিম্নের উপত্যকার বনভূমির দিকে। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়ল যাতে আমি পাথরের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। চাঁদ হেলে পড়েচে পশ্চিম আকাশে, তারই সুস্পষ্ট আলোতে দেখি একটি নারীমূর্তি আমার সামনের কি একটা বড় গাছের ডালে দোল্‌না বেঁধে দোল খাচ্ছে।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম। হ্যাঁ নারীই বটে, সুন্দরী নারী। বাইশ-তেইশের মধ্যে বয়স।

কিন্তু মেয়েটির দোল খাওয়ার স্থান—বিশেষ করে সময়, আমার কাছে বড় আশ্চর্য বলে মনে হোল। কাশ্মীরের দিকে কখনো আসি নি। এখানকার মেয়েরা এই হিমবর্ষী রাত্রের শেষ প্রহরে বনে এমন ভাবে দোলনা টাঙিয়ে দোল খায় নাকি?...

দৃশ্যটা যদি শুধু সুন্দর হোতো—সুন্দর সন্দেহ নেই—তাহলে আমি এমন অস্বস্তি বোধ করবো কেন? আমার যেন মনে হোল এই দৃশ্যের মধ্যে একটি জিনিস আছে—যা অশিব, যা নিয়মের বিপরীত, যা অমানুষী!—

তাড়াতাড়ি রতিকান্তকে ডাকলুম। সেও যখন বাইরে এল, তখনও মেয়েটি দোল খাচ্ছে।

রতিকান্তকে বললাম—ও কে ভাই?

সে অবাক হয়ে গিয়েছে। চোখ রগড়ে বললে—তাই তো!

—এখানকার মেয়েরা ওরকম করে নাকি?

—তা কি জানি?

হঠাৎ রতিকান্ত বলে উঠলো—ওকি! দোল্‌নায় দড়ি কই? গাছে টাঙিয়েচে কি দিয়ে? ভাল করে চেয়ে দেখলাম, সত্যই তো দোলনার দড়ি অস্পষ্ট এত যে চন্দ্রালোকে দেখা যাচ্ছে না। সরু তার হোলেও দেখা যাবে এ আলোতে। কিন্তু তার বা দড়ি কিচ্ছু নেই—শূন্যে ঝুলচে দোল্‌না! আরও একটা ব্যাপার যা এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম—আমাদের দিকে অল্প দূরেই গাছটার তলায় এ ব্যাপার ঘটচে, অথচ কোন রকম শব্দ আমাদের কানে আসচে না। সবসুদ্ধ মিলিয়ে যেন একটা ছবি।

রতিকান্ত বললে—ভাই, বাড়ীওয়ালাকে ডাকবো?

—ডাকো।

—আবার এরই কেউ না হয়—তাহোলে হয়তো চটে যাবে।

—তুমি ডাকো। যা হয় হবে।

কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিলাম দুজনে বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ড। পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি কোথায় সেই দোদুল্যমানা তরুণী নারী-মূর্তি! কিছুই নেই সে গাছের তলায়। ওই তো সেই বাঁকা ডালটা, জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠচে গাছটার শুভ্র কাণ্ড; পাশের বেঁটে ওক গাছটা তেমনি দেখা যাচ্চে—কিন্তু কেউ কোথাও নেই, গাছের তলা একদম ফাঁকা।

রতিকান্ত বললে—ওকি কোথায় গেল?

—তাই তো!

—আশে-পাশে নেই তো?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কেউ পালাতে পারে না—আমাদের দু'জনের চোখ এড়িয়ে এই জ্যোৎস্নালোকিত উপত্যকা থেকে। যাবার আর কোনো রাস্তা নেই, বাজারে যাবার ওই সঙ্গে পায়ে চলার পড় ছাড়া। পেছনে উঁচু পাহাড়টা। বনের নিচে আগাছার জঙ্গল নেই বাংলাদেশের মত—বেশ পরিষ্কার তলা দেখা যাচ্চে জ্যোৎস্নায়। সম্ভব নয়, কোথাও লুকানো বা পালানো আমাদের চোখ এড়িয়ে—এত অল্প সময়ের মধ্যে।

রতিকান্ত বললে—ব্যাপার কি?

—তাই তো আমিও ভাবচি!

—এ দেখচি একেবারে ম্যাজিক—

—সেই রকমই মনে হচ্চে!

—কি করা যাবে এখন?

—শোয়া ও ঘুমুনো।

রাত বড় বেশি ছিল না। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে রতিকান্ত ও আমি দেখি নাথুর তখনও নাক ডাকচে। ওকে উঠিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলে আমরা আবার এসে বারান্দায় দাঁড়ালুম। ওই সেই গাছটা, ওই সেই বাঁকা ডালটা। সত্যি সত্যি কাল শেষ রাতের দিকে আমরা দু'জনে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখেচি কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছেই মনে হচ্চে ওটা আসলে ঘটে নি, হয়তো রাত্রির স্বপ্ন।

স্বপ্ন? কি জানি?

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা মোটরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দোকানী বন্ধু চেরা সরল কাঠের ডাল উনুনে দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করচে। আমাদের দেখে বললে—কি, জব্বর ঘুম হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কোনো বিপদ-আপদ ঘটে নি তো?

আমি যেন দোকানীর কথার সুরে ও দৃষ্টিতে একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন লক্ষ্য করলুম।

আমরা চা দিতে বলে ওর দোকানের সামনে জাঁকিয়ে বসে রাত্রের ঘটনা সবিস্তারে ওকে বর্ণনা করলাম।

দোকানী ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—জানি বাবুজি। এই জন্যেই ও বাড়ীর সন্ধান আপনাদের দিতে ইতস্ততঃ করছিলাম। ওই বনে জ্যোৎস্নারাতে কত লোক ও মেয়েটিকে দুলতে দেখেচে। ও মানুষ নয় জিন, আফরিট্, হুরী—

বলে হাত নেড়ে যেন সব জিনিসটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আপনারা আজই কোহালা ছেড়ে চলে যান। আমি জানি যারা ওই খুবসুরত জিন হুরীর মোহে পড়ে ওই কাঠের ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন থেকে গিয়েচে—শেষকালে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। একবার একটি আত্মহত্যাও ঘটেছিল। বেশিদিন থাকলেই বিপদে পড়ে যাবেন। বাড়ীওয়ালা বুড়ো ওই জন্যেই আজকাল বাড়ীভাড়া দিতে চায় না।

আমরা বললাম—তোমরা তো স্থানীয় লোক, তোমরা দেখতে পাও?

—রোজ কি জিন, আফরিট্দের নজরে পড়ে? দু-মাস হয়তো কিছুই না, একদিন হয়ে গেল। কানুন কিছু নেই। তবে কানুনের মধ্যে এই চাঁদনি রাত হওয়া চাই আর রাতের শেষ প্রহর চাই। এখানকার লোকেরা সাঁঝ জ্বালার পর ও-পথে বড় একটা যাতায়াত করে না।.....

—হ্যাঁ, এক রুপেয়া সাড়ে সাত আনা হুজুর। আদাব হুজুর।

রক্ষিণী দেবীর খড়্গ

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদের সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতি-প্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার যুক্তিযুক্ত কারণ তখন বা আজ কোনদিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস ; তাঁহারা যদি সে রহস্যের কোনো স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিব।

ঘটনাটা এইবার বলি।

কয়েক বছর আগেকার কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাস্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাঙলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমির কোনো পল্লী আর চোখে ভালো

লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বি ভাবে সারা গ্রামের বাড়ীগুলি অবস্থিত—সর্বশেষ সারির বাড়ীগুলির খিড়কি দরজা খুলিলেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুরচি, বিল্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল, একটা সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদী, ছোট বড় শিলাখণ্ড ও ভেলা-কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া এক জায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমবাসী বাঙালী। একটা কথা—চেরো গ্রামে বেশির ভাগ অধিবাসী মাদ্রাজী, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে, অনেকে বাংলা আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কি করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজী অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজ-বাড়ীর দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মতো ধরনটা—এ অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহশূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালে পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়, —অনুভূতিটা ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল একথা তারপর বাড়ী ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম ভালো করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল, "যাবেন না স্যার ওদিকে..."

"কেন?"

"জায়গাটা ভালো না। সাপের ভয় আছে সন্ধ্যেবেলা। তা ছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয়ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।"

"ওটা কি মন্দির?"

"ওটা রঙ্কিণী দেবীর মন্দির, স্যার। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনো দিন ওখানে পুজো হ'তে দেখে নি—মূর্তিও নেই বহুকাল। ওইরকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলেরও আগে থেকে।...চলুন স্যার নামি।"

ছেলে দুটো যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল নামিবার জন্য।

রঙ্কিণী দেবী বা তাহার মন্দির সম্বন্ধে দু-একজন বৃদ্ধ লোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতেও তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম।

বছর খানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজকর্ম খুব হাল্কা, অবসর সময়ে এ-গ্রামে ও-গ্রামে বেড়াইয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেকদিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড় মেলা বসে। বি-এন-আর লাইনের একটা ছোট স্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূমপ্রবাসী উড়িয়া

ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়া গেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট, পুঁথি, ঘট সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টারও। এদেশে প্রচলিত কত রকম আজগুবী ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের—কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশী) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এই সব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ পোস্টমাস্টারের বাড়ীতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এই সব অরণ্য সভ্যজগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক, জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ায় শালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কি? কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন, "চেরো পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির দেখেচেন?" আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম।

রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি আর কোনো কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম, "মন্দির দেখেচি, কিন্তু রঙ্কিণী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিগ্যেস্ করেচি সে-ই চুপ করে গিয়েচে কিংবা অন্য কথা পেড়েচে—এর কারণ কিছু বলবেন?"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "রঙ্কিণী দেবীর নামে সবাই ভয় খায়।"

"কেন বলুন তো?"

"মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করতো। তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদের ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মতো নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর—আগে ওই মন্দিরে নরবলি হ'ত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী মন্দিরে নরবলি হয়েচে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিণী দেবী অসন্তুষ্ট হ'লে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহ'লে। এরকম অনেকবার হয়েচে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।"

"রঙ্কিণী দেবীর বিগ্রহ দেখেছিলেন মন্দিরে?"

"না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখচি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায়, অন্য কোন্ দেশে। রঙ্কিণী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ী ছিল ওই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তাঁর বাড়ী অনেকবার গিয়েচি। দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি। এখন তাঁদের বংশে আর কেউ নেই। তার পর চেরো গ্রামেও আর বহুদিন যাই নি—বয়েস হয়েচে, বড় বেশি কোথাও বেরুই নি।"

"বিগ্রহ মূর্তি কি?"

"শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকতো অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েচে তার লেখা-জোখা নেই—এখনও মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের

মধ্যে একটা ঢিপি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।"

সাধে এদেশের লোক ভয় পায়! শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছমছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে-দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে হয়তো সেখানে আরও অনেকদিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালীদের সঙ্গে মাদ্রাজীদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজীরা স্কুলের জন্য বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবী করিতে লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজির মাস্টার একজন মাদ্রাজী রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজি পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকুরি রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটি হাই স্কুল হইয়াছিল, পূর্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাস্টারি আমায় ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সে কথা বলিব।

এই সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কি কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গরুরগাড়ী সমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়ীতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনও আমার বাসায় আসেন নাই; বাড়ীতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "এই বাড়ীতে থাকেন আপনি?"

বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ী তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছর খানেক হ'ল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথন্ এটা ঠিক করে দিয়েচেন।"

পুরানো আমলের পাথরের গাঁথুনির বাড়ী। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটা সরু যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ীর একটু চুন বালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়ীটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়ীটার গড়ন তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, বলিলাম, "সেকালের গড়ন, খুব টনকো—আগাগোড়া পাথরের।"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "না, সেজন্য নয়। আমি এই বাড়ীতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম—এই বাড়ীই হ'ল রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এ বাড়ীতে আছেন তা জানতাম না।...তা বেশ বেশ। অনেকদিন পরে বাড়ীটাতে ঢুকলাম কিনা, আমার বড় অদ্ভুত লাগচে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, আর এখন হ'ল প্রায় ষাট।" তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছর খানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই, কারণ এখানকার বাঙালী-মাদ্রাজী সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে, আপাততঃ আমার চাকুরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম—মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ী করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখহরি আমার রাঁধে,

এ কয়দিন স্কুলের ছুটি ছিল, রাখহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই রাখহরি বলিয়া উঠিল, "এঃ, বাবু, এ কিসের রক্ত! দেখুন..."

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তাই বটে! বাহিরের দরজায় চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতেই রক্তের ধারা উঠান বাহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য যেন কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমি তো অবাক্। কিসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল, আজ দুদিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ীর ভিতরের উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্য তাজা রক্ত!

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম, "দেখ তো রে, রক্তটা কোন্ দিকে যাচ্ছে—এ সেই বড় হুলো বেড়ালটার কাজ..."

রক্তের ধারাটা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নিচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরনো মালে ভর্তি বলিয়া আমি কোনোদিন চোরকুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালা বন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্রপথ দরকার হয়।

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটায় পুরনো, ভাঙা, তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরানো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচাধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি বাবু! এতে কি করে এমনধারা রক্ত লাগল..."

তারপর সে কি একটা জিনিস হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখুন কাণ্ডটা বাবু..." জিনিসটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচাধরা হাতলবিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রাম দা— আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাজা রক্তে টক্‌টকে রাঙা! একটু আধটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে এখনি টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে!

সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ী এটা। পুরানো জিনিসের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়াছিল হয়তো।...মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার প্রবাদ।

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাই নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেরো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগীর খবর পাওয়া গেল। তিনদিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেরো, তারপর পাশের গ্রাম কাজরা, ক্রমে জয়চণ্ডীতলা পর্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধুলধাবাড় হইতে

লাগিল। চেরো গ্রামের মাদ্রাজী বংশ প্রায় কাবার হইবার যোগাড় হইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম ; তারপর আর কখনো চেরোতে যাই নাই— গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বেই দেশের স্কুলের চাকুরিটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রক্ষিণী দেবীকে মনে মনে ভক্তি করি। তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকে অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।

মৌচাক, আশ্বিন ১৩৪৭

কয়েক বছর পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে ; আমারই কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুন হয়তো চোখে ভুল দেখে থাকবো বা ওই রকম কিছু।—কিন্তু আমার মন বলে, তা নয়, ঘটনাটা মিথ্যে ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি। আমার তখনকারের অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যা ভাবচি, তাই মিথ্যে।

ঘটনাটা খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই একথা বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনো রোগ-বালাই নেই। আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে সময়ের কথা বলচি, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। আমার স্কুল-মাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য ধরনের কখনও কিছু দেখি নি। অন্য, পাঁচ-জন স্কুলমাস্টারের মতোই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন-বাঁধা কর্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহু বৎসর।

সে বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কি একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করচে, আমার চোখে পড়ল। আমি ওদের দু'জনকে অমনোযোগিতার জন্যে ধমক দিতে, অন্য একটি ছেলে বলে উঠলো, "স্যার, কামিখ্যে সুধীরের মেডেল কেড়ে নিচ্ছে..."

"কার মেডেল? কিসের মেডেল?"

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার মেডেল, স্যার!"

অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বললুম, "ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিখ্যে?"

কামিখ্যে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে, "নিচ্ছিলুম না স্যার, দেখতে চাইছিলুম ; তা, ও দেবে না..."

"ওর মেডেল যদি ও না দেয় ; তোমার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে? বোসো, ও রকম আর করবে না..."

কথা শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সখ্য থাকার ঔচিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পরে ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, "কই, কি মেডেল দেখি? কোথায় পেলে মেডেল?"

ভেবেছিলুম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে সব ব্যাডমিন্টন্ খেলা, সাঁতারের বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারই কোন কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থ স্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্যলাভ করে ছোট্ট এতটুকু একটা আধুলির

মতো মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচ-জনকে গর্ব-ভরে দেখাতে চাইবে ; এমন কি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাসসুদ্ধ হেড-মাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে একবেলার জন্যে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছুলো, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাত পেতে নিলুম ; কিন্তু মেডেলটার দিকে একবার চেয়ে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম। না, এ তো পাড়ার ব্যাডমিন্টন্ ক্লাবের বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরনো, বড় ও ভারি চমৎকার গড়ন!—কি জিনিস দেখি?

মেডেলের গায়ে কি লেখা রয়েচে, আধ-অন্ধকার ক্লাসরুমে ভালো পড়তে পারলুম না—ও-পিঠ উল্টে দেখি, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্তি খোদাই করা। পকেটে চশমা নেই, মনে হ'ল অফিস ঘরের টেবিলে ফেলে এসেচি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করেচে আমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে। তাদের ধমক দিয়ে বললুম, "যাও, বোসোগে সব, ভিড় কোরো না এখানে।"

একটা ছেলেকে বললুম, "কি লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড়ো তো?"

ক্লাস ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে, "ক্রাইমিয়া, সিবাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা...।"

"ও পিঠে?"

"সার্জেন্ট এস্. বি. পার্কিন্‌স্, সিক্সথ ড্রাগন্ গার্ডস্—আঠারো শ চুয়ান্ন সাল..."

দস্তুরমতো অবাক্ হয়ে গেলুম। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় সিবাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে কোনো সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলণ্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্রাগন্ গার্ডস্ সৈন্যদলের সার্জেন্ট পার্কিন্‌স্‌কে। এ তো সাধারণ জিনিস মোটেই নয়!

ক্রাইমিয়া...সিবাস্টোপোল?...চার্জ অফ্ দি লাইট্ ব্রিগেড! কিন্তু কলকাতার নীল-মণি দাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে মেডেল কোথা থেকে আসে?

"এদিকে এসো, এ মেডেল কোথায় পেয়েচ?"

"ওটা আমার স্যার!"

"তোমার তা বুঝলুম। পেলে কোথায়?"

"আমার দাদু দিয়েচেন স্যার।"

"তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো?"

"হ্যাঁ, স্যার, জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাহেব জমা রেখে গিয়েছিল।"

"কি ভাবে?"

"আমাদের মদের দোকান ছিল কিনা, স্যার! মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায় নি—দাদুর মুখে শুনেছি।"

হিসেব করে দেখলুম ছিয়াশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। সেই বছরটি থেকে, যে বছরে সার্জেন্ট পার্কিন্‌স্ (সে যে-ই হোক্) এ মেডেল পায়। তখন তার বয়স যদি কুড়ি বছরও থেকে থাকে, এখন তার বয়স হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোন্ কালে।

সেদিন ছিল শনিবার, সকাল সকাল স্কুল ছুটি হবে এবং অনেক দিন পরে সেদিন দেশে যাবো পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলুম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলুম, তাঁকে মেডেলটা দেখালে খুশি হবেন খুব। সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলুম, সোমবারে ফেরত দোব বললুম। স্কুলের ছুটির পরে বাসা থেকে সুটকেস্ নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে

এসে আড়াইটের গাড়ী ধরলুম। দেশের স্টেশনে যখন নামলুম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। দু'মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ী পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই হয়তো পৌঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটি নি।

ভাদ্র মাসের শেষ, অথচ বৃষ্টি তত বেশী না হওয়ায় পথ-ঘাট বেশ শুকনো খট্-খটে। পথের ধারের বর্ষা-শ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভালো লাগছিল অনেক দিন কলকাতা বাসের পরে—তাই জোরে পা না চালিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলুম। এখানে প্রথমেই বলি, আমার বাড়ীতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর। আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন, অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে, পিসিমার মুখে শুনলুম, আজ দিন পনরো হ'ল বৃন্দাবন বাড়ী এসেচে। শুনে বড় আনন্দ হ'ল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হলুম—যাবার সময় সুটকেসটা খুলে মেডেলটা পকেটে নিলুম, বৃন্দাবনকেও দেখাবো।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুন নদীর জল ভয়ানক বেড়েচে, নদীর জল কূল ছাপিয়ে দু'ধারের মাঠে পড়েচে। অনেকক্ষণ বসে রইলুম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামল একটু একটু, বাদুড়ের দল বাসায় ফিরচে। কেউ কোনো দিকে নেই।—এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে গিয়েচে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরস্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতে একবার কি-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত দেখচি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জেগে উঠলো—আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়বো! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটা যেন ক্রমে বেড়ে উঠচে... লাফাই...দিই লাফ...! অথচ বর্ষার খরস্রোতা নদী, কুটো ফেললে দু'খানা হয়ে যায়; আমি সাঁতার জানি না,—গভীর জল পাড়ের নিচেই। ইচ্ছাটা কিছুতেই যেন সামলাতে পারচিনে! এমন কি আমার মনে হ'ল আর কিছুক্ষণ থাকলে লাফ দিতেই হবে, নইলে আমার জীবনের সুখ চলে যাবে!...

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে এক রকম জোর করেই চলে এলুম। কারণ যেন মনে হচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশ সীসের মত ভারি হয়ে উঠচে—এর পর ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাবে আমার!...

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ী আসবার পথে ওসব ইচ্ছে আর কিছু নেই! আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম—কি অদ্ভুত! এ রকম হওয়ার মানে কি? ট্রেনে বসে অতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়লো। এই ভাদ্র মাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিক হয় নি, তার ওপর বাড়ী এসে দু'তিন পেয়ালা চা খেয়েচি। এসবেই ওরকমটা হয়ে থাকবে।—নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ী গেলুম। বৃন্দাবনকে অনেক দিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হ'ল। দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত বসে অনেক গল্প করলুম। অনেক বছর ধরে জমানো অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় গরম আজ, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্র-মাসের গুমোট গরম। বৃন্দাবন বললে, "চল্ ভাই, ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে।...তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েচেন। তোদের বাড়ীতেও খবর দেওয়া হয়েচে।"

দু'জনে ছাদে উঠলুম। বাড়ীটা দো-তলা। দোতলার ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতুম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন। দোতলার ছাদে উঠে

দেখলুম—বাড়ীর পেছন দিক্‌টায় বাঁশের ভারা বাঁধা। বললুম, "বাড়ীতে রাজমিস্ত্রি খাটচে বুঝি, বৃন্দাবন?"

"হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে; উত্তর দিকে দেওয়ালটার গা থেকে নোনা ধরা ইটগুলো বার করা হচ্ছে।"

বৃন্দাবন দোতলার ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—আমার কিন্তু মনে কেমন একটা অস্থির ভাব! খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল খেতে চাইলুম। বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম। ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা।...যে দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করচে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ আমার মনে হ'ল—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন?

বেশ হবে!...লাফ দেবো? প্রায় দুর্দমনীয় ইচ্ছা হ'ল লাফ দেবার। লাফ দেওয়াই ভালো।...লাফ দিতে হবে।...দিই লাফ?...এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে, "আয় ঘরের মধ্যে, মা চা পাঠিয়ে দিচ্চেন; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?..."

আরও প্রায় আধ-ঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও খাবার এসে পৌঁছুলো। আমরা দুই বন্ধুতে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করলুম। তার পর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড় হ'ল দেখতে নিচে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার বেড়াতে লাগলুম। রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমার মনে হ'ল—লাফ এবার দিতেই হবে! কেউ নেই ছাদে। কেউ বাধা দিতে আসবে না—এই উপযুক্ত অবসর! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের গভীর তলায় কে যেন বলচে—'লাফ দিও না, মূর্খ! লাফ দিও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে।'...আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করচে!...

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসে থেকে কি হ'ল তাও জানিনে,—হঠাৎ বৃন্দাবনের চীৎকারে আমার চমক ভাঙলো! দেখি, বৃন্দাবন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলচে!

"একি সর্বনাশ! তুই লাফ দিয়ে পড়লি দেখলুম যেন! ভাগ্যিস্, বাঁশে পা বেধে গিয়েচে তাই রক্ষে...কি হ'ল তোর?"

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল, গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। বৃন্দাবনকে বললুম, "আমি ভাই কিছুই জানিনে তো?"

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে। সকলে বললে ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে শরীর কি রকম খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ে আমি যাই নি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলুম—তবে ঠিক যে সময়টাতে আমি লাফ দিয়েচি সে সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কি একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—সুধীরের সেই মেডেলটা।

আশ্চর্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম! বৃন্দাবনকে সেটা দেখালুম। ওদের বাড়ীর সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্তিরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আমার বাড়ীতে কেউ নেই বর্তমানে, একাই থাকি এক ঘরে। একটা জিনিস লক্ষ্য করচি; যখন থেকে বৃন্দাবনের বাড়ী থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েছি, তখন থেকেই কেমন এক ধরনের ভয় করচে আমার! বাড়ীতে যখন ঢুকলুম, তখন ভয়টা যেন বাড়লো। একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েচি—এমন ভয় হয় নি মনে কোন দিন।...না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে মনও

দুর্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানলা—জানলা দিয়ে বাড়ীর পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে—কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশীর জ্যোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানলা খুলে রেখেছি। কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানি নে, ঘণ্টা-খানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হ'তে লাগলো 'আমার শিয়রের দিকের জানলায় কে দাঁড়িয়ে! যেন মাথা তুলে সেদিকে চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হ'ল। অথচ কিসের যে ভয় জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানলার দিকে তাকাতে পারলুম না। চোখে না দেখলেও আমার বেশ মনে হ'ল, জানলার গরাদেতে দুটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে—জ্বলন্ত চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েচে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাবো।

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম—কিছুতেই চাইবো না। ঘুমুবার চেষ্টা করলুম,—কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে? কিসের পচা গন্ধ? যেন আয়োডিন্, লিণ্ট, মলম প্রভৃতি উগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো? এতকাল বাড়ীতে থাকা নেই, যার ওপর বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখার ভার, সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল...

কে যেন আমার মনের ভেতর বলচে, "চেয়ে দেখ, তোমার মাথার শিয়রের জানলার দিকে চেয়ে দেখ না?"

ঘরের চারিধারে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্ত ধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত! সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—এমন কি সে দোরের চৌকাঠ পার করে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিমশীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে!...

...আমি চাইবো না...কিছুতেই চাইবো না শিয়রের জানলার দিকে।

কিন্তু যে প্রভাবই হোক্, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা বাস্তু শালগ্রামের অর্চনা করেচেন এ ঘরে...এর মধ্যে কারো কিছু খাটবে না। আমার মনই আবার এ কথাগুলি যেন বললে! অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে মন কত কয়!

জানলার ধারে কি যেন একটা শব্দ হ'ল।

অদ্ভুত ধরনের শব্দটা। কে যেন জানলার গরাদের ওপর টোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচে!...একবার...দুবার, তিনবার...ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগলো...কাউকে ডাকবো চীৎকার করে?...একবার চেয়ে দেখবো জানলার দিকে জিনিসটা কি? হঠাৎ আমার মনে পড়লো একটা ধাড়ী বেঁজী অনেকদিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে...আজ বিকেলেও সেটাকে একবার দেখেচি। জানলার ওপরকার কাঠে সেটা পোকামাকড় বা জোনাকি ধরছে...এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হ'তেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এলো।...উঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন!...শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ! পাশ ফিরে এবার ঘুমুবার চেষ্টা করলুম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এ ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। এ ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নই—আরও কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেচে—আমায় সে নিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না

আজ।...

বার বার ঘুম আসে, আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি ; কিন্তু চোখ চাইতে বা বিছানার ওপর উঠে বসতে সাহস হয় না...আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানলার গরাদের ওপর হ'তে শুনি—খুব মৃদু করাঘাতের শব্দ যেন!...যেন শব্দটা বলচে—"চেয়ে দেখ...পেছন ফিরে জানলার দিকে চেয়ে দেখ..."

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েচে, ভাদ্রের গুমট গরম কিনা! এই অবস্থায় ভোর হ'ল। দিনের আলো ফুটল, লোকজনের শব্দ কানে যেতে রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে! নিশ্চিন্ত মনে বেলা ন'টা পর্যন্ত পড়ে ঘুম দিলুম। তার পর উঠে, চা খেয়ে, পাড়ায় বেড়াতে বার হওয়া গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো—তখন আমি তার বিশেষ কোন মূল্য দিই নি—কিন্তু পরে সব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারী আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল। ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা, তাঁকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম—কিন্তু বৃন্দাবনদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি...

আমায় দেখে তিনি বললেন, "এই যে সুরেন, ভালো আছ? কাল তুমি এসেচ দেখলুম, তখন অনেক রাত, তা আর ডাকলুম না। বোধ হয় বৃন্দাবনের বাড়ী থেকে ফিরছিলে? আমি তখন ছাদে পায়চারি করচি, যে গরম গিয়েচে বাবা কাল রাত্তিরে... তোমার সঙ্গে লোক রয়েচে দেখে আরও ডাকলুম না। ও লোকটি কে? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবীর মতো লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি? বাঙালীর মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ!"

আমি অবাক্ হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললুম, "আমার সঙ্গে লম্বা লোক কাল রাত্তিরে! সে কি জ্যাঠামশায়?"

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক্ হয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে লোক ছিল না বলচো? একা যাচ্ছিলে? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা..."

আমি হেসে বললুম, "তাই হবে, জ্যাঠামশায়। চোখে কি রকম ঝাপ্‌সা দেখে থাকবেন। বয়েস হয়েচে।...আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, তাছাড়া আপনাদের বাড়ীর সামনের আম-গাছটার ছায়া...কি রকম আলো-আঁধার দেখেচেন চোখে...অমন ভুল হয়।"

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন! বললেন, "কি আশ্চর্য কাণ্ড? এতটা ভুল হবে চোখে? আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলুম তুমি আর তোমার পেছনে একজন লম্বা মতো লোক...তার পর তুমি টর্চ নিবিয়ে আম-গাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখনও জ্যোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে পেলুম লোকটি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে...তোমার মাথার চেয়েও যেন এক হাত লম্বা...তোমার একেবারে ঠিক পেছনে...তবে খুব ভালো তো দেখতে পেলুম না...অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো! এমন কি একবার এ পর্যন্ত মনে হ'ল তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি তোমার বন্ধুটি কে?...একেবারে এত ভুল হবে চোখে?"

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললুম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলুম, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারের অন্য কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটানো গেল। গতকাল রাত্রের ভয়ের ব্যাপার

দিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের মনে হ'ল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটা বলিও নি।

রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবো। বৃন্দাবনদের বাড়ী থেকে চা খেয়ে বাড়ী এসে সুটকেসটা নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েচি, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নেমেচে। বাউরিপাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে আসচি...বাগানটা পার হ'তে প্রায় পাঁচ-ছ মিনিট লাগে—মস্ত বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝামাঝি এসে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইলুম কি ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচম্‌কা ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেল।

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে?

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধ-অন্ধকারে এক অদ্ভুত মূর্তি। খুব লম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরনের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়ে থুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে ধরনের টুপি দেখা যায়! মূর্তিটা যেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে! আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে! মরীয়ার মতো আর একটু এগিয়ে গেলুম। এই ভয়ানক কৌতূহল আমাকে চরিতার্থ করতেই হবে যেন! মূর্তি নড়ে না—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি। কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখচি সাত আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্তিটা। আর ঘোড়ার বালামচির লম্বা টুপি ও ইস্পাতের চেনের স্ট্র্যাপ্ স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

আমার পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসচে, মাথাটা হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েচে! বোধ হয় আর আধ মিনিট এ-ভাবে থাকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতুম—কারণ সেই ভীষণ মূর্তিটার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে—আমার পা দুটো বেজায় ভারী হয়েচে—নাড়বার উপায় নেই মূর্তির সামনে থেকে...

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাউরিবাগানের পথে লণ্ঠন নিয়ে কারা ঢুকলো। দু-তিন জন লোকের গলার শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এলো। আমি ওদের ডাক দিলুম চীৎকার করে। ওরা ছুটে এলো। আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললে, "ওখানে কি বাবু? কি হয়েচে?..."

তারপর লণ্ঠন তুলে ওরা আমার মুখ দেখে বললে, "ও আপনি? কি হয়েছে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েচে—ভয়টয় পেলেন নাকি? বাউরি-বাগান জায়গাটা ভালো না। সন্ধ্যের পর এখানে অনেকে ভয় পায়।"

ওদের লণ্ঠনটা যখন উঁচু করে তুলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলুম—সামনের মূর্তিটা তখনও সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে! একজন বললে, "কি দেখ-ছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই ষাঁড়াগাছটা?"

আর একজন বললে, "গাছটার ডালপালা কেটে মাথায় ঝোপের মতো করে রেখেচে, যেন মানুষ বলে অন্ধকারে ভুল হয় বটে...চলে আসুন বাবু!"

আমিও দেখলুম ষাঁড়াগাছই বটে। মাথার দিকের পাতাগুলো ছেঁটে গাছটাকে দেখতে হয়েচে ঠিক হর্স্‌গার্ড্‌সদের ঘোড়ার বালামচির টুপি! লোকের চোখের কি ভুলই হয়? কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলুম! ভেবে লজ্জা হ'ল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হ'তেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা!

ওরা আমায় আলো ধরে স্টেশনে পেঁছে দিলে।

পরের দিন স্কুলে সুধীরের মেডেলটা ফেরত দিলুম।

সুধীর বললে, "আপনাকে দাদু একবার ডেকেচেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়ী আসুন। নিয়ে যেতে বলেচেন।"

সুধীরের দাদু বললেন, "যাক, আমার বড় ভয় হয়েছিল, মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েছেন দেশে শুনলাম কিনা? আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তা'হলে একটা তার করে দিতুম।...ও মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়ে যায়—আমি তখন জন্মাই নি। বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারে নি। বেজায় মাতাল আর গোঁয়ার ছিল লোকটা। ও মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে। আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুনলে না—অনেক কাল আগের কথা—বাড়ী নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে; সেই দিনই সন্ধ্যের সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুলো।..."

আমি কলের পুতুলের মতো শুধু বললুম, "ছাদ থেকে?...পকেটে মেডেল পাওয়া গেল?..."

"হ্যাঁ, মাস্টারবাবু। আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথা তো বলবো না। আজ সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা।...ওটা আরও দু-এক জন নিয়েচে—তক্ষুনি ফেরত দিয়ে গিয়েচে। বলে রাতে ভয় পায়, গা ছমছম করে। কে যেন পেছনে ফলো করচে বলে মনে হয়! ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না। প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়।...তাই ভাবছিলুম একটা তার করে দেবো..."

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে যাই। বাউরিবাগানে ঢুকে যেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলুম, সেদিকে চেয়ে দেখে সে ষাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখে পড়লো না। যে আমগাছটার ধারে ষাঁড়াগাছটা দেখেছিলুম, সেখানে দিন-মানে বেশ ভালো করে দেখেছি—কোথাও সে ষাঁড়াগাছ নেই—বা গাছ কেটে নিলে যে গুঁড়িটি থাকবে, তারও কোন চিহ্ন নেই। কস্মিন্‌কালে সেখানে একটা বড় ষাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না জায়গাটা দেখে।...

'মায়ামুকুর', দেবসাহিত্য কুটির শারদীয়া, ১৩৪৭

পেয়ালা

সামান্য জিনিস। আনা তিনেকের দামের কলাই-করা চায়ের ডিস-পেয়ালা।

যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে ওরা ঢুকল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শীতকাল ; সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় কাকার গলার স্বর শুনে দালানের দিকে গেলাম। কাকা গিয়েছিলেন দোকান নিয়ে কুলবেড়ের মেলায়। নিশ্চয় ভাল বিক্রী-সিক্রী হয়েছে!

উঠোনে দুখানা গরুর গাড়ী। কৃষাণ হরু মাইতি একটা লেপ-তোশকের বাণ্ডিল নামাচ্ছে। একটা নতুন ধামায় একরাশ সংসারের জিনিস—বেলুন, বেড়ী, খুন্তী, ঝাঁঝরি, হাতা। খানকতক নতুন মাদুর, গোটা দুই কাঁঠাল কাঠের নতুন জল-চৌকী। এক বোঝা পালংশাকের গোড়া, দু-ভাঁড় খেজুর গুড়, আরও সব কি কি।

কাকা আমায় দেখে বললেন—নিবু, একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়—এটায় তেল নেই।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরের লণ্ঠনটা নিয়ে এলাম। পিসিমা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন ; কিন্তু তখন কে কথা শোনে?

কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম—মেলায় এবার লোকজন কেমন হ'ল কাকা?

কাকা বললেন—লোকজন প্রথমটা মন্দ হয়নি, কিন্তু হঠাৎ কলেরা শুরু হয়ে গেল, ওই তো হল মুশকিল! সব পালাতে লাগল, বাঁওড়ের জলে রোজ পাঁচটা ছটা মড়া ফেলছিল, পুলিস এসে বন্ধ করে দিলে, খাবারের যত দোকান ছিল সব উঠিয়ে দিলে, কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমে বেড়ে চলল। শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। বিক্রিসিক্রী

কাঁচকলা, এখন খোরাকি, গাড়ীভাড়া উঠলে বেঁচে যাই।

খেতে বসে কাকা মেলার গল্প করছিলেন, বাড়ির সবাই সেখানে বসে। কি ক'রে প্রথমে কলেরা আরম্ভ হ'ল, কত লোক মারা গেল, এই সব কথা।

—আহা সাম্‌টা-মানপুর থেকে কে একজন, যদু চক্কোত্তি না কি নাম—একখান ছই-এর গাড়ি পুরে বাড়ির লোক নিয়ে এসেচে মেলা দেখতে। ছেলে-মেয়ে, বৌ ঝি, সে একেবারে গাড়ি বোঝাই। বাঁওড়ের ধারের তালতলায় গাড়ি রেখে সেখানেই সব রেঁধে খায়-দায়, থাকে। দু-দিন পরে রাত পোয়ালে বাড়ি ফিরবে, রাত্তিরেই ধরল তাদের একটা ন-বছরের মেয়েকে কলেরায়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, সকাল দশটায় সেটা গেল তো ধরল তার মাকে। রাত আটটায় মা গেল তো ধরল বড় ছেলের বৌকে। তখন এদিকেও রোগ জেঁকে উঠেচে, কে কাকে দ্যাখে—তারপর সে যা কাণ্ড। এক-একটা ক'রে মরে, আর পাশেই বাঁওড়ের জলে ফেলে—আধেক গাড়ি খালি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের যা সর্বনাশ ঘটল আমাদের চোখের সামনে, উঃ!

কাকা ভূষি-মালের ব্যবসা করেন। প্রায় চল্লিশ মণ সোনামুগ মেলায় বিক্রীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, মণ বারো, না তেরো কাটাতে পেরেছিলেন, বাকী গরুর গাড়িতে ফিরে আস্‌চে, কাল সকাল নাগাত পৌঁছুবে। গাড়িতে আছে আমাদের আড়তের সরকার হরিবিলাস মান্না।

কাকা খেয়ে উঠে যাবার একটু পরেই কাকার ছোট মেয়ে মনু একটা কলাই-করা পেয়ালা রান্নাঘরে নিয়ে এসে বললে, এই দ্যাখো জ্যাঠাই-মা, বাবা এনেছেন, কাল আমি এতে চা খাব কিন্তু। হাতে তুলে সকলকে দেখিয়ে বললে—বেশ, কেমন, না? মেলায় তিন আনা দরে কেনা—

এই প্রথম আমি দেখলুম পেয়ালাটা।

সে আজ চার বছরের কথা হবে।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। আমি কাজ শিখে এখন টিউবওয়েলের ব্যবসা করি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডের কাজ সংগ্রহ করবার জন্যে এখানে-ওখানে বড় ছুটো-ছুটি ক'রে বেড়াতে হয়; বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকা আজকাল আর বড় ঘটে না।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা আসব, আমার বিছানাপত্র বেঁধে রান্নাঘরে চায়ের জন্যে তাগাদা দিতে গিয়েচি—কানে গেল আমার বড় ভাই-ঝি বলচে—ও পেয়ালাটাতে দিও না পিসিমা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও পেয়ালাটাকে দেখতে পারে না দু-চোখে—

আমি বল্লুম—কোন্ পেয়ালাটা রে? কি হয়েচে পেয়ালার?

আমার ভাই-ঝি পেয়ালা নিয়ে এল, মনে হ'ল কাকার কেনা অনেক দিনের সে পেয়ালাটা।

সে বল্লে—বৌদির অসুখের সময় এই পেয়ালাটা ক'রে দুধ খেতেন, তারপর বাবার সময়ও এতে ক'রে ওঁর মুখে সাবু ঢেলে দেওয়া হ'ত—মা বলে, আমি ওটা দেখতে পারি নে—

আমার এই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী কলকাতা থেকে আমাদের এখানে বেড়াতে এসে অসুখে পড়েন এবং তাতেই মারা যান। এর বছর দুই পরে কাকাও মারা যান পৃষ্ঠব্রণ রোগে। কিন্তু এর সঙ্গে পেয়ালাটার সম্পর্ক কি? যত সব মেয়েলি কুসংস্কার!

পরের বছর থেকে আমার টিউবওয়েলের কাজ খুব জেঁকে উঠল, জেলা বোর্ডের অনেক কাজ এল আমার হাতে। আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, দূর-দূরান্তের পাড়াগাঁয়ের নানা স্থানে টিউবওয়েল বসানো ও মিস্ত্রী খাটানোর কাজে মহা ব্যস্ত—

বাকী সময়টুকু যায় আর-বছরের বিলের টাকা আদায়ের তদ্বিরে।

সংসারেও আমাদের নানা গোলযোগ বেধে গেল। কাকা যত দিন ছিলেন কেউ কোনো কথাটি বলতে সাহস করে নি সংসারের পুরানো ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এখন—সবাই হয়ে দাঁড়াল কর্তা, কেউ কাউকে মেনে চলতে চায় না।

ঠিক এই সময় আমার ছোট ছেলের ভয়ানক অসুখ হলো। আমার আবার সেই সময় কাজের ভিড় খুব বেশী। জেলা বোর্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েচে, কিন্তু টাকার তাগাদা করতে হবে ঠিক এই সময়টাতে। নইলে বিল চাপা পড়তে পারে ছ-মাস বা সাত মাসের জন্যে। আমি আজ জেলা, কাল মহকুমা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম, —এ-মেম্বর ও-মেম্বরকে ধরি, যাতে আমার বিলের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন ওদিকেও কাজ মিটে গিয়েচে। ছেলেটি মারা গিয়েচে—অবিশ্যি চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি কিছু, এই যা সান্ত্বনা।

বছরের শেষে আমি শহরে বাসা ক'রে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে এলাম। বাড়ির ওই সব দুর্ঘটনার পরে সেখানে আমাদের কারুর মন বসে না, তাছাড়া আমার ব্যবসা খুব জেঁকে উঠেচে—সর্বদা শহরে না থাকলে কাজের ক্ষতি হয়।

টিউবওয়েলের ব্যবসাতে নেমে একটা জিনিস আমার চোখে পড়েচে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের মত অলস প্রকৃতির জীব বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অত অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ যে কি ক'রে হতে পারে সে যাঁরা এদের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের ধারণাতেও আসবে না। নিশ্চিত মৃত্যুকেও এরা পরম নিশ্চিন্তে বরণ ক'রে নেবে, সকল রকম দুঃখ দারিদ্র্য অসুবিধাকে সহ্য করবে কিন্তু তবু দু-পা এগিয়ে যদি এর কোন প্রতিকার হয় তাতে রাজী হবে না। তবে এদের একটা গুণ দেখেচি, কখনো অভিযোগ করে না এরা, দেশের বিরুদ্ধেও না, দৈবের বিরুদ্ধেও না।

বাইরে থেকে এদের দেখে যাঁরা বলবেন এরা মরে গিয়েচে, এরা জড় পদার্থমাত্র, ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে কিন্তু তাঁরা মত বদ্‌লাতে বাধ্য হবেন। এরা মরেনি, বোধ হয় মরবেও না কোন কালে। এদের জীবনীশক্তি এত অফুরন্ত যে, অহরহ মরণের সঙ্গে যুঝে এবং পদে পদে হেরে গিয়েও দমে যায় না এরা, বা ভয় পায় না, প্রতিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। সহজভাবেই সব মেনে নেয়, সব অবস্থা।

খারাপ বিলের পাটপচানো জল খেয়ে কলেরায় গ্রাম উৎসন্ন হয়ে থাকে, তবু এরা টিউবওয়েলের জন্যে একখানা দরখাস্ত কখনও দেবে না বা তদ্বির করবে না। কে অত ছুটোছুটি করে, কে-ই বা কষ্ট করে? শুধু একখানা দরখাস্ত করা মাত্র, অনেক সময় দরকার বুঝলে জেলা বোর্ড থেকে বিনা খরচায় টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়—কিন্তু ততটুকু হাঙ্গামা করতেও এরা রাজী নয়।

বাসায় একদিন বিকেলে চা খাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করলুম, আমার ছোট মেয়েটি সেই কলাই করা পেয়ালাটা ক'রে চা খাচ্ছে।

যদিও ওসব মানি নে, তবুও আমার কি-জানি-কি মনের ভাব হ'ল—চা খাওয়া-টাওয়া শেষ হয়ে গেলে পেয়ালাটা চুপি চুপি বাইরে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাঁচিলের ওধারের জঙ্গলের মধ্যে।

কাকার বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ছোট মেয়েটির বয়স দশ বছর, খুব বুদ্ধিমতী। শহরের মেয়ে-স্কুলে লেখাপড়া শেখাব বলে ওকে বাসায় এনে রেখেছিলুম, স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিলুম।

মাস পাঁচ-ছয় কাট্‌ল। বৈশাখ মাস।

এই সময়েই আমার টিউবওয়েলের কাজের ধুম। আট দশ দিন একাদিক্রমে বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরি কিন্তু তখনই আবার অন্য একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এতে পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতের সেবা পাই নে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাই নে, শুধু টো টো ক'রে দূরদূরান্তর চাষাগাঁ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—শুধুই এস্টিমেট কষা, মিস্ত্রী খাটানো। মানুষ চায় দু-দণ্ড আরামে থাক্‌তে, আপনার লোকেদের কাছে বসে তুচ্ছ বিষয়ে গল্প করতে, নিজের সাজানো ঘরটিতে খানিকক্ষণ ক'রে কাটাতে, হয়তো একটু বসে ভাবতে, হয়তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ছেলেমানুষী করতে—শুষ্ক টাকা রোজগারে এসব অভাব তো পূর্ণ হয় না।

হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাসায় ফিরলাম, কাকার ছোট মেয়েটির খুব অসুখ।

আমি পৌঁছলাম দুপুরে, একটু পরে রোগীর ঘরে ঢুকে আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার পিসিমা সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে রোগীকে সাবু না বার্লি খাওয়াচ্ছেন।

আমি আমার মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও পেয়ালাটা কোথা থেকে এল রে? খুকী বললে—ওটা কুকুরে না কিসে বনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল বাবা, মনুদি দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে তো অনেকদিনের কথা, পাঁচিলের বাইরে ওই যে বন, ওইখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস করলুম—মনু নিয়ে এসেছিল? জানিস্ ঠিক তুই?

খুকী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি খুব জানি। তুমি না হয় মাকে জিজ্ঞেস করো; আমাদের সেই যে ছোকরা চাকরটাকে কুকুরে কাম্‌ড়েছিল না, ঐ দিন সকালে মনুদি পেয়ালাটা কুড়িয়ে আনে। ওই পেয়ালাতে তাকে কিসের শেকড়ের পাঁচন খাওয়ানো হ'ল আমার মনে নেই।

আমি চমকে উঠলুম, বললুম—কাকে রে? রামলগনকে?

—হ্যাঁ বাবা, সেই যে তারপর এখান থেকে চলে গেল দেশে, সেই ছেলেটা।

আমার সারা গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—রামলগন কুকুরে কামড়ানোর পর দেশে চলে গিয়েছিল—কিন্তু সেখানে যে সে মারা গিয়েছে, এ খবর আমি কাউকে বলি নি। বিশেষ ক'রে গৃহিণী তাকে খুব ভালবাসতেন বলেই সংবাদটা আর বাসায় জানাই নি। আমাদের টিউবওয়েলের মিস্ত্রী শিউশরণের শালীর ছেলে সে—সে-ই খবরটা মাসখানেক আগে আমায় দেয়।

মনুর অসুখ তখনও পর্যন্ত খুব খারাপ ছিল না, ডাক্তারেরা বল্‌ছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কিন্তু মনে হ'ল ও বাঁচবে না।

ও পেয়ালাটার ইতিহাস এ বাসায় আর কেউ জানে না, অসুখের সময় যে ওতে করে কিছু খেয়েছে সে আর ফেরে নি। জান্‌ত কেবল কাকার বড় মেয়ে, সে আছে শ্বশুরবাড়ি।

পেয়ালাটা একটু পরেই আবার চুপি চুপি ফেলে দিলুম—হাত দিয়ে তোলবার সময় তার স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—পেয়ালাটা যেন জীবন্ত, মনে হল যেন একটা ক্রূর, জীবন্ত বিষধর সাপের বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েচি, যার স্পর্শে মৃত্যু ...যার নিঃশ্বাসে মৃত্যু...

পরদিন দুপুর থেকে মনুর অসুখ বাঁকা পথ ধরল, ন' দিনের দিন মারা গেল।

আমি জানতুম ও মারা যাবে।

মনুর মৃত্যুর পরে পেয়ালাটা আবার কুড়িয়ে এনে ব্যাগের মধ্যে পুরে কাজে বেরুবার

সময় নিয়ে গেলুম। সাত-আট ক্রোশ দূরে একটা নির্জন বিলের ধারে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

শোকের প্রথম ঝাপ্‌টা কেটে গিয়ে মাস দুই পরে বাসা একটু ঠাণ্ডা হয়েচে তখন। কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে একদিন এমনি পেয়ালাটার কথা বলি। তিনি আমার গল্প শুনে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। আমি বললুম—বোধ হয় অত খেয়াল ক'রে তুমি কখনো দ্যাখো নি, তাই ধরতে পার নি—আমি কিন্তু বরাবর—

আমার স্ত্রী বিবর্ণমুখে বললেন—বলব একটা কথা? আমার আজ মনে পড়ল—একটু চুপ করে থেকে বললেন—

—খোকা যখন মারা যায় আর বছর আষাঢ় মাসে, সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে তাকে ডাবের জল খাওয়াতুম। আমি নিজের হাতে কত বার খাইয়েচি। তুমি তো তখন বাইরে বাইরে ঘুরতে, তুমি জানো না।

আমার কোন উত্তর খানিকক্ষণ না পেয়ে বললেন, জান্‌তে তুমি এ কথাটা?

—না, জানতুম না অবিশ্যি। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আর একটা কথা মনে তোলা-পাড়া করছিলুম—পেয়ালাটা আমাদের ছেড়েচে তো? ওটাকে কেন তখন ভেঙে চুরমার করে নষ্ট ক'রে দিই নি? আবার কোনো উপায়ে এসে এ বাড়িতে ঢুকবে না তো?

ভৌতিক পালঙ্ক

অনেকদিন পর সতীশের সঙ্গে দেখা। বেচারা হন্তদন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে বিকালবেলা বেণ্টিক স্ট্রীটের বাঁ দিকের ফুটপাথ দিয়ে উত্তরমুখে চলেছিল। সমস্ত আপিসের সবেমাত্র ছুটি হয়েছে। শীতকাল। আধ-অন্ধকার আধ-আলোয় পথ ছেয়ে ছিল। ক্লান্ত দেহে ছ্যাকড়া-গাড়ির মত ধীরে ধীরে পথ ভেদ করে চলেছিলাম। সহসা সতীশের জামাটা চেপে ধরে চীৎকার করে উঠলাম—আরে, সতীশ যে!

সতীশ সবিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে বলে উঠল—খগেন! বাই গড্! আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বললাম—তার প্রমাণ, আমাকে ধাক্কা দিয়েই তুমি চলে গেছলে আর একটু হলে! ভাগ্যিস্ ডাকলাম!

—সরি। আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত।

—তা তো বুঝতেই পারছি। তা কোথায় চলেছ শুনি?

—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। বেশীদূর নয়। যাবার পথে সব বলব।

—আশ্চর্য!

—'না' বললে শুনব না। জোর করে নিয়ে যাব।

ছেলেবেলা থেকেই সতীশকে চিনি। কথা অনুযায়ী সে কাজ করে। আজ শরীরে কিছু বল থাকায়, প্রায়ক্ষেত্রে সে বলপ্রয়োগ করে স্বার্থসিদ্ধি করতে ভোলে না। অগত্যা তার সঙ্গে যেতে হোল।

তার গন্তব্যস্থান খুব নিকটেই ছিল এবং সে তার উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপেই ব্যক্ত করল। সেদিন সকালে খবরের কাগজে বেচা-কেনার কলমে একটি বিজ্ঞাপন ছিলঃ

"একটি অতি আধুনিক এবং রহস্যজনক চীনদেশীয়
খাট অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রয় করা হইবে।
জগতে ইহা অদ্বিতীয়। সুযোগ হারাইলে
অনুশোচনা করিতে হইবে।
২।৩.....স্ট্রীট।"

সতীশ তার পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটি বার করে বললে—পড়।

—বুঝলাম। তা 'রহস্যজনক' শব্দটার মানে কি?

—ঐটেই তো আমায় ভাবিয়ে তুলেচে! কোনো হদিস করে উঠতে পারছি না।

সতীশ চলছিল রাস্তার নাম দেখতে দেখতে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল—পেয়েছি। এই গলি।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সেই গলির পানে তাকিয়ে আমার সারা শরীরে—কেন জানি না—একপ্রকার শিহরণ জাগল। চীনাপল্লীর চীনা-আবহাওয়ায় রহস্যজনক খাট! সতীশের হাতটা ধরে বললাম—খাটে কাজ নেই সতীশ, চল ফিরে যাই। আমার বাঙালী-খাট বেঁচে থাকুক।

সতীশ প্রবলবেগে এক ঝাঁকানি দিয়ে উঠল—ভীতু কোথাকার! এতটা এগিয়ে এসে কখনও ফেরা যাবে না।

গলির মোড়ে ডান পাশে একটা নিমগাছ ভূতের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকের ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে যত সব অখাদ্য-কুখাদ্যের উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে। অন্নপ্রাশনের ভাত যেন ঠিকরে বার হয়ে আসতে চাইল অসহ্য যন্ত্রণায়! নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কোনগতিকে পথ চলতে লাগলাম।

একটা দমকা বাতাস বিভ্রান্ত হয়ে আচমকা দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে এসে আমাদের শরীরে যেন আছাড় খেয়ে পড়লো। মাথার উপরদিকে কয়েকটা বাদুড় ডানার শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। দুটো অভিভাবকহীন কুকুর এই অনধিকার-প্রবেশকারীদের পানে চেয়ে বিশ্রী সুরে অভিযোগ করতে লাগল।

পথে আর জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। পাশে একটি চীনা-ডাক্তারের বহু পুরাতন সাইন-বোর্ড। তার উপরকার নরকঙ্কালের ছবিটি জীর্ণপ্রায়। কোথা থেকে একটি পিয়ানোর অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছিল।

শীঘ্রই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট গৃহে এসে পৌঁছোলাম। অমন বাড়ি আমি আর জীবনে দেখিনি। ইট বার-করা পঙ্গুপ্রায় বহু প্রাচীনকালের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে এই বাড়ির ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল।

ভাঙা ফটক দিয়ে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। এত লোক এখানে কোথা থেকে এল? যে নির্জন নিস্তব্ধ গলি আমরা পিছু ফেলে আসলাম, সেখানে তো কারুর ছায়া পর্যন্ত খুঁজে পাইনি! ভৌতিক কান্ড নাকি? সকলের মুখেই কৌতূহলের ছাপ বর্তমান। নানা জাতির লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। এতগুলি লোক, কিন্তু কারুর মুখে একটি কথা নেই। ছুঁচ পড়লে পর্যন্ত তার শব্দ শোনা যায়।

ঘন্টাখানেক পর একটি বৃদ্ধ মোটা চীনা আমাদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেল। তার মাথার একটি চুলও কাঁচা ছিল না। তার সামনের ওপরের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, আর বাঁ হাতের উল্কিতে একটি ভোজালির ছবি। সে আমাদের ইশারা করে

অনেকগুলি ঘর পার করে সেই খাটের ঘরে নিয়ে গেল। বাড়িটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত—চারিদিকে গোলকধাঁধা।

হ্যাঁ, খাট বটে! অমন খাট আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। খাট আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঠিক ঐ রকম আশ্চর্য চীনা-খাট সেই প্রথম এবং শেষ দেখলাম। তার অপূর্ব ভাস্কর্য, অপূর্ব কারুকার্য! একপাশে ভগবান বুদ্ধের ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি। আয়তনে খাটটি বিশেষ বড় নয়। দুটি মানুষ বেশ আরামে শুতে পারে। আবার আশ্চর্য, সেই খাট বাড়িয়ে দশজনের জায়গা করা যায়! দেখে চমকে গেলাম। সকলের সঙ্গে দরকষাকষি হতে লাগল। ঐ সামান্য একটা কাঠের খাটের প্রতি সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়েছিল। কেনবার জন্যে সকলের কি সে ব্যাকুলতা! দাম হু-হু করে বাড়তে লাগল। শেষে সতীশের ভাগ্যেই ঐ খাটটি জুটল—পনরো-শ টাকায়।

সেই খাট নিয়ে বাড়ি ফিরতে সতীশের প্রায় দশটা বাজল। যে দেখল, সেই বলল—চমৎকার!

সেখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করে আমি বাড়ি গেলাম। সতীশ বলল—আবার এস, নেমন্তন্ন রইল।

—তথাস্তু। বলে চলে এলাম।

আমি যাবার আগেই পরের দিন সকালে সতীশ এসে হাজির। উস্কখুস্ক চুল, মুখ শুকনো। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল—দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় হয়তো সারারাত্রি ঘুম হয়নি!

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—আরে, ব্যাপার কি?

—বিপদ, বিষম বিপদ! সতীশের গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না।

—কিসের বিপদ?

—সেই খাট!

—একটা যে কিছু হবে, তা আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। কেউ কখনও খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসে? হাজার হোক, ওটা একটা রহস্যজনক খাট।

পূর্বরাত্রের ঘটনা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। সারারাত্রি সে ঘুমোতে পারেনি। ঐ খাটের ওপর সে শুয়ে ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তার মনে হোল, কে যেন খাটটা নাড়াচ্ছে! উঠে সুইচ টিপে আলো জেবলে দেখল, না, খাট ঠিকই আছে। আবার শুয়ে পড়ল—আর খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল। কিসের একটা ভীষণ শব্দে সারা ঘরখানা যেন গমগম করছে! দেওয়ালের সঙ্গে যেন খাটখানার ভীষণ ঠোকাঠুকি হচ্ছে!

ধড়মড় করে উঠে ও আলো জবালল। না। সব কিছু নিঃশব্দ নিথর—কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। সে আবার শুয়ে পড়ল। এবার আর সে আলো নেবাল না। ভোররাত্রে কার দুর্বোধ্য আর্তকণ্ঠের বিলাপধ্বনিতে তার চেতনা ফিরে এল। কে যেন খাটের পাশে বসে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছিল।

আমি বললাম—বলেছিলাম তো তোমায় প্রথমেই, ও খাট কিনে কাজ নেই। যেমন তোমার রোখ্। এইবার বোঝো।

সতীশ বলল—দেখ খগেন, তোমায় হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না। ঐ হতভাগ্য খাটখানার ওপর এমন মায়া লেগে গেছে যে কি বলব! আমি ওকে ছাড়তে পারব না কোন মতেই।

—তবে মর ঐ নিয়ে!

—আমি তোমার সাহায্য চাই।

—আমার সাহায্য!

—হ্যাঁ, আজ তুমি আমাদের ওখানে রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে। সারারাত না ঘুমিয়ে ঐ খাট পাহারা দেব। দেখি, ওর গলদ কোথায়!

—আর আমার আপিস?

—পাগল, কাল যে রবিবার!

অগত্যা বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

সতীশ আমার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে ছিল। সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল—সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্!

—তারপর! আর কোন গণ্ডগোল হয়নি তো?

—না, দিনের বেলা গণ্ডগোল হবার তো কোন কারণ নেই!

সতীশের মা বললেন—দেখ দেখি বাবা খগেন, এত বলছি—যা, বিক্রি করে দে, তা আমার কথা যদি ও শুনেচে!

সতীশ বলল—বলছ কি মা, ভয় পেয়ে পনরো-শ টাকার খাটটা বিক্রি করব?

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রি জাগবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে খাটের ঘরে গিয়ে বসলাম। আমার হাতে দীনেন রায়ের ডিটেকটিভ উপন্যাস, আর সতীশের হাতে "হেলথ্ অ্যাণ্ড হাইজিন"।

রাত্রি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। ঠিক হোল, আগে সতীশ ঘুমুবে আর আমি জাগব। তারপর সতীশ জাগবে, আর আমি ঘুমুব।

বইখানা খুলে আমি বসে রইলাম। পড়তে পারলাম না একটি অক্ষরও, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম; চারদিকে কান খাড়া করে বসে রইলাম ভয়ে ভয়ে। এতটুকু শব্দে থেকে থেকে চমকে উঠছিলাম। ঐ বুঝি অপদেবতা আমার গলাটি দিলে টিপে!

কাদের বাড়িতে ঘড়িতে সুর করে দুটো বেজে গেল। হঠাৎ মনে হোল, কে যেন বাইরের বারান্দায় চলে বেড়াচ্ছে! তার পদশব্দ বেশ স্পষ্ট হয় উঠল। আমার সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল, লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

হঠাৎ সশব্দে খোলা জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে বোধ হোল, আমি যেন শূন্যে উঠে গেছি. আমার জ্ঞান যেন লোপ পেয়ে গেছে। আমি মৃত না জীবিত, তাও ঘোর সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। আমি সভয়ে ডেকে উঠলাম—সতীশ! সতীশ!

সতীশ ধড়মড় করে উঠে বসল—ব্যাপার কি খগেন? ব্যাপার কি?

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। সতীশ আমার দু' কাঁধে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে ডাকল—খগেন! খগেন!

আমি আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললাম—ওঃ! যা ভয় পেয়েছিলাম!

—তা তো বুঝতেই পারছি। যাক্ আর তোমায় জাগতে হবে না। তুমি ঘুমোও, আমি জেগে বসে আছি।

—না আমারও ঘুমিয়ে কাজ নেই। আর তা ছাড়া ঘুমও আমার হবে না আদৌ।

—ভীতু কোথাকার!

তারপর ভীতু আমি ও সতীশ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে রইলাম। আমরা দু'জনেই নিঃশব্দে জেগে রইলাম। কেউই একটিও কথা কইলাম না। আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের টুকরো আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। অসংখ্য তারকা মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল। বোধ হোল, তারা যেন আমাদের বিপদে ফিক-ফিক হাসছে! আমরা চুপটি করে বসে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিকের আলো দপ্ করে নিবে গেল। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—কে?

বোধ হোল কে যেন মেন সুইচ্ বন্ধ করে দিয়েছে!

হঠাৎ এক উৎকট হাসিতে সারা ঘর ভরে উঠল। অমন হাসি আমি জীবনে কাউকে হাসতে দেখিনি। হাসি যেন আর শেষ হতে চায় না। সে কি বিকট শব্দ!—হা-হা-হা-হি-হি-হি-হো-হো-হো-হে-হে-হে...

বোধ হোল, কে যেন ঠিক দরজার কাছে হেসে খুন হচ্ছে! আমি শিউরে উঠলাম।

সতীশ চট করে টর্চটা দরজার ওপর ফেলল। তাতে হিতে বিপরীত হোল। বোধ হোল কে যেন দরজার ঠিক বিপরীত দিকে জানলাটার ধারে বসে আর্তকণ্ঠে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছে! তার কান্নার কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। কেবল একটা করুণ সুর সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে মরতে লাগল। তার পর সেই খাটের উপর গিয়ে সেই বিলাপ-ধ্বনি আর নড়ল না। তার কান্নায় যেন খাটটা ভিজে গেল। সেই অবোধ্য ভাষার সকরুণ বিলাপ-ধ্বনি চিত্তে এমন এক অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করল, যার ফলে আমাদের সমস্ত

শক্তি যেন ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। মনে হোল, কে যেন ক্লোরোফর্‌ম্‌ দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে দিচ্ছে! আমরা যেন ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়ছি!

সতীশের সাহসটা ছিল কিছু বেশী, তাই সে খাটের উপর টর্চ ফেলে গর্জে উঠল—কে, কে ওখানে?

কিছুই দেখা গেল না, কেউ সাড়া দিল না। সহসা সেই খাটখানা ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল। মনে হোল অগণিত নরকঙ্কাল যেন তার চারিদিকে নৃত্য করচে। তাদের হাড়ের খটখট শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হোল। আমার বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল কিসের যেন বেদনায়। বোধ হোল, হয়তো বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!

একটা একটু করে আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হোল, আমি যেন অনেক দূরে এক চীনাবাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি। একটি ছোট ঘরে তখন সেই গভীর রাত্রে টিম-টিম করে একটি দীপ জ্বলছিল। ঘরের মেঝের উপর একটি লোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েচে।

একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর তার সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা দেখে আমার বড় দয়া হোল। রোগে ভুগে ভুগে বেচারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তার পাশে বসেছিল—তার স্ত্রী হবে বলেই বোধ হোল—চেহারা কিন্তু তার স্বামীর চারগুণ। একটা মস্ত টুলের ওপর বসে সে ঢুলছিল।

তার পাশেই আমাদেরই এই খাটটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাত সমুদ্র তের নদী পার করে এটাকে কে এখানে নিয়ে এল?

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি বিকট এক হাঁ করে হাই তুলল, তারপর দুটো সশব্দ তুড়ি দিয়ে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল। দেখলাম—তার স্বামী ইতিমধ্যে উঠে সেই খাটের দিকে এগিয়ে গেছে চুপি চুপি। চকিতে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত তার স্ত্রী তাকে জোর করে খাট থেকে নামিয়ে বিছানায় ফেলে দিলে। সে ভীষণ ভাবে গর্জন করতে লাগল, আর তার স্বামী ব্যাকুলভাবে অনুনয় করতে লাগল, ঐ খাটের পানে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে! বোধ হোল, সে চায় খাটে উঠতে; কিন্তু তার স্ত্রী তাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না।

উত্তেজনায় কাশকে কাশতে তার মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত বেরিয়ে গেল। আমি শিউরে উঠলাম। তারপর লোকটার মাথাটা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, আর সে উঠল না। তার স্ত্রী তার পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম—ভোরের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। দেখলাম—সতীশের মা আমার চোখে মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন।

তিনি আমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে বললেন—খগেন, বাবা খগেন!

আমি বললাম—আমি কোথায়?

—নীচের ঘরে।

—সতীশ কোথায়?

—সতীশের এখনও জ্ঞান হয়নি।

তারপর শুনলাম—রাত্রি চারটে নাগাদ আমরা নাকি দুজনে সদর দরজায় এসে মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকি। সতীশের মা বাইরে এসে এই অবস্থা দেখে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দেন। পাকা তিন ঘণ্টা তদারক করার পর আমাদের জ্ঞান হয়। ডাক্তার এসে বলে গেছিল—ভয়ের কোন কারণ নেই। একটা 'সাড্‌ন্‌ শক্‌' (sudden shock) আর কি! জ্ঞান হলে একটু ব্রোমাইড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীশের জ্ঞান হতে সেও সেই আমারই মত অবিকল উদ্ভট স্বরে কথা বলে গেল। আমি বিস্ময়ে সকলের পানে তাকিয়ে রইলাম।

সতীশের মা বললেন—আগে ঐ সর্বনেশে খাট বিদায় কর বাবা!

খাট-বিক্রির একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল। পরের দিন বিকালে অসংখ্য লোকে বাড়ি ছেয়ে গেল। খাটটা বিক্রি হোল—শেষ পর্যন্ত দু'হাজার টাকায়। এক ইহুদী সেটা

কিনে নিয়ে গেল।

যাক, মাঝ থেকে কিছু লাভ হোল। বিক্রি না হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ওটা বিলিয়ে দিতে হোত।

এখন মাঝে মাঝে সেই রহস্যজনক খাটের কথা ভাবি। এক-একবার মনে হয় সেটা এখন কার কাছে আছে, খোঁজ করি। সেই অতৃপ্ত আত্মা—যাকে তার দুর্দান্ত স্ত্রী কোন ক্রমেই ব্যাধির ভয়ে খাটের ওপর জীবিত অবস্থায় শুতে দেয়নি; সে কি আজ তৃপ্ত হয়েছে? না, এখনও সে ঐ খাটের পিছনে প্রতি রাত্রে ঘুরে ঘুরে মরে—কাউকে ওর ওপর শুতে দেবে না বলে?

গঙ্গাধরের বিপদ

অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মসলা-পোস্তায় গংগাধর কুণ্ডুর ছোটখাট একখানা মসলার দোকান।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাংগার কাছে। অনেক দিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকানঘরের ভাড়া দু-মাসের বাকি, মহাজন-

দের দেনা ঘাড়ে—দুপুর বেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যের সময় গোমস্তা ভাড়া নিতে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কি বলা যায় তাকে!

এক পুরোনো পরিচিত মহাজনের কথা মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েছে, শোধও করেচে, কিন্তু সুদের হার বড় বেশী বলে ইদানীং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায় নি।

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হ'ল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যের মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে বললে, "এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা..."

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছ-পালার বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েচে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হ'ল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এলো। ওই গাছগুলোর তলায়—সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁড়কা চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দীতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বললে, "বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?"

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বললে, "কি মাল?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, "এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিস ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন..."

ঝুপ্‌সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে, "জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেব!"

গঙ্গাধর চমকে উঠলো।

সে কখনো ও ব্যবসা করে নি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কি সর্বনেশে জিনিস! ভালো লোকের পাল্লায় সে পড়েচে! না—সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। অনুনয়ের সুরে বললে, "বাবু, আপনি নিন। আপনার ভালো হবে। সিকি কড়িতে দেবো...আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিসের ভয় তো আছে? কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে; সেই হয়েচে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিসের ভয় হ'ল যে কেন বাবু তা বুঝিনে। আগে যারা এ ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমার দিকে চেয়েও দেখচে না।...আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন পরে দামদস্তুর হবে..."

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজলো। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষ রাতারাতি বড় লোক হয়েচে বটে। বিনা সাহসে বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে এই ভয়ে বেশী জোরে ডাকতেও পারবে না। চাপা গলায় বাঙালী-হিন্দীতে ডাকলে, "কোথায় গিয়া, ও খাঁসাহেব?"

এদিকে ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁসাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে, "জলদি চলো, অনেক দূর যানে হোগা।"

কি একটা যেন ঢাকবার জন্যে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। "আমার সঙ্গে এসো, মাল দেখাবো।"

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেক দূর গেল। যে সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকো কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বললে, "আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?..."

"কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনো হয়নি যে এই সন্ধ্যেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।"

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ডেরা কোথায়, খাঁসাহেব?"

লোকটা চকিতে পেছনে ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিসে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভালো হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে,—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?"

লোকটার চোখের চাউনি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলো; খুব ভালো দেখা যায় না, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠলো। না, তার সঙ্গে টাকা রয়েচে—এ-অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যেবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বাড়বে বই কমবে না। ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূর গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হ'লেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়; সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হল গুদামঘরটা পুরোনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে জায়গায় জায়গায়, চালের খোলা উড়ে গিয়েচে মাঝে মাঝে, সামনের দোরটা উই-ধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।...

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হ'ল। কেন সে এখানে এলো এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে করে? সে আসতো না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙলা দেশ থেকে নতুন আসে নি। ওই লোকটির কথার সুরে কি জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়। একথা এখন তার মনে হ'ল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁসাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুলো। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁসাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকলো। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে আসতে বললে তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করচে, বুক ঢিপঢিপ করচে। এই অন্ধকার

গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানতো যে তার কাছে টাকা আছে, অনুসন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের লোক কিনা! গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে, দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামঘরের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা। গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকার। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপ্‌সা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁতসেতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি।

এদিকে আবার খাঁসাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ...মিনিট দুই হবে, কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা...আবার সেই ভয়টা হ'ল। কেমন এক ধরনের ভয়...যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কি রকম ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট-দুই পরেই খাঁসাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।...

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁসাহেব। বললে, "তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বললাম, তা দেখতে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে কেন?"

বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় শাবল?"...

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁসাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়চে...সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে...খাঁসাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে। কিন্তু পেরে উঠচে না...সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল...এক...দুই...তিন...চার...

আর কোথায় খাঁসাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়ে গিয়েচে...একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপ্‌টা এলো কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চীৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেতে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায় নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারতো না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজে খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা বললে। খোদাদাদ খাঁ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সাহজী, ও হ'ল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সংগে যড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখতো কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে খুন হয়। কে বা কেন খুন করলে জানা যায় নি, কেউ ধরা পড়ে নি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয় আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রী করার জন্যে ; ওর পুরোনো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা।...তা বাবু সে গুদাম ঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?"

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেতো না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়লো, পুরোনো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝে নি সে মারা গিয়েচে?...কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

মৌচাক, কার্তিক ১৩৪১

মসলাভূত

বড়বাজারের মসলাপোস্তায় দুপুরের বাজার সবে আরম্ভ হয়েচে। হাজারি বিশ্বাস প্রকান্ড ভুঁড়িটি নিয়ে দিব্যি আরামে তার মসলার দোকানে বসে আছে। বাজার একটু মন্দা। অনেক দোকানেই বেচা-কেনা একেবারে নেই বললেই চলে, তবে বিদেশী খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি। হাজারির দোকানে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। ডান হাতে তাল-পাতার পাখার বাতাস টানতে টানতে হাজারি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ কার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠলো।

—"বলি ও বিশ্বেস,—বিশ্বেস্ মশাই!"—বার দুই হাঁক ছেড়ে যতীন ভদ্র তার ডান হাতের লাঠিটি একটা কোণে রেখে দিয়ে সম্মুখের খালি টুলটার উপর ধপাস্ করে বসলো।

যতীন হাজারি বিশ্বাসের সমবয়স্ক—অনেক দিনের বন্ধু। ভাগালক্ষ্মী এতকাল তার ওপর অপ্রসন্ন ছিল। হালে সে হাজারির পরামর্শে মসলার বাজারে দালালী আরম্ভ করেচে। দু'পয়সা পাচ্ছেও সে। যতীনের মোটা গলার কড়া আওয়াজ পেয়ে হাজারি খুব

আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে বসলো। হাজারি বিলক্ষণ জানতো যে, যতীন যখনই আসে কোন একটা দাঁও বিষয়ে পাকাপাকি খবর না নিয়ে সে আসে না। তাই সে যতীনকে খুবই খাতির করে।

যতীন বললে, "দেখ, শুধু দোকানদার হয়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে হাঁ করে বসে থাকলে তাতে আর টাকা আসে না—ঘুমুই আসে। পাঁচটা খবরাখবর রাখতে হয়, বুঝলে?"

হাজারি বললে, "এসো এসো, যতীন। ভালো আছ? অনেক দিন দেখি নি। কিছু খবর আছে নাকি?"

"সেই খবর দিতেই তো আসা। এ-বাজারে শুধু গণেশের পায়ে মাথা ঠুকলেই টাকা করা যায় না—। অনেক হদিস জানতে হয়—অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে টাকা, বুঝলে? ...এখন কি দেবে বলো। জানই তো যতীন ভদ্র বকে একটু বেশি, কিন্তু খবর যা আনে তা একদম পাকা। যাক্, এখন আসল কথা তোমায় যা বলি মন দিয়ে শোন..."

যতীন অতঃপর হাজারিকে কাছে বসিয়ে চুপি চুপি তার কথাটা বলে গেল। যতীনের কথায় টাকার গন্ধ পেয়ে হাজারি কান খাড়া করে এমনি একাগ্রভাবে শুনে যেতে লাগলো যে, সত্যনারায়ণের পাঁচালীও লোকে অতটা মন দিয়ে শোনে না।

ব্যাপারটি এই।—

গ্রেহাম্ ট্রেডিং কোম্পানীর একটা মস্ত মাল-জাহাজ এস্. এস্. রেঙ্গুন, ডাচ্ ইস্ট্ ইণ্ডিজের কোন এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কলকাতায় আসছিলো। যতরকম মাল বোঝাই ছিল, তার মধ্যে মসলার বস্তাই সব চেয়ে বেশি। লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা প্রভৃতি কত রকমের মসলা। প্রতি বস্তাটি ওজনে আড়াই মণের কম নয়। এরকম শত শত বস্তার গাদায় জাহাজখানা আগাগোড়া ঠাসা। সেই মালজাহাজখানি গঙ্গার ভেতরে ঢুকতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে শেষ রাত্রির ভাঁটার মুখে গঙ্গার চোরাবালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজ যখন সবে ডায়মণ্ড হারবার পেরিয়ে গঙ্গায় এসেচে—তখন এই ব্যাপার। সারেঙ্গ শত চেষ্টা করেও কিছুতে সামাল দিতে পারলে না। জাহাজডুবির সঙ্গে কতক লোকও জলে ডুবে মারা যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকী মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলো প্রায়ই ডোবে নি—বিশেষ ক্ষতিও হয় নি। দূর থেকে ঐ মসলাবস্তার গাদাগুলো ভেসে যেতে দেখে পোর্ট-কমিশনারের লোকেরা সে সব তুলে পারে টেনে নেয়। কাল সাড়ে আটটার সময় নিলাম ডেকে সেই বস্তাবন্দী মসলাগুলো বিক্রী করা হবে।

ধড়িবাজ হাজারি বিশ্বাস যতীনের কথাবার্তা শুনে চট করে সব বুঝে নিলে। কত লোককে চরিয়ে কত পাকা ধানে মই দিয়ে তবে সে আজ এত টাকার মালিক। কথাবার্তা তখনই সব ঠিক হয়ে গেল। যাবার সময় যতীন আবার হাজারিকে বেশ করে মনে করিয়ে দিয়ে বললে, "দেখো ভায়া! টাকা যদি পিটতে চাও তবে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া নয়। জলের দামে মাল বিকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় নিলেম। আমি সাতটার সময়েই এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।"

পরদিন হাজারি যতীনকে নিয়ে যথাসময়ে খিদিরপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিলামের জায়গায় পৌঁছুতে আর বেশী দেরি নেই, দূর থেকে কলরব শোনা যাচ্ছে। যতীন আগে আগে চলেছে—হাজারি পেছনে পেছনে ছুটছে। এতবড় সস্তার কিস্তিটা ফস্কে না যায়। হাজারি যতীনকে বরাবর নিলামের কাছে বস্তাগুলো গুনতি করতে পাঠিয়ে দিয়েই নিজে সটান এক দৌড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে মস্ত বড় এক সেলাম করলে। সাহেবের সঙ্গে দুমিনিট ফিসফাস করে কি কথাবার্তা বলে হাজারি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে

এসে নিলামের ডাক বন্ধ করে দিলে।

যতীন বললে, "কি খবর ভায়া—সুবিধে করতে পেরেছ তো?"

হাজারি খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললে, "পরে বলবো। কাজ হাসিল। এখন কত বস্তা গুনলে বলো দেখি?"

"একশো বস্তা গোনা হয়ে গেছে।"

বাস্তবিক, উঁচু উঁচু গাদা-করা মসলার বস্তাগুলোর দিকে চেয়ে হাজারির চোখ জুড়িয়ে গেল। সে যে দিকেই তাকায়, দেখে যে অগুনতি বস্তা সারবন্দী থামের মতো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঃ, এমন দাঁও জীবনে কারো ভাগ্যে একবার বই দুবার আসে না! এখন মসলাপোস্তায় কোনরকমে তার গুদোমে এগুলো চালান দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

"আর দেরি নয়"—হাজারি যতীনকে তাড়া দিয়ে ডেকে বললে, "ওহে ভায়া, শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন? এখন লরী ডেকে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে পোস্তায় চালান দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ এগিয়ে যাই।"

একেবারে সব মাল লরীতে ধরলো না। দ্বিতীয় ক্ষেপ বস্তা চাপিয়ে যতীন যখন পোস্তায় ফিরে গেল তখনও বিকেল আছে। সে এসে দেখে, সবই অব্যবস্থা। রাশীকৃত বস্তার গাদা হাজারির দোকানের সামনে ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিনটি লোক এতগুলো মাল তোলবার জন্যে লাগানো হয়েচে। চতুর্দিকে লোকের মহা ভিড়—হৈ হৈ ব্যাপার! এদিকে পুলিস তাড়া দিচ্ছে—"জল্‌দি মাল হঠাও!" হাজারি কেবল চেঁচাচ্ছে। সে যেন কিছুই গোছগাছ করে উঠতে পারছে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে যতীন নিজেই কোমর বেঁধে লেগে গেল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পূর্বেই সব মাল তোলা হয়ে গেল। বস্তাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা গেল ঘরে আর কুলোয় না। তখন বস্তার ওপর বস্তা চাপিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ পর্যন্ত মাল ঠাসা হ'ল। গম্বুজের মতো এক একটা ফুলো ফুলো বস্তা, আর বস্তাগুলো উঁচুও কি কম! এই ভাবে বস্তা ভরাট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যতীন আর হাজারি যখন বাড়ী ফিরলো তখন রাত দশটা। সে রাত্রে গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মতো হাজারির চাকর বাইরে শুয়ে রইলো।

শেষ রাত্রে মসলার গুদামে কি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আশে-পাশের দোকান-দারদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা চোরের আশংকা করে চাকরটাকে ডেকে তুললে। চাকরটা শশব্যস্ত হয়ে আলো জেবলে বেশ পরখ করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকলো কি করে? গুদোমের দরজার তালা বন্ধ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদে আবার দুম্ দুম্ শব্দ! সকলে কান খাড়া করে রইলো। বেশ মনে হ'ল এবারকার শব্দটা যেন হাজারির মসলার গুদোমের ভেতর থেকেই আসচে। অথচ ঘরের দোর-জানলা বন্ধ, বাইরে থেকে মোটা তালা দেওয়া। কি আশ্চর্য, চোর ভেতরে যাবেই বা কি করে? আর চোরটোর যদি না এলো তবে শব্দও বা করে কে? মাঝে মাঝে মনে হ'তে লাগলো, ঘরের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার জন্যে কারা ভেতর দরজায় ধাক্কা মারচে। শেষ রাতের বাকী সময়টা এইভাবেই শব্দ শুনে কেটে গেল। আরও আশ্চর্য, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুদোমঘর থেকে শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সে রাত্রি এই পর্যন্ত।

পরদিন সকালে মসলাপট্টির দোকানদারদের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে হাজারির দোকানে বিষম কাণ্ড, ভীষণ চুরি! আসলে সত্যি যা নয় তার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মিথ্যে রটাতে লাগলো। ক্রমে কথাটা হাজারির কানে উঠলো। হাজারি বিশ্বাস খবর

পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে তালা খুলে গুদোমে ঢুকে দেখে বস্তাগুলো ঠিকই আছে, একটি মালও বেহাত হয়নি। কি ব্যাপার? তখন সে ভাবলে কিছু নয়; তার মসলা-বস্তাগুলো দেখে যাদের চোখ টাটিয়ে ছিল—এ নিশ্চয়ই সেই বদমাশদের মিথ্যে কারসাজি; তারাই মজা দেখবার জন্যে চুরির গুজব রটিয়েছে, কিন্তু হরে ঢাকরটাও যে বললে, ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল? এই শব্দ-রহস্যটা হাজারি কিছুতেই কিনারা করতে পারলে না। চোর যদি এসেই থাকবে, তবে কিছু নিলেও না, উপরন্তু শব্দ করে জানান দিয়ে চলে গেল—এ কি ব্যাপার? তবে কি তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই রাত্রিবেলা দুর্বৃত্তেরা এই সব আয়োজন করচে? সাতপাঁচ ভেবে হাজারি সেদিনকার মতো কথাটা চেপে গেল, ভাবলে আজ রাতে আর বাড়ী না গিয়ে নিজেই দোকান পাহারা দেবে!

করলেও তাই। রাত্রে ঘুমোবার আগে হাজারি বেশ করে চাকরটাকে নিয়ে গুদোমের উপর থেকে আরম্ভ করে নিচে পর্যন্ত পাতি পাতি প্রত্যেকটি বস্তার গাদা দেখতে লাগলো। তারপর ভেতর থেকে জানলাটা খুলে রেখে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল। তবে, আজ একটা নয়—হবসের চার লিভারের দুটো মস্ত ভারী তালা। হাজারি চাকরটাকে নিয়ে ঘরের সামনে শুয়ে নানা কথাবার্তার পর যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন রাত দুপুর।

শেষ রাত্রের দিকে কি একটা শব্দ হ'তেই হাজারির ঘুম ভেঙ্গে গেল। হরে চাকরটা আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। গত রাত্রের ব্যাপারও তার বেশ মনে আছে। তাই সে নিজে আর কোন কথা না বলে চুপ করেই পড়ে ছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ও আবার কিসের শব্দ? ধপাস্—ধুপ্—দুম্—দুম্—দাম্! ঘরের ভেতর বস্তায় বস্তায় কি বিষম ধস্তাধস্তি! যেন দৈত্য দানবে লড়াই বেধেছে। হরে আর হাজারি তখন ধড়মড় করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে আলো জ্বালিয়ে দেখতে লাগলো তালা ঠিক আছে কিনা। তালা দুটো ঠিকই আছে। হাজারি জানলার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখতে পেলে—দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢুঁ মারছে। ভয়ে হাজারির চোখ দুটো ডাগর হয়ে উঠলো। বস্তা জীবন্ত হয়ে উঠলো নাকি? না, সে চোখে ভুল দেখছে? না, অনিদ্রায় আর দুর্ভাবনায় তার মাথার ঠিক নেই? হাজারি ভয়ে ভয়ে খানিকটা চোখ বুজে রইলো।

হাজারি চোখ যখন খুললে তখন ভোরের আলো জানলার গরাদ দিয়ে ঘরে স্পষ্ট দেখা গিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-টব্দও থেমে গিয়েচে। হরে অমনি বলে উঠলো, "বাবু সেদিনও দেখেছি—ভোর হতেই শব্দ থেমে যায়।" হাজারি আর দ্বিরুক্তি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখলে কোথাও কিছু নেই। মালপত্র ঠিকই আছে, তবে কালকের থেকে আজ তফাত এই যে বস্তাগুলো যেটি যে জায়গায় দাঁড় করানো ছিল, সেটি ঠিক সেখানে নেই। প্রত্যেক বস্তাটিই যেন সরে সরে তফাত হয়ে গেছে। একটা বস্তা আর একটার ঘাড়ে কাত হয়ে পড়েচে। বিশেষ করে পেছন দিকের কতগুলো বস্তা হাণ্ডুল-বাণ্ডুল অবস্থায় পড়ে রয়েছে!—হাজারি মহা ভাবনায় পড়ে গেল! চোরই যদি হয় তবে শব্দের সৃষ্টিপাত কেন? আর চোর ঢোকেই বা কোথা থেকে? আর বেরিয়েই বা যায় কেমন করে? অসম্ভব! তবে কি জাহাজডুবির লোকগুলো ডুবে মরে ভূত হয়ে মসলাবস্তায় যে যার ঢুকে বসে আছে?

লাটের মাল কিনে অবধি দু'রাত্রি তো এই ভাবে কাটলো। আজ তৃতীয় রাত্রি। হাজারির রোখ অসম্ভব বেড়ে গেছে! আজ সে মরীয়া হয়ে দুজন লোক নিয়ে সারা রাত্রি গুদামের বাইরে জেগে বসে রইলো। হাতের কাছে যাকেই সে পাবে, কিছুতেই আজ আর তাকে আস্ত রাখবে না। তার এই অভীষ্টসিদ্ধি করার জন্যে দিনমানেই সে খুব ঘুমিয়ে নিয়েচে—পাছে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। টং টং টং টং—পাশের ঘরের ঘড়িতে

চারটে বেজে গেল। হাজারির চোখের পাতা পড়ে না। সে ঠায় জেগে আছে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু হঠাৎ এ কি কান্ড! শত শত লোক একত্র খুব দম দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে ছেড়ে দিলে যেমন একটা ঝড়ের মতো সাঁই সাঁই করে শব্দ হয়—অবিকল তেমনি একটা শব্দ শোনা গেল।

হাজারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলো! দরজার বোরগোড়ায় যে দুটো লোক শুয়ে ছিল, হাজারি চট্ করে তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে, "তোরা শীগ্‌গির ঘরের পেছনটায় দৌড়ে গিয়ে দেখ দেখি—চোরেরা সেখানে কোন সিঁধ কেটেচে নাকি।" তারপর হাজারি গুদোমের তালা খুলে ফেলল।

কিসের সিঁধ, আর কোথায় বা চোর! বস্তাগুলো যে সব হাই ছেড়ে সারবন্দী দাঁড়াতে লাগলো! হরে চাকরটা ভয়ের সুরে বললে, "বাবু এদিকে চেয়ে দেখুন!"—হাজারি দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে বললে, "এ্যাঁ, বলে কি? আমার মসলার বস্তারা নাচ্‌চে?" চাকর দুজন এ দৃশ্য দেখেই ভয়ে দে চম্পট।

তখন এক অদ্ভুত কান্ড!

বস্তাগুলো সব একটির পর একটি ঠক্ ঠক্ করে ঠিক্‌রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সৈন্ধব লবণের প্রকান্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা তো সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই সটান্ গঙ্গার দিকে দে ছুট্। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধিনিক্ ধিনিক্ করে খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সামনে লাফিয়ে মার্চ করে স্ট্র্যান্ড রোড ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগলো। নিলামে কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে চলেচে, পেছনে পেছনে চলচে সারবন্দী গুদামের অন্য অন্য বস্তা। এই ভাবে হাজারির মসলার গুদোম উজাড় হয়ে গেল।

শেষ রাত্রি। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ। গঙ্গার জলে মেটে জ্যোৎস্না। হাজারি বিশ্বাস একা দাঁড়িয়ে। একি সত্যি, না স্বপ্ন! নির্বাক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখচে। লোক ডেকে চেঁচিয়ে উঠবে সে শক্তিও তার লুপ্ত। সারবন্দী মসলার বস্তা-গুলো গঙ্গার ধারে পৌঁছলো এবং গঙ্গার উঁচু বাঁধানো পোস্তার ওপর থেকে ধপাস ধপাস করে নিচে গঙ্গার জলে দিল ডুব। এইভাবে পরপর সমস্ত বস্তা একে একে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। এবারেও আগে ডুবলো নিলামের বস্তাগুলো—তারপর গুদোমের অন্য অন্য বস্তা।

কাশী কবিরাজের গল্প

আমার উঠোন দিয়ে রোজ কাশী কবিরাজ একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে যেন কোথায় যায়। জিজ্ঞেস করলেই বলে—এই যাচ্ছি সনকপুর রুগী দেখতে, ভায়া—

একদিন বললে—নৈহাটি যাচ্ছি রুগী দেখতে, সেখান থেকে শ্যামনগর যাবো।

—সেখানেও আপনার রুগী আছে বুঝি?

—সব জায়গায়। কলকাতায় মাসে দুবার যাতি হয়।

আমার হাসি পায়। কাশী কবিরাজ আমাদের গ্রামে বছরখানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসে বাসা করেছে। জঙ্গলের মধ্যে একখানা দোচালা ঘর। আমগাছের ডালপালায় ঢাকা। দিনে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। ছেঁড়া কাপড় পরে কাশী কবিরাজের বৌকে ধান সেদ্ধ করতে দেখেছি। এত যদি পসার, তবে এমন অবস্থা কেন?

একদিন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আকাশে ঘন মেঘ এসে জমলো। বৃষ্টি আসে-আসে। কাশী কবিরাজ দেখি আমার উঠোন দিয়ে হনহন করে চলেচে ব্যাগ হাতে।

ডেকে বললাম—ও কবিরাজ মশাই—শুনুন শুনুন, কোথায় চললেন? বৃষ্টি আসচে—

কাশী কবিরাজ আমার চণ্ডীমণ্ডপে এসে উঠে বসলো।

বললে—একটু রাণাঘাট যাতাম এই ট্রেনে, রুগী ছেলো।

—কে রোগী?

—একজন মাদ্রাজী। পা ফুলে বিরাট হয়েচে, সব ডাক্তারে জবাব দিয়েচে। তিনবার এক্স্-রা কত্তি গিয়েলো। আমি বলিচি, ওসব এক্স্-রা টেক্স্-রা আমার সঙ্গে লাগবা না। আমার মুখিই এক্স্-রা—

আমার হাসি পেলো। নিজের যদি অত গুণ, তবে দোচালায় বাস কর কেন জঙ্গলের মধ্যে? লম্বা লম্বা কথা বললেই কি লোকে তোমাকে বড় কবিরাজ ভাববে?

—একটু চা খান, দাদা—

—তা খাওয়াও ভাই, বৃষ্টি এলো। একটু বসেই যাই—

—আপনার পসার তাহোলে বেশ বেড়েচে?

—বাড়বে কি ভায়া, বরাবর আছে। আমার তান্ত্রিক কবিরাজি। যা কেউ সারাতি পারবে না, তা আমি সারাবো।

—বলেন কি!

—এই জন্যেই তো আমার পসার। শুধু ঝাড়ানো—কাড়ানো—

—ঝাড়িয়ে রোগ সারিয়েছেন?

—আরে এ পাগল বলে কি? বড় বড় রোগ ঝাড়িয়ে সারিয়েচি।

—বটে!

তোমরাই ইংরাজি লেখাপড়া জান কিনা,—সমস্ত অবিশ্বাস করো জানি। ভূত মান?

এই রে! ঝাড়ফুঁক থেকে এবার ভূতপ্রেতে এসে পৌঁছুলো! কাশীনাথ কবিরাজ অনেক কিছু জানে দেখছি। বললাম—যদি বলি মানিনে?

—তা তো বলবাই, ইংরাজি পড়াতে তোমাদের ইহকালও গিয়েচে, পরকালও গিয়েচে! রাগ করো না ভায়া। যা সত্যি, তাই বললাম। চা এসেচে? তাহলি একটা গল্প শোনো বলি। আমার নিজের চোখে দেখা।

খুব বৃষ্টি এসে পড়লো, চারিদিক অন্ধকার করে এলো। কাশীনাথ কবিরাজ তার গল্প আরম্ভ করলো।

কাশীনাথ কবিরাজ তান্ত্রিক-মতে চিকিৎসা করে বলে অনেক দূর দূর থেকে তার ডাক আসে। আজ বছর দশেক আগে হরিহরপুরের জমিদার শিবচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ি থেকে তাঁর ছেলের চিকিৎসার জন্যে কাশীনাথের ডাক এলো।

আমি বললাম—আগে কখনো সেখানে গিয়েছিলেন আপনি?

—না।

—নাম জানতেন?

—খুব। আমাদের ওদেশে হরিহরপুরের জমিদারের নাম খুব প্রসিদ্ধ।

—যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বেলা কত?

—সন্দের কিছু আগে। তারপর শোনো—

কাশীনাথ ওদের বাড়ি দেখে অবাক্ হয়ে গেলো। সেকেলে নামকরা জমিদার, মস্ত বড় দেউড়ি, দু-তিন মহল বাড়ি। দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘর, তার পাশে একটা বড় বারান্দা। ওদিকে ঠাকুর-দালান, বাইরে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ। তবে এ সবই ভগ্নপ্রায়—পূর্বের সমৃদ্ধি ঘোষণা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, বড় বড় বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে বাড়ির গায়ে। মন্দিরের চূড়োর ফাটলে বন্য শালিখের গর্ত, কাঠবিড়ালির বাসা। সামনে বড় একটা আধ-মজা দীঘি পানায় ভর্তি।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই মস্ত বড় পুরনো ভাঙা বাড়ি দেখে কাশীনাথের মনে কেমন এক অপূর্ব ভাব হোলো।

আমি বললাম—কি ভাব?

—সে তোমারে বলতে পারিনে, ভায়া। ভয়ও না, আনন্দও না। কেমন যেন মনে হোল, এ বড্ড অপয়া বাড়ি—এ ভিটেতে পা না দেওয়াই ভালো আমার পক্ষি। তোমার হবে না, কিন্তু আমার হয় বাপু, এমনি।

—অন্য কোথাও হয়েচে?

—আরও দু-একবার হয়েচে এমনি। কিন্তু সে কথা এখন আনবার দরকার নেই। তারপর বলি শোনো না—

তারপর কাশী কবিরাজ সেখানে গিয়ে রোগী দেখল। দশ বৎসর বয়সের একটি ছেলের টাইফয়েড জ্বর, খুব সংকটাপন্ন অবস্থা। কাশী কবিরাজ গিয়ে তান্ত্রিক প্রণালীতে ঝাড়ফুঁক করে শেকড়-বাকড়ের ওষুধ বেটে খাওয়ালো। রোগী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠলো।

অনেক রাত্রে কাশী খাওয়া-দাওয়া সেরে দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখলো, সেখানে তার জন্যে শয্যা প্রস্তুত। উৎকৃষ্ট শয্যা, দামী নেটের মশারি, কাঁসার গেলাসে জল ঢাকা আছে, ডিবের বাটিতে পান,—সব ব্যবস্থা অতি পরিপাটি।

আমি বললাম—বড়লোকের বাড়ির বন্দোবস্ত—

—হাজার হোক, বনেদী ঘর তো? যতই অবস্থা খারাপ হোক, পুরনো চাল-চলন যাবে কোথায়?

—তারপর?

কাশী কবিরাজ বেশিক্ষণ শোয়নি, এমন সময় সে দেখল ঘোমটাপরা একটি বৌ হনহন করে মাঠের দিক থেকে এসে দেউড়ির মধ্যে দিয়ে জমিদার-বাড়ি ঢুকচে। কাশী খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো। এত রাত্রে বাইরের মাঠ থেকে এসে বাড়ি ঢুকলো কে? ভদ্রলোকের ঘরের সুন্দরী বধূ বলেই মনে হলো, যতটুকু দেখেছে তা থেকেই।

যাক্। সে এসেছে কবিরাজি করতে, অতশত খোঁজে তার কি দরকার? যে যা ভালো বোঝে করুক।

আমি বললাম—রাত তখন কত?

—রাত একটার কম নয়, বরং বেশি।

—যেদিক থেকে এলো, সেদিকে কোনো লোকালয় নেই?

—না মশাই। ফাঁকা মাঠ অনেকখানি পর্যন্ত, তারপর কোদালে নদী। কোদালে নদীতে গরমকালে জল থাকে না। হেঁটে পার হওয়া যায়—তার ওপারে বলরামপুর গ্রাম।

—আপনি কি করে বুঝলেন ভদ্রবংশের মেয়ে?

—হাত-পায়ের যতটুকু খোলা, ধবধবে ফরসা। আধ-জ্যোৎস্না রাত, আমি দিব্যি টের পাচ্ছি—মুখখানা অবিশ্যি ঘোমটায় ঢাকা ছেলো।

—বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় অন্য কোনো লোক সেখানে ছিলো?

—না।

—আপনাকে টের পেয়েছিলো?

—কোনদিকে না চেয়ে হনহন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কাশী কবিরাজ নির্বিরোধী ভাল লোক, সে জলের গেলাস তুলে খানিকটা জল খেয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম আর আসে না, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। লোকে বাড়িতে চিকিৎসক ডাকে ঘুমুবার জন্যে নয়। কাশী কবিরাজ অভিজ্ঞ লোক, দায়িত্ব বোধ তার যথেষ্ট, সে অবস্থায় তার চোখে ঘুম আসে কি করে?

মিনিট খানেক পরে কাশী হঠাৎ দেখলে, সেই বৌটি তার পাশের দেউড়ি দিয়ে আবার বার হয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে তড়াক করে উঠে পড়লো। বৌটি ক্রমে দূর মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় তার সাদা কাপড় দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বললাম—মাঠের দিকে গেলো একা?

—একদম একা। আর অত রাত!

—আপনি কি ভাবলেন?

—আমি আর কি ভাববো মশাই, একেবারে অবাক্। এত রাত্রে একটি সুন্দরী মেয়ে এমন ভাবে যে নির্জন মাঠের দিকে চলে যেতে পারে, তা কখনো দেখিওনি।

কাশী কবিরাজ সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে একজন ছুটে এসে বললে—শীগ্‌গীর আসুন, কবিরাজ মশাই, রোগী কেমন করচে।

কাশী গিয়ে দেখে, রোগীর অবস্থা সত্যই খারাপ। কিন্তু হঠাৎ এত খারাপ হওয়ার কথা তো নয়। যাহোক্ তখনকার মত ব্যবস্থা করতে হোলো। অনেকক্ষণ খাটুনির পরে রোগী খানিকটা সামলে উঠলো। তখন আবার এসে শুয়ে পড়লো কাশীনাথ বাইরের দেউড়ির ঘরে।

পরের দিনমান রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকেই চললো। জমিদারবাবুর মন বেশ ভালো—প্রথম দিন বড়ই যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। এমন কি কবিরাজের সঙ্গে বসে দুপুরের পর খানিকক্ষণ পাশাও খেললেন। কবিরাজকে তাঁদের বড় দীঘিতে একদিন মাছ ধরতে যাবার আমন্ত্রণও জানালেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও দুপুরে বেশ ভালোই হোল—মাছের মুড়ো, দই, দুধ, সন্দেশ ইত্যাদি। কবিরাজ খুব খুশী...। জমিদারবাবু বেশ প্রফুল্ল।

সেই রাত্রে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। এমন ধরনের ব্যাপার কাশী কবিরাজ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

রোগীর অবস্থা ভালো থাকার দরুন সেদিন আর বেশি খাটুনি ছিলো না ওর। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শয্যা আশ্রয় করলো কিন্তু ঘুম আসতে দেরি হোতে লাগলো। কোথাকার ঘড়িতে একটা বেজে গেলো ঢং করে। ঠিক সেই সময়ে দেখলো কাশী কবিরাজ, সেই ঘোমটাপরা বৌটি দেউড়ি দিয়ে ঢুকে অন্দরের দিকে চলেছে।

বলতে কি কাশী কবিরাজের বড় বিস্ময়বোধ হোল! কি সাহস মেয়েটার! এত রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে আসতে ভয়ও কি করে না?

মিনিট পনেরো কেটে গেলো, কি বিশ মিনিট। তারপর কাশী কবিরাজকে আশ্চর্য স্তম্ভিত করে দিয়ে সেই বৌটি ওর ঘরে এসে ঢুকলো। আমি বললাম—আপনার ঘরে?

—হ্যাঁ, একেবারে আমার সামনে।

—ঘরে আলো ছিলো?

—বাড়িতে রোগী থাকার দরুন আমার ঘরে সারারাতই একটা হারিকেন জ্বলে।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মুখের ঘোমটা অনেকখানি তুলে কবিরাজের দিকে চাইলো। বেশ সুন্দরী মহিলা। দেখলে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়, এমনি চেহারা। কাশী কবিরাজকে বলল—তুমি এখানে থেকো না, চলে যাও এখান থেকে।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত কাশী কবিরাজ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বলল—আপনি কে মা?

—আমি যেই হই, তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

—মা, আমি চিকিৎসক। রুগী দেখতে এসেচি। আমার কাজ না সেরে আমি কি করে যাবো?

—তুমি এ রুগী বাঁচাতে পারবে না। কাল সকালে তুমি চলে যাও এখান থেকে—

—কি করে আপনি জানলেন রুগী বাঁচবে না!

—আমি ওর মা। ওর সৎমা ওকে খুব কষ্ট দিচ্চে, সে কষ্ট আমি দেখতে পারচিনে—আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেচি—নিয়ে যাবোই। তুমি তাকে কিছুতেই রাখতে পারবে না—

কাশীনাথ কবিরাজ তখনো ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেনি! সে আমতা-আমতা করে বললে—আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি মারা যাওয়ার পরে আজ চার বছর হোল ওর বাবা আবার বিয়ে করেচে। আমার সেই সতীন ওকে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারি না—খোকা আপন মনে কাঁদে। আমি শুনতে পাই—ওকে আমি নিয়ে যাবোই। তুমি কেন অপযশ কুড়োবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—

কাশীনাথের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছে যেন। কি ব্যাপারটা সামনে ঘটচে, তার যেন কোনো ধারণাই নেই, তবুও সে হাতজোড় করে বললে—মা, একটা কথা। আমি জমিদারবাবু—আপনার স্বামীকে সব বলি। তিনি তাঁর ছেলেটিকে বড় ভালবাসেন। ছেলেটিকে আপনি নিয়ে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে, সেটা তো আপনার বিবেচনা করা উচিত।

বৌটি বললেন—তাঁর এ পক্ষের ছেলেমেয়ে হবে। তাঁদের নিয়ে থাকবেন তিনি—

—ও কথা বলবেন না, মা। আপনি তাঁর কথা চিন্তা না করলে কে চিন্তা করবে? সব দিকে বুঝুন। তাঁর কথা ভাবতে হবে আপনাকেই। আমি আজই সব বলচি তাঁকে খুলে। যদি তিনি তাঁর এ পক্ষের স্ত্রীকে ব'লে ছেলেটির ওপর অত্যাচার নিবারণ করতে পারেন, তবে আপনি আমাকে কথা দিন, ছেলেটিকে আপনি নিয়ে যাবেন না? আমি সে চেষ্টা করি, মা?

—করো।

বলেই মূর্তি অদৃশ্য হোল না কিন্তু। ঘর থেকে বার হয়ে দেউড়ি দিয়ে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গিয়ে নিশীথ-রাত্রের শুভ্র জ্যোৎস্নার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

—আমি জিগ্যেস করলাম—বলেন কি!

—হ্যাঁ মশাই।

—আচ্ছা, এ মূর্তির কোনো অংশ অস্পষ্ট নয়?

—দিব্যি মানুষের মত। কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই কোথাও। কথাবার্তা বললাম, আমার কোনো ভয় হোল না। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলচি, তেমনি মনে হোল।

মূর্তিটি অদৃশ্য হওয়ার খানিক পরেই বাড়ির মধ্যে থেকে কাশীকে ডাকতে এলো। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। অথচ সমস্ত দিন এমন ভালো ছিলো। তখনকার মত সুব্যবস্থা করে ভোরের দিকে কাশী কবিরাজ জমিদারবাবুকে বললে—আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, বাইরে চলুন।

আমি বললাম—বাইরে এসে সব কথা বললেন নাকি?

—হ্যাঁ, গোড়া থেকে। বললাম, এই আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

—বিশ্বাস করলেন?

—কেঁদে ফেললেন। বললেন,—আমি জানি। আমি এই অসুখের সময় একদিন ওকে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি!

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত।

জমিদার বললেন, আমি জানি, ওর সৎমা ওর ওপর খুব সদয় নয়—তবে এতটা আমি জানতাম না। আমি কথা দিচ্চি, খোকা সেরে উঠলে ওর মামার বাড়িতে রেখে লেখা-পড়া শেখবো। এ সংস্রবে আর আনবো না। আমার এ স্ত্রীকেও আমি শাসন করচি। আপনি তাঁকে জানাবেন। রাত ভোর হয়ে গেলো।

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠতে লাগলো। এগারো দিনের পরে কাশী কবিরাজ পথ্য দিলে তার রোগীকে।

বললাম—ওর মাকে আর দেখেননি? আসেননি আপনার কাছে?

—না।

বিরজা হোম ও তার বাধা

ভৈরব চক্রবর্তীর মুখে এই গল্পটি শোনা। অনেকদিন আগেকার কথা। রোয়ালে-বাদরপুর (খুলনা) হাইস্কুলে আমি তখন শিক্ষক। নতুন কলেজ থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছি।

ভৈরব চক্রবর্তী ঐ গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সকলেই শ্রদ্ধা করতো, মানতো। এক প্রহর ধরে জপ আহ্নিক করতেন, শূদ্রযারক ব্রাহ্মণের জলস্পর্শ করতেন না, মাসে একবার বিরজা হোম করতেন, টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো দুপুরের পরে। স্বপাক ছাড়া কারো বাড়ী কখনো খেতেন না। শিষ্য করতে নারাজ ছিলেন, বলতেন শিষ্যদের কাছে পয়সা নিয়ে খাওয়া খাঁটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। আর একটা কথা, ভৈরব চক্রবর্তী ভাল সংস্কৃত জানতেন কিন্তু কোন স্কুলের পণ্ডিতি করেন নি। টোল করাও পছন্দ করতেন না। ওতে নাকি গবর্ণমেণ্টের দেও বৃত্তির দিকে মন চলে যায়। টোল ইন্সপেক্টরদের খোশামোদ করতে হয়। তবে দুটি ছাত্রকে নিএের বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন।

বর্ষা সেবার নামে নামে করেও নামছিল না, দিনে-রাতে গুমটের দরুণ আমরা কেউ ঘুমুতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন একটু মেঘ দেখা দিল পুব-উত্তর কোণে। বেলা তিনটে। স্কুল খুলেছে গ্রীষ্মের ছুটির পরে। কিন্তু এত দুর্দান্ত গরম যে পুনরায় সকালে স্কুল করার জন্য ছেলেরা তদবির করছে, মাস্টারদেরও উস্কানি তাতে ছিল বারো আনা। হেড্‌মাস্টার অফিস ঘরে বসে আছেন। গোপীবাবু ইতিহাসের মাস্টার, গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন—সার, মেঘ করেছে—

মুরুলী মুখুজ্যে (এই নামেই তিনি ও অঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে কুখ্যাত) গম্ভীর স্বরে বললেন,—কিসের মেঘ?

—আজ্ঞে, মেঘ কাকে বলে।

—কি হয়েছে তাতে?

—আজ্ঞে, বৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি দিলে ভাল হোত। ছেলেরা অনেক দূর যাবে, ছাতি আনেনি অনেকে।

—বৃষ্টি হবে না ও মেঘে।

খাস ইন্দ্রদেবের আপিসের হেড কেরানীও এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে একথা বলতে দ্বিধা করতো বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানে মুরলী মুখুজ্যের পাণ্ডিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই, আবহাওয়া-তত্ত্বটি তাঁর নখদর্পণে। গোপীবাবু দমে গিয়ে বললেন—বৃষ্টি হবে না?

—না।

—কেন সার? বেশ মেঘ করে এসেছে তো?

—মেঘের আপনি কি বোঝেন? ওকে বলে তাতমেঘা, ও মেঘে বৃষ্টি হবে না।

আমিও পাশের শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ থেকে জানালা দিয়ে মেঘটা দেখেছিলাম এবং আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনাতে পুলকিত হয়েও উঠেছিলাম। মুরলী মুখুজ্যের নির্ঘাত রায় শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললাম—বৃষ্টি হবে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে।

মুরলী মুখুজ্যে বললেন—তাতমেঘা। মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না।

—কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়?

—এখন বৃষ্টি হবে আলট্রা স্ট্রেটোস্ মেঘে। যাকে বলে শিট্ক্লাউড।

—ও!

—তাছাড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। মনসুনের আগে হাওয়া ঘুরে যাবে পুবে।

—ও!

আর কোনো কথা বলতে আমাদের সাহস হোল না। কিন্তু ইন্দ্রদেব সেদিন বড়ই অপদস্থ করলেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ মুরলী মুখুজ্যেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মেঘের চেহারা ঘন কালো হয়ে উঠলো, মেঘের চাদর ঢাকা পড়লো আরও ঘন আর একখানা মেঘের চাদরে। তারপর স্কুলের ছুটি হওয়ার সামান্য কিছু আগেই ঝম্ ঝম্ মুষলধারে বর্ষা নামলো। পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে খাল বিল নালা ডোবা ভাসিয়ে রামবৃষ্টি হওয়ার পরে বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আকাশ ধরে গেল। ছেলেরা তখনো পর্যন্ত স্কুলেই আটকে ছিল। কোথায় আর যাবে। সবাই আমরা আটকে পড়েছিলাম।

গোপীবাবু জয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে মুরলী মুখুজ্যেকে গিয়ে বললেন—দেখলেন সার, তখন বললাম বৃষ্টি আসবে, তখন ছুটিটা দিলে আর এমন হোত না।

মুরলীবাবু বললেন—অমন হয়ে থাকে। ইতিহাস পড়ান, Higher Mathematics পড়ালে বুঝতেন। জগতে space and time নিয়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এডওয়ার্ড গার্নেটের প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন এ বছরের Mathematical Gazette-এ, বুঝলেন?

—সেটা কি?

—এ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পড়েছেন তো? অংকশাস্ত্রে এ্যালিস্ থ্রু লুকিং-গ্লাসের পরীক্ষা আর কি। পড়ে দেখুন। গোপীবাবু চলে এলেন। অংকশাস্ত্রের কথা উঠলেই স্বভাবতঃ তিনি সংকুচিত হয়ে পড়েন।

বৃষ্টি থেমেছে, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি আর গোপীবাবু চলেছি। দুজনেই আমরা মনে মনে বড় খুশি। হেড মাস্টারকে আজ বড় জব্দ করা গিয়েছে। রোজ রোজ কেবল চালাকি!

এমন সময় ভৈরব চক্রবর্তীর বাড়ীর দাওয়ায় দেখি ভৈরব চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। খুব খুশি মন। আমাকে দেখে ডেকে বললেন—কেমন ননীবাবু, বিষ্টি হোল তো?

—এই যে চক্কোত্তি মশায়, নমস্কার! তা হোল।

—হবি না? আজ তিন দিন থেকে হোম করছি বিষ্টির জন্যে। ওর বাবাকে হতে হবে।

অবিশ্যি বৃষ্টির পিতৃদেব কে, তা ভালো জানা ছিল না। বললাম—বলেন কি? হোম

করার ফল তাহলে ফলেছে বলতে হবে!

গোপীবাবু অর্ধস্ফুট স্বরে বলে বসলেন—লাগে তাক, না লাগে তুক।

ভৈরব চক্রবর্তী কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন—আসুন দুজনেই আমার বাড়ি মাস্টার বাবুরা। দেখুন দেখাই।

গোপীবাবু ও আমি দুজনে দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। মনটা বেশ ভালো। দুঃসহ গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়ে দিনটি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আজ পনেরো দিন দারুণ গুমটে রাত্রে ঘুমুইনি।

গোপীবাবু কেবল বলছিলেন—আজ খুব ঘুম হবে, কি বলেন?

—নিশ্চয়। তার আর ভুল?

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের নিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। সেখানে সত্যিই হোমের আগুনের কুণ্ড—বালি বিছিয়ে তৈরি, বেলকাঠ ও জগ্‌গিডুমুরের ডালের বাড়তি সমিধ (যজ্ঞের কাঠ) এক পাশে গোছানো। পূর্ণপাত্রে সিধে সাজানো, তামার টাটে নারায়ণশীলা! সিঁদুর বেলপাতা তামার বড় থালায়। হোম হয়ে গিয়েছে, উপকরণের অবশেষ এদিক ওদিক ছড়ানো।

ভৈরব চক্রবর্তী বললেন—দেখলেন মাস্টারবাবু? হোম করার ফল আছে কি না। দেখলেন?

গোপীবাবু বললেন—আপনি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চয়ই। নিজের চোখে দেখা। অপদেবতার কাণ্ড দেখেছি যে কত! পঞ্চমুণ্ডির আসনে জপ করার সময়!

—বলুন না দু'একটা ঘটনা?

—না, সে-সব বলবো না। থাক গে। কিন্তু আজ এক বছরও হয়নি একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখেছিলাম আমার এক যজমান-বাড়ি। সেইটাই বলি। একটু চা করতে বলি?

এমন সময় আবার কালো মেঘ করে বৃষ্টি শুরু হোল। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ঝড় উঠলো খুব ঠাণ্ডা হাওয়ার। ছড়্ ছড়্ করে পাকা জাম পড়তে লাগল চক্কত্তি মশায়ের বাড়ির সামনের গাছটা থেকে। নতুন জল ব্যাঙ ডাকতে লাগলো চারিদিকে।

চা এল। আমরা ছাতি নিয়ে বেরুইনি। এই বৃষ্টি মাথায় করে যাবার উপায় নেই। বেশ পমিয়ে গল্প শুনবার জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর মাটির দাওয়ায় মাদুরের ওপর বসে গেলাম।

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের চা দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু করলেন গল্প বলতেঃ

আর বছর ভাদ্র মাসের কথা। এখনো বছর পোরেনি। আমার এক যজমান-বাড়ি থেকে খবর পেলাম তার একটি মেয়ের বড় অসুখ। আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে বিরজা হোম করতে হবে মেয়েটির জন্যে। বিরজা হোমে পূর্ণ আহুতি দিলে শক্ত রুগী ভালো হয়ে যায়। আমি এমন সারিয়েছি।

আমাকে তারা নৌকো করে নিয়ে গেল গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে। অজ পাড়াগাঁ। ঘরকতক ব্রাহ্মণ ও বেশির ভাগ গোয়ালা ও বুনোদের বাস। যমুনার ধারেই গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটেই স্নান করতে আসে।

—গ্রামের নাম কি?

—সাতবেড়ে। তারপর শুনুন। গ্রামে গিয়ে পেঁছুলাম বিকেলে। খুব বন-জঙ্গল গ্রামের মধ্যে। একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেকেলে ছোট ইটের তৈরি। মন্দিরের মাথায় বড় অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে। প্রকাণ্ড বড় একটা শিবলিঙ্গ বসানো মন্দিরের মধ্যে, চামচিকের নাদিতে আকণ্ঠ ডোবা অবস্থায়। পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই।

এই সময়ে আমাদের জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর বড় মেয়ে শৈল চালভাজা ও ছোলাভাজা নিয়ে এলো তেলনুন মেখে। ভৈরব চক্রবর্তী বিপত্নীক, তার মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে সবে ক'দিন হোল, চলে গেলে চক্রবর্তী মশায় নিজেই রান্না করে খান।

আমরা সকলেই খাবার খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভৈরব চক্রবর্তীও সেই সঙ্গে।

এখনও দিব্যি দাঁতের জোর, ওই বয়সে এমন চাল-ছোলাভাজা যে খেতে পারে, তার বহু-দিনেও দাঁত নষ্ট হবে না।

তিনি খেতে খেতেই বলে চললেন—এই শিবমন্দিরটার কথা মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক আছে। তারপর আমরা গিয়ে সে বাড়ি উঠে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবার পর গৃহস্বামী একটি ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। অসুস্থ মেয়েটি সেই ঘরে শুয়ে আছে। বয়েস তেরো-চোদ্দ হবে, নিতান্ত রোগা নয়, বেশ মোটাসোটা ছিল বোঝা যায়—গলায় একরাশ মাদুলি। মেয়েটি চোখ বুজে একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একবার সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে আবার পাশ ফিরলে।

মেয়েটির গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর, তিনের কাছাকাছি হবে। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণ সামান্য লাল। নাড়ি দেখলাম, বেশ নাড়ি, শক্তই আছে। হঠাৎ কোনো ভয়ের কারণ আছে বলে মনে হোল না। তাছাড়া আমার ওপর মেয়ের চিকিৎসার ভার নেই, আমি এসেছি হোম করতে!

গৃহস্বামী বললেন—আপনি আশীর্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন মাথায় ওর।

পায়ের ধুলো মাথায় দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ গৃহস্বামী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল খাটের পাশে। আমি চমকে উঠলাম। হাত নড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল কি হয়েছে দেখতে। কিছুই সেখানে নেই, না একটা কলার খোসা না কিছু। লোকটি পড়লো কি করে? পায়ের ধুলো দেবার কথা চাপা পড়ে গেল। গৃহস্বামীর মাথায় ও মুখে ওর বড় শালা ঠাণ্ডা জল দিতে লাগলো। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে এক হৈ-চে ব্যাপার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি তান্ত্রিক হোম করি। কিছু কিছু দৈব ঘটনা বুঝি। লক্ষ্মণ, প্রতিলক্ষ্মণ, চিহ্ন আর ইঙ্গিত এই নিয়ে দৈব। গোড়াতেই এর লক্ষ্মণ খারাপ বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে কি হোমে বসবো না? সন্ধ্যার কিছু পরে শিব-মন্দিরের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছি। বড্ড গরম। বাড়ির মধ্যে হাওয়া নেই। রাস্তায় তবু একটু হাওয়া বইছে। হঠাৎ আমার কানে গেল, কে যেন বলছে—শুনুন, শুনুন। দুবার কানে গেল কথাটা। এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়লো শিবমন্দিরের মধ্যে ঠিক দোরের গোড়ায় একটি কে মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে!

বললাম—আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ। ও খুকীর জন্যে বিরজা হোম করবেন না। ও বাঁচবে না।

—কে আপনি?

—আমি যে-ই হই। যদি ভাল চান, হোম করবেন না।

আমি বিস্মিত হোলাম। নির্জন, অন্ধকার, ভাঙা মন্দির। সেখানে এখন মেয়েমানুষ আসবে কে? এমন আশ্চর্য কথাই বা বলে কেন? আমার খানিকটা রাগও হোল। আমার ইচ্ছার ওপর বাধা দেয় এমন লোক কে? মানুষ তো দূরের কথা, অপদেবতাকেও কখনো গ্রাহ্য করিনি। মায়ের আশীর্বাদে সবই সম্ভব হয়। ভৈরব চক্রবর্তীকে ভয় দেখানো সহজ নয়।

আমার এই অদ্ভুত দর্শনের কথা বাড়ি ফিরে কাউকে বললাম না। রাত্রে বসে হোমের জিনিসপত্রের ফর্দও করে দিলাম। তারপর রাত আটটা বাজল, গৃহস্বামী আমাকে রান্নাবান্না করতে বললেন। এইবার আমার গল্পের আসল অংশে আসবো। তার আগে ওদের বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বাড়িটা খুব পুরনো কোঠা বাড়ি, কোনো ছিরি-সৌষ্ঠব নেই, কিন্তু দোতলা। পল্লী-গ্রামে দোতলা বাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। যমুনা নদীর ধারে ঠিক নয় বাড়িটা, সামান্য দূরে। মধ্যে কেবলমাত্র একখানা বাড়ি। ঐ বাড়ির ছাদ আর এ বাড়ির ছাদের মধ্যে দশ-বারো ফুট চওড়া একফালি জমির ব্যবধান।

ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর। সেই ঘরে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। পাশে খোলা ছাদে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুগের ডাল, আতপ চাল, বড়ি, আলু আর ঘি। আমি একাই রাঁধছি, রান্নার সময় কাছে কেউ থাকে আমি পছন্দ

করিনে। রান্নার আগে একবার চা করে খেলাম। পরের তৈরি চা খেয়ে তৃপ্তি পাইনে।

রান্না করতে রাত হয়ে গেল। রাত সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটা জিরিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে ভাত বেড়ে নিলাম হাঁড়ি থেকে আঙট-কলার পাতে। তারপর খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোল ছাদে আমি একা নেই। এদিক ওদিক চাইলাম, কেউ কোথাও নেই, রাত বেশি হয়েছে, বাড়ির লোকেও নিচের তলায় খেয়েদেয়ে শুয়েছে, গ্রামই নিষুতি হয়ে গিয়েছে। কেবল যমুনা নদীতে জেলেদের আলোয় মাছ ধরার ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হচ্ছিল।

হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলাম।

আমার সামনে ছাদের ধারে ওটা কি গাছ? কালো মত, লম্বা তাল গাছের মত? এতক্ষণ ছাদে বসে রান্না-বাড়া করছি, কই অত বড় একটা গাছ নজরে পড়েনি তো এর আগে? ছিল নিশ্চয়ই, নয়তো এখন দেখছি কি করে। কি গাছ ওটা! সত্যি, যখন চা খেলাম, তখন দুটো বাড়ির মধ্যেকার ওই রাস্তাটা দিয়ে একখানা গরুরগাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে আমাকে এদিকে তাকাতে হয়েছিল। তখন, কই তো অত বড় একটা তাল গাছ—উঁহু, কই! নাঃ, দেখিনি।

কিন্তু তাল গাছটা এমনভাবে—ও কি রকম তাল গাছ? ওকি! ওকি!

আমি ততক্ষণ বিভীষিকা দেখে ভাত ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়েছি।

তাল গাছ না।

এখনো ভাবলে—এই দেখুন গায়ে কাঁটা দিয়েছে। যদিও আমার নাম ভৈরব চক্কত্তি, তান্ত্রিক। পিছনের ছাদের কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মত মূর্তি তার তত বড় বড় হাত পা—সেই মাপে। মাথাটা একটা ঢাকাই জালার মত, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত রাঙা, আগুন ঠিকরে পড়ছে! আমার দিকেই তাকিয়ে আছে অসুরটা, যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

বিরাট মূর্তি। তালগাছের মতই লম্বা। অনেক উঁচুতে তার মাথাটা। নিচু চোখে সেটা আমার দিকে চেয়ে আছে।

ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। দু'দুবার চোখ রগড়ালাম। দুবার চা খেয়ে কি এমন হোল? না। ওই তো সেই বিরাট, তাল শাল নারকোল গাছের মত তে-ঢ্যাঙা বেখাপ্পা অপদেবতার মূর্তি বিরাজ করছে সামনে জমাট অন্ধকারের মতো। এবার ভালো করে দেখে মনে হোল পিছনের ছাদে সেটা দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই—দুই বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে বলা যায়। কারণ ওই জীবের নাভিদেশ থেকে ওপর পর্যন্ত আমার সামনে। তার নিচেকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিরেখার নিচে।

এ বর্ণনা করতে যত সময় লাগলো, অতটা সময় লাগেনি আমার বারকয়েক দেখতে জীবটাকে। এক থেকে দশ গুনতে যত সময় লাগে, ব্যস্। আমি বলতে পারি অন্য যে কেউ ওই বিকট অপদেবতার মূর্তি অন্ধকারে নির্জনে ছাদে গভীর রাতে দেখলে আর গোলার ধানের ভাত খেতো না পরদিন।

আমি অপদেবতা দেখেছি, পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলে জপের শেষের দিকে প্রায়ই ভয় দেখাতো। কিন্তু সে এ ধরনের বিকট ও বিরাট ব্যাপার নয়। ভয় পেয়ে গেলাম। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। চক্ষে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই আর কি। পড়লেই হয়ে যেতো। দুর্বল মানুষ মরে ওদের হাতে। মন সবল হোল ওরাই পালায়।

নিজেকে তখুনি সামলে নিলাম। তারামন্ত্র জপ শুরু করলাম জোরে জোরে। সেই দিকে চেয়ে মন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মূর্তিটা আমার সামনে সবসুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল এক থেকে ত্রিশ গুনতে যতটা সময় নেয় ততটা। এর খুব বেশী হবে না কখনো। সেটা মিলিয়ে যেতে আর একবার চোখ রগড়ালাম, কিছু নেই। বিশ্বাস করুন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিচের তলা থেকে কান্নাকাটি উঠলো। রুগী মেয়েটি মারা গিয়েছে।

—তখুনি?

—তখুনি। এ ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা দিতে আমি রাজী নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনাদের কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।

আয়না

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেল সিঁদরানির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুনী বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখু নেই। দুঃখু এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘি চুরি আমি করিনি, কে করেচে আমি জানিও না, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজেরডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলেও খাবার দোকান এ পর্যন্ত এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে চোখে পড়ল না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালোবাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা-শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ, গরমও বেশ পড়েচে, স্নান করে সত্যি ভারি তৃপ্তি হোল। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুলগাছের ডালে ভিজে কাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হোল কিন্তু পেট সমানে জ্বলছে। এ সময় কোনো বনের ফল নেই? চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসচে দেখা গেল। আমাকে দেখে বললে—বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপাততঃ বড় খিদে পেয়েচে, খাবো কোথায়, আপনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বললে—রোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্চি!

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো। বললে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। এ বাড়ি আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ি দেখাশুনো করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায় না। মস্ত বড় বাগান আছে বাড়ির পেছনে। তাতে সব-রকম ফলের গাছ আছে—বারো ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বললাম—থাকতে পারি।

—কি কাজ করতে?

—রাঁধুনীর কাজ।

—যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিন এখানে রাঁধো, দুজনে খাই।

—খুব ভালো।

আমি রাজী হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারী খুশী হোল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বললে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরি মধ্যে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শুরু হোল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরানো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল! কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্চে। আমায় বললে—চা

করতে জানো? একটু চা-করো। চিঁড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বললে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘি আছে, আলু ভাতে ভাত,—ব্যস্!

—যে আজ্ঞে!

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিও। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্বদা আলো জেবলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে, অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলচি।

মস্ত বড় বাড়ি। ওপরে নীচে বোধ হয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় লম্বা রোয়াক, রোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও মুড়োয় গিয়ে আমায় উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছন দিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধুহাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এঁটো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো, একটি বৌ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনাসামনি হাত দশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচু হয়ে আধঘোমটা দিয়ে আমারই মতো ঝিঙে তুলচে! দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছনে ফিরে সাত-আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বৌটি তখনো ঝিঙে তুলচে।

নিবারণ চক্কত্তি বললে—ঝিঙে পেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল।

নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কোথায়?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষমানুষ?

—না, একটি বৌ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল। বললে—কোথায় বৌ? চলো দিকি দেখি।

আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছুই না।

নিবারণ বললে—কৈ বৌ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ও ঝোপটার কাছে।

—হুঁঃ, যতো সব। চলো, চলো। দিনদুপুরে বৌ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝি দুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে এত খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি-বুড়ো আবার সেই ঝিঙে চুরির কথা তুললে। বললে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে? কেন তা যাওনি?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হোল! বুড়োটা খিটখিটে ধরনের। বিনা আলোতে যখন সব দেখতে পাচ্চি, এমন কি ঝিঙে-চুরি-করা বৌকে পর্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেচি কি?

বুড়ো বললে—না, না, সন্ধ্যার পর সর্বদা আলো কাছে রাখবে।
—কেন?
—তাই বলচি। তোমার বয়স কত?
—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।
—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষট্টি। যা বলি কান পেতে শুনো।
—আজ্ঞে, নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারা যেন বাক্স-বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাচ্চে! ভারী জিনিস সরাচ্চে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিস-পত্র গোছাচ্চে! কিন্তু এত রাত্তিরে?
বাবাঃ! কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বললে—আমি?
—হ্যাঁ, অনেক রাতে।
—ও! হ্যাঁ—না—হুঁ—ঠিক।
—আমাকে বললেই হোত আমি গুছিয়ে দিতাম!
চক্কত্তি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙেভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোঁটলা বেঁধে সে রওনা হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মত থেকো ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম-কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হোল দেড় বিঘের ওপর। লোক-অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেচো—তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখা-শুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—
—কি?
চক্কত্তি-বুড়ো অকারণে সুর খাটো করে বললে—কত লোকে ভাঙচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ি দেখাশুনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইল তোমার জন্যে।
বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল। আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্যে রয়েচে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই! বাড়িতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েচে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাক সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কাঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ!
বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনবো বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরুলাম। বাপ রে, কি বন-জঙ্গল গাঁ-খানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ি তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচ্চে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বললে—বাড়ি কোথায়?
—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ি।
—নিবারণ চক্কত্তির? কেন?
—দেখাশুনো করি। কাল এসচি।
—ও বাড়িতে থাকতে পারবে না।
—কেন?
—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়িতে এল গেল। ওরা নিজেরাই

থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বৌয়েরা কস্মিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক। খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উঁচু দোতলা বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠলো। সত্যি, বাড়িখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে! অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নুন কিনতে যাই তখন আমার মনে দিব্যি ফুর্তি ছিল—হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্চে ওই লোকটার ভয়-দেখানো কথাবার্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার? চক্কত্তি-বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না, গাছপালার ফল-ফুলুরি গাঁয়ের লোক চুরি করে খায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে চুরি করছিলো।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে কখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে জল পড়ে—বেশ মোটাধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটাধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্কত্তি মশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হোল, চক্কত্তি মশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা ঘড়াতে জল রেখে দিয়েছিলেন ওপরের বারান্দাতে, সেই কলসী কি-ভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানলা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের।

কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবচি এমন কোন সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেচি—ভুল হবার নয়! আমি তখুনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হোল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, ঐ বৌটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ! না, এ কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে! একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেচি? ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সে-ই ছড়িয়ে গিয়েচে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়?

সে-রাত্রে সেই পর্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হোল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল। কাজ-কর্মে ভালো করে মন দিলাম। বন-জঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকতো, তবে এত কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হোল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অট্টহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিছুই না। নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেকে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েচে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে।

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সূর্যের আলো। এ সময়ে মনের মধ্যে কোন ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইচ্ছে তুলে নিয়ে খাও। আমারই বাড়ি, আমারই ঝিঙে-লতা। মালিক হওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝচি। আমার মতো গরীব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরের কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছুঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়েবাড়িতে ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়! হয়ত সবটাই আমার মনের ভুল! সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল!

এর পর ন'দিন আর কোন কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ওসব কিছু না, কি শুনতে কি শুনেচি, বৌ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনাও কানের ভুল! সব ভুল।

এ ন'দিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই আর শুধু ঘুমুই। কাজ-কর্ম কিছু নেই—কেমন একরকমের কুড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণতঃ খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েচে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হোল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুঁতবো, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েচে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্না-ঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে: কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল, সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেছি—আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি, সেই বৌটি ঝিঙে তুলতে এসেচে। নীচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হোল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জনপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-হৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানলা যেন একটা ঝড়ের ঝাপট লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপরদিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম —কৈ, একটা দরজা জানলার কপাটও খোলেনি দোতলার! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার ওঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেচি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোন শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেচে এই গোলমালের মধ্যে। দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েচি, সামান্য তন্দ্রা এসেচে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চারিপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েচে—তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েচে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরশিতে যেন একটা মুখই দেখচি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেচে!

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেচি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে। সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েচে।

—সব মিথ্যে! কোথায় বাড়ি?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের নৃত্য! শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড! অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে, আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হল্লা!

আমার বিছানার বা আমার কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হুঙ্কার আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতন ভাবে জানলার বাইরের জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হোলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করচি।

তবে সে ভূতের নাচ কে দেখেছিল? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়েদেয়ে পরম আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেচি?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েচি, তা কোথা থেকে এলো? সেই বৌটি যখন চলাফেরা করে, তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েচে!

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বললে—কি রকম আছো? বলি, কিছু দেখচো নাকি?

—না।

—শুনচো কিছু?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক। তুক-তাক জানো নাকি? ভূতের মন্তর?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন দ্যাখোনি? বৌ মত? কোনো গন্ধ পাওনি?

—কিসের গন্ধ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ?

—না।

—খুব বেঁচে গিয়েচ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকতো, তারা সবাই একটি বৌকে দেখতো ওখানে প্রায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যেতো। দুটি লোকের এই রকম হয়েচে এ পর্যন্ত। বাড়িতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়। তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ি—না খেয়ে, না দেয়ে ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না! তুমি দেখচি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও বাড়ির ত্রি-সীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমারও হোল নাকি? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমারও মনে হোল, নাঃ, সব ভুল! পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাবো? বেশ আছি, খাসা আছি, তোফা খাসা আছি!

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্কত্তি মশায় মাইনে-টাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাশুনো করি, বেগুন-কলা বেচি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইনে বাড়ি ছেড়ে।

টান

গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

যাঁর মুখে আমার এ গল্প শোনা, তাঁদের পরিবারবর্গ কর্ম উপলক্ষে পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবি শহরে অনেক দিন থেকেই বাস করছিলেন, ও-দেশের নানা গল্প আমি বন্ধুটির মুখে সেদিন বসে বসে শুনেছিলাম।

সকালবেলা, পাহাড়ী পথে একা বেড়াতে বার হয়েচি, একখানা জিপগাড়ী দেখি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসচে, আমার বন্ধু প্রণববাবু গাড়ীটি চালাচ্চেন। অনেকদিন দেখিনি প্রণববাবুকে—তিনি কবে এখানে এসেচেন, তাও জানি না।

আমাদের এদিকের বাজারে মালিয়া মোহান্তির বড় গোলদারি দোকান। তার কাছে জিগ্যেস করে জানলুম, প্রণববাবু আজ দু-মাস ধরে 'হোমসডেল' কুঠিতে বাস করচেন।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে (কারণ আমাকে পায়ে হেঁটে এই পথটা যেতে হোল তো) প্রণববাবু ও আমি দু'জনে বসে গল্প করছিলাম ও চা পান করছিলাম। অনেক দিন পরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ এবং দু-জনেই খুব খুশি হয়েছিলাম এই রকম হঠাৎ দেখা হওয়ায়।

প্রণববাবু বললেন—এখানে খেয়ে যাবেন।

—বাড়ীতে বলে আসি নি, স্নান হয় নি—

—সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তা হোলে থাকবেন তো,, একটা খুব ভাল গল্প বলবো খেয়েদেয়ে ঐ বুড়ো হর্তুকিতলার ছায়ায় বসে। কেমন? ও লাখপতিয়া, এখানে এস—এই বাবুর বাড়ী গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে।

—এখানে কর্তাদন আর থাকবেন?

—বুধবারে চলে যাবো। আজ দেখা হওয়াতে বড় ভাল হোল। কর্তাদন দেখা হবে না আর কে জানে।

—অথচ আমরা কলকাতাতেই থাকি, ঠিকানা না জানাতেই—

—মাংস খান তো?

—খুব।

—নিষিদ্ধ পক্ষীর?

—খুব।

মধ্যাহ্ন ভোজন খুবই ভাল হোল।

এর পর আমরা সেই হর্তুকিতলায় গিয়ে বসি। সামনে পশ্চিম দিকে নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী, ঝির-ঝির বাতাস বইচে নদীর দিক থেকে। একদল সাদা বক পাহাড়শ্রেণীকে পেছনে ফেলে মেঘের তলা দিয়ে উড়ে আসচে এদিকে।

প্রণববাবু বললেন—আপনি আমার জীবনের কথা কিছু কিছু সকালবেলা শুনেচেন। আজ একটি অসাধারণ ঘটনার কথা বলবো। এ আমার নিজের চোখে দেখা বলেই আপনার কাছে বলবার ইচ্ছেটা বড় প্রবল হয়েচে।

আপনি জানেন, আমার বাবা ও কাকা উগান্ডা রেলপথ তৈরির সময় থেকে ওদেশে ছিলেন। আমার এক কাকা বেলজিয়ান কঙ্গোতে কমলালেবুর আবাদ করেন, আমার বাবার অনেক আগে থেকে তিনি আছেন সে দেশে, তাঁর চার-পাঁচটি ছেলে big game hunter। লোহার মত শরীর, অনর্গল সোহালি ভাষা বলতে পারে, সে দেশের নেটিভদের মতই। এসব কথা গল্পের মত শোনাচ্ছে না কি? কিন্তু ঘর-ভোলা লোকের কাছে এ সব যতই গল্প বলে মনে হোক, আমরা জানি বাঙলা দেশের লোক কত দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। আমাদের পৈতৃক বাসভূমি বলাগড়ের কাছে সিমুলিয়া। দশ বছর বয়সে আমি প্রথম নাইরোবি যাই। ভিক্টোরিয়া নয়ান্‌জা হ্রদের তীরবর্তী কামপালা নামক ছোট শহরে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন ভদ্রলোক স্কুলমাস্টারী করতেন সে সময়—আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময়ে তিনি বিবাহ করেন নি. ছুটি-ছাটাতে নাইরোবিতে আমাদের বাসায় এসে বসতেন। তিনি দিনকতক আমার ইংরিজি পড়াবার ভারও নিয়েছিলেন!

সে সময়ে ওদেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল—মাংস, দুধ, মাখন, কফি যথেষ্ট পাওয়া যেত। সমগ্র নাইরোবিতে তিন ঘর বাঙালী পরিবার ছিল। সকলেই উগান্ডা রেলপথের কর্মচারী। আর একজন ছিল খৃষ্টান, ধর্মপ্রচার করবার কাজে কি এক মিশন কর্তৃক প্রেরিত, মাঝে মাঝে নাইরোবিতে থাকতো মাঝে মাঝে দূর পল্লী অঞ্চলে চলে যেতো।

আমি পনেরো বৎসর একাদিক্রমে নাইরোবিতে ছিলাম বাবা-মার সঙ্গে: ওখানকার জীবন খুব ভালই কেটেছিল। জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, জিনিসপত্র ছিল সস্তা, কত নতুন স্বপ্ন তখন দেখেছি অল্প বয়সে। একবার আমার খুড়তুতো ভাই অতুল এসে বেলজিয়ান কঙ্গোর জীবনের এক অপূর্ব ছবি আমার চোখের সামনে ধরলে, সেই আমার তরুণ বয়সে। বাবাকে বললাম, কাকার কমলালেবুর আবাদে গিয়ে কাজ করবো, হাতী, সিংহ শিকার করবো, গল্পের বইয়ের নায়কের মত দুর্দান্ত এডভেঞ্চারপূর্ণ মুক্ত জীবনানন্দ আস্বাদ করবো।

আমি বললাম—তখন আপনার বয়েস কত?

—সতেরো বছর।

—লেখাপড়া?

—কামপালার সেই মাস্টার সীতানাথ বাঁড়ুয্যে ইংরিজি পড়াতেন আর স্টেশন মাস্টার ডসন সাহেবের মেমের কাছে অঙ্ক কষতাম। আমায় বড় ভালবাসতেন ডসব সাহেবের স্ত্রী। তাঁর এক ছেলে ছিল প্রায় আমার বয়সী। একটা এয়ার গান নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতাম। শিকারের ঝোঁক ছিল আমাদের দু-জনেরই। নাইরোবির বাইরে তখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কণ্টক ও সিমোসা গাছের বনে জেব্রা, সিংহ, জিরাফ, উটপাখীর দল বিচরণ করতো, এখনও করে। আমরা কতবার এই সব অঞ্চলে যেতাম বন্য জন্তু শিকারের জন্যে। একবার একদল সিংহের সামনে পড়েছিলাম—তার মধ্যে এক গর্ভবতী সিংহী ছিল. সে আমাদের প্রায় চোখের সামনে একটা ঝোপের আড়ালে তিন-চারটে শাবক প্রসব করেছিল।
—সুতরাং লেখাপড়া সেখানে তেমন হয় নি।

—আপনি ডাক্তার হয়েছিলেন কোথায় পড়াশুনো কোরে?

—সে অনেক পরে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ি।

—কত বছর বয়সে কলকাতায় আসেন?

—পঁচিশ বছর বয়সে।

—অত বছর বয়সে ডাক্তারি পড়লেন? পাস করেছিলেন?

—হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়ি, মাত্র তিন বছরের কোর্স ছিল তখন। তাতেই যথেষ্ট রোজগার করেছি বা এখনো করছি।

—ভাগ্যটা ভালো আপনার।

—আমি প্রথম প্র্যাকটিস করি ডার-এস-সালামে, তারপর মোম্বাসায়। ওখান থেকে বোম্বে। বোম্বে থেকে কলকাতায় এলাম। পয়সা যা কিছু বেশী রোজগার করি, সবই ডার-এস-সালামে। আবার ইচ্ছে ছিল, সেখানে যাই, কিন্তু সেখানে আর সুবিধে হবে না।

ম্যালান গবর্ণমেণ্টের আওতায় ও উৎসাহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েচে, তাতে ভারতবাসীদের আর সেখানে হয়তো সুবিধে হবে না। ওরাই বেশী ডাকতো।

—কারা ?

—আফ্রিকানরা। ওদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করেছিল সে সময়। অনেক মেয়ে ভারতীয় স্বামী গ্রহণ করেছিল। আস্তে আস্তে উভয় সমাজে এ প্রথাটা চালু হচ্ছিল।

—এইবার আসল গল্পটা বলুন।

—বেলা গিয়েচে। বাকিটুকু অথবা আসলটুকু অতি অল্প, কিন্তু ভারি অদ্ভুত। শুনলেই তো ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে চলুন চা খাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

চা খাওয়া হলো খুব ভাল। ও-বেলাও যাতে আমি থাকি, সেজন্যে প্রণববাবু ও তাঁর স্ত্রী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।—এবেলা নাকি ভালো করে খাওয়ানো হোল না।—আমার খাওয়ার নাকি খুবই কষ্ট হোল।

সন্ধ্যার পর আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রণববাবু আবার গল্প শুরু করলেন সেই হর্তুকিতলায় বসে।

এইবার যে কথাটা বলবো, সেটা ভালো করে বুঝতে হোলে আমার মামার বাড়ীর ইতিহাস আপনার কিছু জানা দরকার। আমার দাদামশায় গোবিন্দ ঘোষাল সিপাই বিদ্রোহের সময় ফয়জাবাদ মিলিটারি একাউণ্টেণ্টে কাজ করতেন। তাঁর দুই বিবাহ, আমার দিদিমাকে তিনি বিবাহ করেন যখন, তখন তাঁর বড় ছেলের বয়েস ত্রিশ বছর। আমার মা তাঁর শেষ বয়সের সন্তান; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার সে দিদিমা সধবা অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। আমার মাকে মানুষ করে বামা বলে এক পুরোনো ঝি, আমার মামার বাড়ীর। আমার দাদামশায় তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হুগলী জেলায় নিজের গ্রামে এসে বসেচেন।

বামা মাকে ঠিক নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছিল। বাইরে কোথাও গেলে সন্ধ্যার পর পিছু-পিছু যেতো, মার বড় বয়সেও।

বামা কোথাও যেতো না, নিজের দেশ বর্ধমান জেলার যে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে তার পৈতৃক ভিটে, মার ভার নেওয়ার পর থেকে সে কখনো আর সে গ্রামেও পদার্পণ করে নি।

আমার মা যখন বিয়ের কনে সেজে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন—বামা তখন মার সঙ্গে এ বাড়ী চলে আসে এবং মাঝে মাঝে দেশে চলে গেলেও প্রায়ই তার এই জামাই-বাড়ী এসেই থাকতো।

মা বলতেন—এখানেই থাক না কেন বামা ?

সে বলতো—না খেঁদি (মার ডাকনাম), জামাই-বাড়ী কি থাকতে আছে ? লজ্জার কথা।

সে কিন্তু মাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারতো না—কিছু দিন পর-পর প্রায়ই আসতো। আসবার সময়, মা যা খেতে ভালবাসতেন ছেলেবেলায়—নারকোল নাড়ু, চিঁড়ে, কলা, এই সব যোগাড় করে নিয়ে আসতো। শুধু হাতে কখনো আসে নি!

বামা কিন্তু মারা যায় আমার মামার বাড়ীতেই, হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে। মার সঙ্গে দেখা হয় নি। মার সেজন্যে খুব দুঃখ হয়েছিল। আমাদের কাছে পর্যন্ত বামার নাম করতেন আর চোখের জল ফেলতেন।

আমি বললাম—আপনি বামাকে দেখেছিলেন ?

—না, আমার দাদা দেখেছিলেন, তখন দাদার ছ-সাত বছর বয়েস।

—তারপর ?

—তারপর কর্ম উপলক্ষে বাবা মা উগাণ্ডা চলে গেলেন এবং সে দেশেই বাস করতে লাগলেন। আমরাও গেলাম, ক্রমে বড় হলাম সে দেশে। বাবার চাকরির উন্নতি হোল। আমার এক বোনের বিয়ে হোল মোম্বাসায়, সেখানে হুগলী জেলার বন্দীপুরের রামতারণ

চক্রবর্তী শিপিং কোম্পানীর অফিসে চাকরি করতেন, তাঁর বড় ছেলে শিবনাথ আমার ভগ্নীপতি।

পরের বৎসর আমার মা মারা গেলেন।

আমার বোনের বিয়ের আগে থেকেই তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন শরীরটা কেমন করচে।

তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেলেন।

এইবার আসল কথাটা এসে গিয়েছে।

মা তো মারা গেলেন সন্ধ্যার সময়। অনেক রাতে লোকজন যোগাড় হোল। যে কটি বাঙালী পরিবার নাইরোবিতে সে সময় থাকতো, তাদের সকলের বাড়ী থেকেই মেয়েরা ও পুরুষেরা এলেন সে রাত্রে আমাদের বাড়ী খবর পেয়ে। রাত এগারোটার পর আমরা শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে গেলাম।

নাইরোবির বাইরে শহর থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় নদীর ধারে শ্মশান। স্থানটা বড় নির্জন ও ঘাসের জঙ্গলে ভরা। রাত্রে এ সব স্থানে সিংহের ভয় ছিল খুব বেশী। সিংহের উপদ্রবে রাতে কেউ বড় একটা মড়া নিয়ে যেতে সাহস করতো না শ্মশানে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল। আলো জেবলে ও বন্দুক নিয়ে আমাদের দল মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে গেল।

মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হয়েচে, দাদা মুখাগ্নি করলেন, আমরা সবাই চিতার অদূরে বসে আছি। এমন সময় আমার ছোট ভাই দেবু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখো, ও কে দাদা!

আমি চেয়ে দেখলাম। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে একটা গাছতলায় একজন ভারতীয় বৃদ্ধা মহিলা চুপ করে বসে একদৃষ্টে চিতার দিকে চেয়ে আছে। পরণে তার আধময়লা থান কাপড়।

বাবা সেদিকে চেয়ে বলে উঠলেন—সর্বনাশ! ও যে বামা ঝি।

দাদা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বামা দিদিমার মত দেখতে বটে।

বাবা বললেন—তোর মনে আছে?

—একটু একটু মনে পড়ে বাবা।

আমরা সবাই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। সত্যি, এই গভীর রাতে এই দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল শ্মশানভূমিতে কোন বাঙালীর মেয়ে আসবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমরা কেউ তাকে চিনিও না। কেবল চেনেন বাবা এবং সামান্য কিছু চেনে দাদা। তাদের সাক্ষ্য সেখানে সেদিন গভীর এক তত্ত্বের অবতারণা করলে। কোথায় বা চিতা, কার বা মৃতদেহ, মৃত্যুই বা কার?

বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীমূর্তি কিন্তু আমাদের দিকে লক্ষ্য করে নি। সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীনভাবে একদৃষ্টে জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে ছিল। এখনো সে ছবি আমি দেখচি যেন চোখের সামনে। চিরকাল আঁকা থাকবে সে ছবি আমার মনের পটে।

হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী স্নেহের টানে আজ বিশ বছর পরে বামা ঝি চলে এল পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবির শ্মশানভূমিতে।

বেশিক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। সবসুদ্ধ বোধ হয় মিনিট পাঁচ-ছয় হবে বামা ঝিকে আমরা দেখতে পেয়েছিলুম সবাই মিলে। তার পরই মিলিয়ে গেল সে মূর্তি।

আমরা বেশী কিছু কথা বলি নি এর পর। দাহকার্য শেষ করতে সকাল হয়ে গেল। নদীতে স্নান করে আমরা বাড়ী ফিরে এলুম তখন বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা। ওই নদীর তীরেই আমার মার দশপিণ্ড দেওয়া হয় এর দশ দিন পরে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন রেল অফিসের অবিনাশ গাঙ্গুলী, নাইরোবির বাঙালীদের বাড়ীর মোটামুটি বিয়ে, পৈতে, ষষ্ঠীপুজো তিনিই করতেন। তাঁর নামই ছিল আমাদের মধ্যে 'পুরুতকাকা'।

নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

গ্রামের বাঁওড়ের মধ্যে নৌকো ঢুকেই জল-ঝাঁঝির দামে আটকে গেল।

কানুনগো হেমেনবাবু বললেন—বাব্‌লা গাছটার গায়ে কাছি জড়িয়ে বেঁধে নাও……

বাইরের নদীতে ভাঁটার টান ধরেছে, নাটা-কাঁটার ঝোপের নীচের জল সরে গিয়ে একটু একটু করে কাদা বার হচ্ছে।

হেমেনবাবু বললেন—একটুখানি নেমে দেখবেন না কোথায় পিন খোলা হয়েছে? যত শীগ্‌গির খানাপুরীটা শেষ হয়ে যায়……

এমন সুন্দর বিকালটাতে আর কাজ করতে ইচ্ছা হ'ল না। পিছনের নৌকো থেকে

লোকজনেরা নেমে জায়গা ঠিক ক'রে সেখানে তাঁবু ফেলবে। জরিপের বড় সাহেবের শীগ্‌গির সদর থেকে আসবার কথা আছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, সকলের সেই দিকে ঝোঁক। সাব ডেপুটি নৃপেনবাবু কাজ শেখবার জন্যে এইবার প্রথম খানাপুরীর কাজে এসেছিলেন। বয়স বেশী না, ছোকরা—কিন্তু মাঝনদীতে নৌকা দুললেই তাঁর অত্যন্ত ভয় হচ্ছিল। বোধ হয় ভয়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ ছই-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বার ভান ক'রে শুয়েছিলেন—এবার ডাঙায় নৌকো লাগাতে তিনি ছই-এর ভেতর থেকে বার হয়ে এলেন এবং একটু পরে হেমেনবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কি নিয়ে বেশ একটু তর্ক শুরু করলেন।

নৃপেনবাবুকে বললুম—Tenancy Act কচ্‌কচিতে আর দরকার নেই, তার চেয়ে বরং চলুন নেমে তাঁবুর জায়গা ঠিক করা যাক—কাল সকালেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়.....

চৈত্র মাস যায় যায়। গ্রাম্য নদীটির দু'পাড় ভ'রে সবুজ লতানো গাছে নীল-পাপড়ি বন-অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। বাঁশ-ঝাড় কোথাও জলের ধারে নত হয়ে পড়েছে, তলায় আকন্দ ঘেঁটু ফুলের বন ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দু'ধারের রোদ-পোড়া কটা ঘাসওয়ালা মাঠের মাঝে মাঝে পত্র-বিরল বাব্‌লা গাছে গাঙ-শালিকের ঝাঁক কিচ্‌কিচ্‌ কচ্ছে—নদীর বাঁ পাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে তাদের বাসা। মাকাল-লতার ঝোপের তলায় জলের ধারে কোথাও উঁচু উঁচু বন-মূলোর ঝাড়, তাদের কুচো কুচো হলদে ফুল থেকে জায়ফলের মত একটা ঘন গন্ধ উঠছে।.....

বেলা আর একটু পড়লে আমরা সেই বাঁওড়ের ধারের মাঠে তাঁবুর জায়গা কোথায় ঠিক হবে দেখতে গেলুম। নদীর ধার থেকে গ্রাম একটু দূর হ'লেও গ্রামের মেয়েরা নদীতেই জল নিতে আসে। আমাদের যেখানে নৌকোখানা বাঁধা হয়েছিল, তার বাঁ-ধারে খানিকটা দূরে মাটিতে ধাপ কাটা কাঁচা ঘাট। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বোধ হয় নদীতে গ্রীষ্মের দিনের বৈকালে স্নান করতে আসছিলেন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—রসুলপুর কোন্ গাঁ-খানার নাম মশাই? সামনের এটা, না ওই পাশে?

তিনি বললেন—আজ্ঞে না, এটা হ'ল কুমুরে, পাশের ওটা আমডাঙ্গা—রসুলপুর হ'ল এ গাঁ-গুলোর পেছনে, কোশ দুই তফাৎ—আপনারা?

আমাদের পরিচয় শুনে বৃদ্ধ বললেন—এই মাঠটাতেই আপনারা তাঁবু ফেলবেন? আপনাদের জরিপের কাজ শেষ হ'তেও তো পাঁচ ছয় মাস.....

আমরা বললুম—তা তো হবেই, বরং তার বেশী.....

বৃদ্ধ বললেন—এখানটা একটা ঠাকুরের স্থান, গাঁয়ের মেয়েরা পুজো দিতে আসে, বরং আর একটু সরে গিয়ে নদীর মুখের দিকে তাঁবু ফেলুন, নইলে মেয়েদের একটু অসুবিধে.....

বৃদ্ধের নাম ভুবন চক্রবর্তী। জরিপ আরম্ভ হয়ে গেলে নিজের দরকারে চক্রবর্তী মশায় দলিল-পত্র বগলে অনেকবার তাঁবুতে যাতায়াত শুরু করে দিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ মেশামেশি ও আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর পৈতৃক জমা-জমি অনেকে নাকি ফাঁকি দিয়ে দখল করেছে, আমাদের সাহায্যে এবার যদি সেগুলোর একটা গতি হয়—এই সব ধরণের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই শোনাতেন।

আমি সেখানে বেশীদিন ছিলুম না। খানাপুরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমি সেদিনই জেলায় ফিরব—জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা ছাড়তে দেরী হ'তে লাগল। চক্রবর্তী মশায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, এটাকে বউ-চণ্ডীর মাঠ বলে কেন চল্লিত মশাই? আপনাদের কি কোন.....

নৃপেনবাবুও বললেন—ভাল কথা, বলুন তো চক্কত্তি মশাই, বউ-চণ্ডী আবার কি কথা—শুনিনি তো কখনো!

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্তী মশায়ের মুখে একটা অদ্ভুত গল্প শুনলুম। তিনি বলতে লাগলেন—শুনুন তবে, এটা সেকালের গল্প। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন লোক এ গল্প জানে।

সেকালে এ গ্রামে এক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করতেন। এখন আর তাঁদের কেউ নেই, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তাঁদের বড় শরিক পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয়ের খুব নামডাক ছিল।

এই পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয় যখন তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। এমন যে বিশেষ বয়স তা নয়, বিশেষতঃ ভোগের শরীর—পঞ্চাশ বছর বয়স হ'লেও চৌধুরী মহাশয়কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখাত। বউ দেখে বাড়ীর সকলেই খুব সন্তুষ্ট হ'ল। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ব'লে চৌধুরী মশায় একটু ডাগর মেয়ে দেখেই বিয়ে করেছিলেন, নতুন বউয়ের বয়স ছিল প্রায় সতেরোর কাছাকাছি। বউয়ের মুখের গড়নটি বড় সুন্দর, মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কাটির মত। চোখ দুটি বেশ ডাগর, ভাসা ভাসা মুখে চোখে ভারি একটা শান্ত ভাব। নতুন বউয়ের কাজ-কর্ম আর ধীর শান্ত ভাব দেখে পাড়ার লোকে বললে, এ রকম বউ এ গাঁয়ে আর আসেনি। সে মাটির দিকে চোখ রেখে ছাড়া কথা বলে না, অল্প বয়সের খুড়-শাশুড়ী দলের সামনেও ঘোমটা দেয়; সকলে বললে, যেমন লক্ষ্মীর মত রূপ তেমনই গুণ।

মাস দুই-তিন পরে কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটল। সকলে দেখলে বৌটির আর সব ভাল বটে, একটা কিন্তু বড় দোষ। সে কিছুতেই স্বামীর ঘেঁষ নিতে চায় না, প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে, ছেলেমানুষ, বোধহয় সেই জন্যই এ রকম করে! ক্রমে কিন্তু দেখা গেল, স্বামী কেন, যে কোন পুরুষ-মানুষ দেখলেই সে কেমন যেন ভয়ে কাঁপে। বাড়ীতে যেদিন যজ্ঞি কি কোন বড় কাজ-কর্মে বাইরের লোকের ভিড় হয়, সেদিন সে ঘর থেকে আর বারই হয় না। স্বামীর ঘরে কিছুতেই তো যেতে রাজী হয় না, মাসে দু'দিন কি একদিন সকলে আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে পাঠাতে যায়, সে জনেজনের পায় প'ড়ে, এর-ওর কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে, কিছুতেই বুঝে মানে না। পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুনলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকলে তাকে একদিন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দোরে শিকল বন্ধ করে দিল। চৌধুরী মশায় অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এর পর আর কিছুতেই কোন দিন সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইত না, বাড়ী সুদ্ধ লোকের হাতে পায়ে প'ড়ে বেড়াতে লাগল; সকলকে বলে—আমার বড্ড ভয় করে, আমায় ওরকম ক'রে আর পাঠিও না.....তোমাদের পায়ে পড়ি।.....

বোঝাতে বোঝাতে বাড়ীর লোকে হয়রান হয়ে গেল।

দিনকতক গেল, একদিন তাকে সকলে মিলে জোর ক'রে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বার থেকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। তারা ঠিক করলে এই রকম দিতে দিতে ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গবে—নইলে কতদিন আর এ ন্যাকামি ভাগ লাগে?.....ভোরে উঠে সকলে দেখলে ঘরের মধ্যে বউ নেই, বাড়ীর কোথাও নেই। নিকটেই বাপের বাড়ীর গাঁ, সেখানে পালিয়ে

গিয়েছে ভেবে লোক পাঠানো গেল। লোক ফিরে এল, সে সেখানে যায়নি। তখন সকলে বললে—পুকুরে ডুবে মরেছে ; পুকুরে জাল ফেলা হয়, কোন সন্ধান মেলে না। বউয়ের কচি মুখের ও নিরীহ চোখের ভাব মনে হয়ে লোকের মনে অন্য কোন সন্দেহ জাগবার অবকাশ পেল না। কত দিকে কত সন্ধান ক'রে যখন কোন খোঁজই মিলল না, চৌধুরী মশায় মানসিক শোক নিবারণ করবার জন্যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ঘরে আনলেন।

অজ পাড়া-গাঁ, নতুন কিছু একটা বড় ঘটে না, অনেকদিন এটা নিয়ে নাড়াচাড়া চলল। তারপর ক্রমে সেটা কেটে গিয়ে গ্রাম ঠাণ্ডা হ'ল। এই মাঠের পুবধারে গ্রামের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছিল। তখন এইখান দিয়েই নদীর স্রোত বইত—মজে বাঁওড় হয়ে গিয়েছে তো সেদিন, আমরা ছেলেবেলাতেও ধান বোঝাই নৌকা চলাচল হ'তে দেখেছি। ক্রমে চৌধুরীদের সব ম'রে হেজে গেল, শেষ পর্যন্ত বংশে একজন কে ছিল, উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বাস করলে। এ সব অনেক বছর আগেকার কথা, সত্তর-আশী বছর খুব হবে। সেই থেকে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সব মাঠে বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে শোনা যায়।

এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন খুব গরম পড়ে, তখন রাখালেরা গরু চরাতে এসে দূর থেকে কতদিন দেখেছে, মাঠের ধারে বনের মধ্যে নিভৃত দুপুরে বাঁশবনের ছায়ায় কে যেন শুয়ে আছে, কাছে গেলে কেউ কখনো দেখতে পায়নি।.....কতদিন সন্ধ্যার সময় তারা গরুর দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেতে যেতে শুনেছে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্নার রব উঠছে।.....সমুখ জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকে নদীর ঘাট থেকে ফেরবার পথে ছাতিম গাছের নীচু ডালের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছে, দূর মাঠে সন্ধ্যার আবছায়া জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে সাদা কাপড় প'রে কে যেন ক্রমেই দূরে চ'লে যাচ্ছে—তার সমস্ত গায়ের সাদা কাপড়ে জ্যোৎস্না প'ড়ে চিক্‌মিক্ করতে থাকে।.....মাঠে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন ফুলেভরা নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখলে মনে হয়, কে খানিকটা আগে এইখানে দাঁড়িয়ে ডাল নীচু ক'রে ফুল পেড়ে নিয়ে গিয়েছে.....তার ছোট ছোট পায়ের দাগ, ঝোপ যেখানে বড় ঘন সেদিকেই চ'লে গিয়েছে।.....

মাঠের ধারে এই ছাতিম গাছের তলায় উলো-চণ্ডীতলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামবধূরা পিঠে, কাঁচা দুধ আর নতুন আখের গুড় নিয়ে বউ-চণ্ডীর পুজো দিতে আসে। বউ-চণ্ডী সকলের মঙ্গল করেন, অসুখ হ'লে সারিয়ে দেন, নতুন প্রসূতির স্তনে দুধ শুকিয়ে গেলে, ওঁর কাছে পুজো দিলে আবার দুধ হয়। কচি ছেলের সর্দি সারে, ছেলে বিদেশে থাকবার সময় চিঠি আসতে দেরী হ'লে পুজো মানত করবার পরই শীগ্‌গির সুসংবাদ আসে। মেয়েদের বিপদে-আপদে তিনিই সকলকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ক'রে থাকেন।.....

চক্রবর্তী মহাশয়ের গল্প শেষ হ'ল। তারপর আরও নানা কথাবার্তার পর তিনি ও আর সকলে উঠে চ'লে গেলেন।

বেলা বেশ প'ড়ে এসেছে। সন্ধ্যার বাতাসে ছাতিম বনে সুর্ সুর্ শব্দ হচ্ছে। গ্রামের মাঠটা অনেকদূর পর্যন্ত উঁচু-নীচু ঢিবি আর ঘেঁটু ফুলের বনে একেবারে ভরা। বাঁদিকে দূরে একটা পুরনো ইটের পাঁজার খানিকটা ঘন জিউলি গাছের সারির মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে।

নৌকোর গলুই-এ ব'সে আসন্ন সন্ধ্যায় আশী বছর আগেকার পলাতকা গ্রাম্য-বধূর ইতিহাসটা ভাবতে লাগলুম। মাঠের মাঝে উঁচু ঢিবির ওপরকার ঘেঁটু ফুলের ঘন বনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যে—সারা দিনমান সে হয়ত ওর মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকে, কেবল গভীর রাত্রে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে, মাঠের মধ্যের বটগাছের তলায় চুপ

ক'রে ব'সে আকাশের তারার দিকে চায়।.....পাশের ঝোপের ফুটন্ত বন অপরাজিতা ফুলের রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে নদী ব'য়ে যায়.....ছাতিম বনের পাখীরা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে ওঠে—ওপার থেকে হু-হু ক'রে হাওয়া বয়.....সে ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে পুব দিকে চেয়ে দেখে ভোরের আলো ফোটবার দেরী কত!.....

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনের ওপর নবমীর চাঁদ উঠল। একটু পরেই জোয়ার পেয়ে আমাদের নৌকা ছাড়া হ'ল। জলের ধারের আধার-ভরা নিভৃত ঝোপের মধ্য থেকে সত্যিই যেন একটা চাপা কান্নার রব পাওয়া যাচ্ছিল—সেটা হয়ত কোন রাত-জাগা বনের পাখীর, কি কোন পতঙ্গের ডাক।

বাঁওড়ের মুখ পার হয়ে যখন আমরা বাইরের নদীতে এসে পড়েছি, তখন পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নির্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসায় ঘোমটা দেওয়া ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্না রাত্রি অল্পে অল্পে লুকিয়ে চোরের মত আত্মপ্রকাশ করছে, অনেককাল আগেকার সেই লজ্জা-কুণ্ঠিতা ভীরু পল্লীবধূটির মত!.....

বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪

ঘোষ-পাড়ায় দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যাহা বুঝায়, সে ধরনের কিছু নয়। ছোট খড়ের ঘর খান চার পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে। জোয়ারের

সময়ে তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ঠিক সেই সময় জেলেরা দোয়াড়ী পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাঁটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ীর কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোট গ্রাম।

কিছুকাল পূর্বে রেল-কোম্পানী একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটাই দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটাগাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশী।

খুঁটি দেবতার অপূর্ব কাহিনী এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা-শিবপুর। এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। বছর পনেরো পূর্বে গঙ্গায় লাটিয়া গিয়া মাঝ-গঙ্গার ওই বড় চরটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব-স্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরনো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মকদ্দমা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চরটা চিরকালই বালুময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাঙ্গা দখলে আসিলেও চরটা প্রজাদের কোন উপকারে লাগে না, অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী পূজারী বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে একা বাস করিতেন; একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া ভরিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘব চক্রবর্তী পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত বেশী। বাঁশের চটার পাখা তৈয়ারী করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষ-পাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। অবসর সময়ে ঝুড়ি, কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলু-খড়ের টুপি, ফুল-ঝাঁটা তৈয়ারী করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন। এ-সব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারের কেহই নাই, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন। একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সাকড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্তী বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একখানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া তাঁহার উঠানে থামিল। গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধুলো লইল।

রাঘব বলিলেন—এস বাবা। ছই-এর মধ্যে কে?.....

নন্দলাল সলজ্জমুখে বলিল—আপনার বউমা।

—ও! তা কোথায় যাবে? ঘোষ-পাড়ার দোল দেখতে বুঝি?

নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না। আপনার আশ্রয়েই—আপাততঃ—মানে, বামুনহাটির বাড়িঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘমাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই.....

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, দ্যাখো কান্ড!

যাহাহউক, আপাততঃ বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়-বধূকে নামাইয়া লইবার ও পূবদিকের ভিটার ছোট ঘরখানাতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে-টাছে তো? আমার এখানে আবার বড় টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয়, এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদের অবস্থাও এবার যা——

নন্দ এ-কথার কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।

রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই?

—ও কোথায় পাবে! তবে বিয়ের দরুণ গয়না কিছু আছে! ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি গাঁয়ের এক কোণে পড়ে—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ও-গুলো আগে সাবধান করা দরকার।

দিন দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুর যাবো। লোকো-কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপূর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে কিন্তু তেমন লেখা-পড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল—লোকো-কারখানায় যদি মুগুর ঠ্যাঙাতে পারি তবে এক্ষুনি কাজ জোটে, ভদ্দরলোকের ছেলে, তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে যুগী। সে বাইস-ম্যানি করছে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু তাদের ও-সব সয়। আমাকে বলেছিল হেড মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিটুনো চলবে?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটি আসিল। সে রাত্রেই স্টেশনে নামিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়াছিল, শেষরাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা উঠেন নাই, পূবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায়?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল। বলিল—আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি?.....

কিছুক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল। মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছুই হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড় শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে

বিবাহ করিয়া তার বাপ পূর্ব দুই পক্ষের সন্তানসন্ততিদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন ; এই হিসাবে দিয়াছিলেন যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনো কালেই ভাল নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা কয়খানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল। গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার দুই ঝোঁক দিয়াছিল একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদীর দোকান খুলিতে সিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবারই পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল—দ্যাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন নন্দলাল ভোরে উঠিয়া দেখিল স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ পাশের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে! স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো না গো, একটু খোঁজো তো এর মধ্যে? তুমি উত্তর দিকটা থেকে দ্যাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানারকমে বুঝাইল, কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক-বিকৃতির শুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না। পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনোদিকে না থাকে, তখন চুপিচুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে! এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিন্তু অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্মনিপুনা, সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন ঘরে ছিলেন না ; ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল! এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল, পাতলা বেগুনী রঙের কাগজ, সেকরারা এই কাগজে নূতন-তৈয়ারী সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়।.....এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, সেকরার দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনা বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণছেঁড়া বেগুনী রঙের পাতলা কাগজখানি!.....

বউটি কাহাকেও কিছু বলিল না—স্বামীকেও নয়। মনের সন্দেহ মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোশের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করিয়া সে কড়জোড়ে বার বার বলিত—ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমায় করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারি নে তোমাকেই বলছি.....

বাঁশের খুঁটিটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ-ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জনে খুঁটিটার কাছে এ নিবেদন সে করিত—কি বুঝিয়া করিত সে-ই জানে।

তাহাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা, তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর চওড়াতেও হাত দশ বারো মাত্র, পরেই গঙ্গার বড় চরাটা। সারাবছরেই চরায় জলচর পক্ষীর ঝাঁক

চরিয়া বেড়ায়। চরার বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁষিয়া থাকে। কণ্ঠকারীর বনে চরার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুনী ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চরা আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোনো গাছপালা নাই ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মত সমতল ও তৃণাবৃত ; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড় রেলওয়ে-বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে!

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ-আকাশে দুপুরের আগুন ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিম দিক কত কি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে—সারা মাঠ, চরা, রেলওয়ে বাঁধ, ও-পাশের বড় গঙ্গাটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী বা তাহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর পল্লীপ্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবধূটি বৈদিক-যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদুষীর মত মনে প্রাণে খুঁটি-দেবতার আবাহন করিল।.....

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধহয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালবাসিত ; নানারকম ঔষধ, জড়ি বুটি, শিকড়-বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলী-কালীর বালা পরাইল ; যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুশী হইল যে আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্মগুলি কেমন অন্যমনস্কভাবে করে, হয়তো বা তরকারী পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয়তো ডালে খানিকটা বেশী নুন দেয়. ভাল করিয়া কথা বলে না—ইহাই রহিল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল, চর ডুবিয়া গেল। কূলে কূলে গেরিমাটির রঙের জলে ভর্তি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল! হাতে পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরিও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেয়কে খুঁটিনাটি লইয়া বকুনি শুরু করিলেন। ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে তো পারলে না। তা দিনকতক এখন না হয় বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে তুমি কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের ভালো করে' চেষ্টা করো, নইলে আমি আর কি করে' চালাই বলো। এই তো দেখছো অবস্থা —ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরি, না আছে কোন সম্বল—ও-দিকে অসুস্থা তরুণী-বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া গিয়া আপাততঃ তুলিল। দুইটি মাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রি একলা থাকে, অন্য ঘরখানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল! মিস্ত্রি গাড়িতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড় লম্বা রেক আগাগোড়া পুরানো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে. নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেকজন মজুর ধরিয়া বাড়ির উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। শখ করিয়া এক-জোড়া হরিণের চামড়ার জুতা কিনিয়া আনিলেন, এমন কি পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার মিস্ত্রী খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে! সেদিনও যখন রাত্রে ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল-গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত-পা ধুইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা.....এগারোটা.....বারোটা.....রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন—ঘুম এখনও আসে না কেন? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই! চাঁদ ঢলিয়া পড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠাণ্ডা!.....রাঘবের কেমন ভয় হইল—তবে বোধহয় আজও ঘুম হইবে না! ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কাল তিনি বাঁচিবেন কি করিয়া?.....উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন—আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম.....ঘুম যদি না আসে! তাহা হইলে?.....রাত্রি ফরসা হইয়া কাককোকিল ডাকিয়া উঠিল, তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন!

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে, কি রাতে রাঘবের চোখে একটুকু ঘুম আসিল না পলকের নিমিত্ত—রাঘব পাগলের মত হইলেন—যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিনরাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আরও দিন ছয় সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরই হাত-পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে—আজও বোধহয় ঘুম.....

বাকীটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রীর দল কাজ শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাধিয়া উঠিল! রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাফেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোক-জনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্তা কহিতে ভালবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গণিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা

হয়েছে মানসিক। ঘুম হবে না এ-কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোর করে' ভাববে—আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এ রকম করে' দ্যাখো দিকি? আর সকাল সকাল শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মত রাঘব সন্ধ্যার পর পুরানো দিনের মত রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুন্‌গুন্‌ করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলেন—আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল! ঘুম যদি না হয়? .....পরক্ষণেই মন হইতে সে-কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধা-কৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানা নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা.....এক ঘণ্টা.....এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন.....বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্‌ করিতেছে কেন?.....না.....এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা।.....রাত একটা, গ্রাম নিষুতি, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই —কাওরা-পাড়ায় এক আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশী হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁ-দিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না, হাতখানা বেকায়দায় কেমন মুচড়াইয়া আছে, ডানদিক ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা?.....না, ছারপোকা তো বিছানায় নাই?.....যাহা হউক জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভাল।—যাক, এইবার ঘুমাইবেন। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত দুইটা!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে, রাঘব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু'দশজন এখনও হাটচালিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুট্‌কী চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে—ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন। একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা—তিনটা—এখনও জন সাত লোক বাকী। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, হাত জোড় করিতেছেন—তিনি একটু এইবার ঘুমাইবেন, দোহাই তাহাদের, তাহারা চলিয়া যাক্‌। এখনও জন তিনেক বাকী। .....রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই।.....এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন। আর একজন মাত্র.....মিনিট পনেরো দেরী—তাহা হইলেই ঘুমাইবেন।

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট?.....এ সব কি আবোলতাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধ হয়.....

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত?.....ওটা কিসের শব্দ?.....বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশি বাজিতেছে নাকি?.....সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অসম্ভব! যাক্‌, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কিনা কে জানে? ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো

একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথায় শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল; ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস। ভাগ্নে-বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না?.....

বীজপুরের কারখানার বাঁশির শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে! রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোঝা, শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে! না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটি-টুটি কিছু না—ও-সব মাথা গরমের দরুন.....

কিন্তু ঠিক একই স্বপ্ন রাঘব পর পর দুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে, ভোর-রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশি বাজিবার পূর্বে।.....ঘুমান নাই তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে?

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল। হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারায় মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়াই লজ্জায় ঘোমটা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে আসিয়া ভাগিনেয়-বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর-দেবতা হবে। ছেলে বলে আমায় মাপ করো।

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়-বধূর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার। তুমি মা—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, বুঝলে না? কিন্তু তার কাছে.....

ইহার মাস পাঁচ ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গরুর গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়-বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন—এই যে দেখছো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটি, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা। বিশ্বাস করো আমার কথা.....

ভাগিনেয়-বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটি!.....

রাঘবের মৃত্যুর পরে ষোলো-সতেরো বৎসর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্নার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি-দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনও জীবন-পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই!.....

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড় ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যান্সার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কত রকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতে উপকার দেখা গেল না। সে

শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিত, ইদানীং কথা পর্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তাহার মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া, আরও পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল।

বউটি শাশুড়ীর কাছে খুঁটি-দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সারারাত রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠাণ্ডাও, খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোট ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রা মত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই। তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানের বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া বৈকালীতে ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবমূর্তি!.....

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্তী যে বিরাটাকার পুরুষ দেখিয়াছিলেন সে-ও তাঁহার অনিদ্রা-প্রসূত অনুতাপ-বিদ্ধ মনের সৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটির মধ্যে দেবতা সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটি দেবতা সেই হইতে এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

পৈতৃক ভিটা

মধুমতী নদীর ওপরেই সেকালের প্রকাণ্ড কোঠাবাড়ীটা।

রাধামোহন নদীর দিকের বারান্দাতে বসে একটা বই হাতে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু বইএ মন বসাতে পারলে না।

কেমন সুন্দর ছোট্ট গ্রাম্য নদীটি, ওপারে বাঁশবন, আমবন—বহুকালের। ফলের বাগান যেন প্রাচীন অরণ্যে পরিণত হয়েছে। একা এতবড় বাড়ীতে থাকতে বেশ লাগে। খুব নির্জন, পড়াশুনা করবার পক্ষে কিংবা লেখাটেখার পক্ষে বেশ জায়গাটি। তাদেরই পৈতৃক বসতবাটী বটে, তবে কতকাল ধরে তাদের কেউ এখানে আসেনি, কেউ বাস করেনি।

রাধামোহনের বাবা শ্যামাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বাল্যবয়সে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যান। মেদিনীপুরে তাঁর মামার বাড়ী। সেখান থেকে লেখাপড়া শিখে মেদিনীপুরে ওকালতি করে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন এবং সেখানে বড় বাড়ীঘর তৈরী করেন। স্বগ্রামে যে একেবারেই আসেননি তা নয়, তবে সে দু-একবারের জন্যে। এসে বেশি দিন থাকেনওনি। অতবড় পয়সাওয়ালা উকিল, থাকলে তাঁর চলত না।

গ্রামের বাড়ীতে জ্ঞাতি-ভাইরা এতদিন ছিল, তারা সম্প্রতি এখান থেকে উঠে গিয়ে অন্যত্র বাস করছে, কারণ গ্রামে বসে থাকলে আর সংসার চলবার কোন উপায় হয় না।

যা কিছু জমিজমা আছে, না দেখলে থাকে না। বাড়ীটারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। নইলে বাড়ীঘর সব নষ্ট হয়ে যাবে।

রাধামোহন নিজে গত বৎসর ওকালতি পাশ করে পরলোকগত পিতৃদেবের পসারে বসেছে। এবার দেশের চিঠি পেয়ে পুজোর ছুটিতে একাই গ্রামে এসেছে বাড়ীঘর এবং জায়গা-জমির একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে।

পাশের বাড়ীর বৃদ্ধ ভৈরব বাঁড়ুজ্যে দুদিন খুব দেখাশুনা করছেন। তিনি জোর করে তাঁর বাড়ীতে রাধামোহনকে নিয়ে গিয়ে কদিন খাইয়েছেন। নইলে রাধামোহন নিজেই রেঁধে খাবে পৈতৃক ভিটেতে, এই ঠিক করেই এসেছিল।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বড়ছেলে কেষ্ট এসে বললে—দাদা, চা খাবেন, আসুন।

—তুই নিয়ে আয় এখানে কেষ্ট। বেশ লাগছে সন্ধ্যেবেলাটা নদীর ধারে।

—আনব?

—সেই ভাল, যা।

গ্রামের সবাই আবিশ্যি আত্মীয়তা করেছে, ভালবেসেছে। বৃদ্ধ লোকেরা বলেছে—আহা তুমি শ্যামাকান্ত দা'র ছেলে, কেন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে যাবে। আমরা তো মরিনি এখনও। এস আমাদের বাড়ী।

রাধামোহন সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

কেষ্ট চা দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে গেল। তার পর রাধামোহন আবার একলা। অন্ধকার রাত্রি, মধুমতীর জলে তারাভরা আকাশের ছায়া পড়েছে। রাধামোহন বসে বসে ভাবছে, এই এতবড় বাড়ীটা তার ঠাকুরদাদা তৈরি করেছিলেন কেন এখানে? সেকালের পুলিশের দারোগা ছিলেন তিনি। অনেক পয়সা রোজগার করেছেন বটে কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না সেকালের লোকের। এই বনজঙ্গলে-ভরা গ্রামে কেউ পয়সা খরচ করে বাড়ী করে? কি কাজে আসছে এখন?

আচ্ছা সুরকির কলওয়ালারা বাড়ীটা নেয়? তাহলে পুরনো ইঁটের দরে বাড়ীটা বিক্রি করা যায়।

খুট্ করে কিসের শব্দ শোনা গেল।

রাধামোহন দেখলে, একটি দশ এগার বছরের টুকটুকে ফর্সা মেয়ে ঘরের দাওয়ার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন জ্বলছে, বারান্দাতে সামান্য আলো এসে পড়েছে, সুতরাং একেবারে অন্ধকারে সে বসে নেই।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে একবার ছেলে পাঠায়, একবার মেয়ে পাঠায়, লোকটা খুব যত্ন করছে বটে।

ও বললে—কি খুকি, ভাত হয়েছে বুঝি?

একটু পরে মেয়েটি সংকোচের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

রাধামোহন বললে—তোমার নাম কি?

—লক্ষ্মী।

—বেশ নাম। পড়?

—উঁহু।

—গান জান?

—উঁহু।

রাধামোহন হেসে বললে—তবে তো মুশকিল দেখছি, বিয়ের বাজারে তুমি যে বিপদে পড়বে। রান্না?

বালিকা ঘাড় নেড়ে জানায় সে জানে।

—ওই একটা গুণ রয়েছে তোমার। কি কি রান্না জান?

—স-ব।

—সব? বাঃ বেশ খুকি তুমি। বস।

বালিকা সলজ্জ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না, বসব না।

—কেন? কাজ আছে?

—না।

—তবে বস।

—না আমি যাই। তুমি খেয়ে এস।

—যাচ্ছি। ভাত হয়েছে?

—তোমার খুব খিদে পেয়েছে—না? যাও খেয়ে এস।

রাধামোহন কি একটা বলতে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলে খুকি কখন চলে গিয়েছে। সে একটু পরে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ী খেতে গেল।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে বললেন—এস বাবাজি, এস। রান্নাও হয়ে এল প্রায়।

রাধামোহন বললে—হ্যাঁ, আপনার মেয়ে ডাকতে গিয়েছিল যে—

খাওয়া-দাওয়া করে রাধামোহন চলে এল। একা নির্জন বাড়ীতে তার বেশ লাগে। তার পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষেরা যেন অদৃশ্যচরণে এখানে বিচরণ করেন। এই বাড়ীতে তার পিতামহ বাল্যকালে খেলে বেড়িয়েছেন। তার পিতামহী নববধূরূপে প্রথম এসে দুধে-আলতায় পা রেখে দাঁড়িয়েছেন এ-বাড়ীর প্রাঙ্গণে। আজ তারা বিদেশে গিয়ে বড় বাড়ী ফেঁদে বাস করছে, দেশকে ভুলেছে।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে সব পূর্বপুরুষেরা যেন এসে অনুযোগ করেন—কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে? কি করেছিলাম আমরা?

পরদিন সকালে উঠে সে নিজের জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত রইল, সারাদিন কাটল সে-ভাবে। রাত্রে বারান্দাতে বসেছে, আবার সেই খুকিটি এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। প্রথমটা রাধামোহন টের পায়নি—বড় লাজুক মেয়ে, নিঃশব্দচরণে কখন এসে যে দাঁড়ায়!

রাধামোহন বললে—ও খুকি?

—উঁ?

—ভাত হয়েছে নাকি?

—আজ দেরী হবে। মাংস রান্না হচ্ছে তোমার জন্যে।

—সত্যি? তবে তো আজ 'ফীস্ট'এর ব্যবস্থা। ও, তুমি বুঝি 'ফীস্ট' বুঝতে পারলে না? ভোজ যাকে বলে। কি বল?

খুকি হেসে চুপ করে রইল। বেশ মেয়েটি! বেশি কথা বলে না, শান্ত সলজ্জ ব্যবহার।

রাধামোহন বললে—তোমার মামার বাড়ী কোথায় খুকি?

—ভুলে গিয়েছি।

—ভুলে গিয়েছি কি রকম? সেখানে যাও না?

খুকি ঘাড় নেড়ে বললে—না।

রাধামোহনের হাসি পেলে খুকির কথায়। বেশ নিঃসংকোচ ভাব ওর।

খুকি আবার বললে—তুমি একা এসেছ কেন?

রাধামোহন হাসতে হাসতে বললে—কেন বল তো?

—বৌঝিদের নিয়ে এস। এত বড় বাড়ী পড়ে আছে। আমোদ করুক।

—তোমার তাই ইচ্ছে খুকি?

—খু-উ-ব। আমি তো তাই চাই।

—কেন?

—কতকাল এ বাড়ী এমনই পড়ে আছে না! কেউ পিদিম দেয় না।

এ কথাটা ওর মুখ থেকে শুনে রাধামোহনের আশ্চর্য লাগল। এতটুকু মেয়ের মুখে এমন কথা! পাকা গিন্নীর মত।

ও কৌতুকের সঙ্গে বললে—তোমার তাতে খারাপ লাগে নাকি খুকি?

—বাঃ, লাগে না! তোমরা সবাই এস, বাড়ীতে শাঁক বাজুক, সন্ধ্যের পিদিম দেওয়া

হক।

কথা শেষ করেই সে ব্যস্তভাবে বললে—তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না? বড্ড রাত হয়ে গেল।

—না না, এমন আর বেশি রাত কি।

—তোমার আবার সকালে খাওয়া অবেস।

—তুমি কি করে জানলে খুকি?

অস্ফুট হাসির সুর মাত্র শোনা গেল, কোন উত্তর এল না।

একটু পরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খুকি বললে—ভাল লাগে, বড্ড ভাল লাগে।

রাধামোহন ওর দিকে চেয়ে বললে—কি ভাল লাগে খুকি?

—এই তুমি আজ এসেছ। কেউ তো কখনও আসে না এ বাড়ীতে। তুমি যাও, মাংস রান্না হয়ে গিয়েছে।

—হয়ে গিয়েছে! তুমি কি করে জানলে?

খুকি হেসে বললে—আমি জানি যে! যাও তুমি।

—দাঁড়াও, আমি মুখটা ধুয়ে আসি। একসঙ্গে যাব।

মুখ ধুয়ে এসে কিন্তু রাধামোহন খুকিকে আর দেখতে পেলে না। চঞ্চল মন ছেলেমানুষের, আগেই চলে গিয়েছে। বেশ খুকিটি, কেমন পাকা পাকা কথা বললে। হাসতে হাসতে প্রাণ যায়।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে ওকে দেখে বললে—এস এস বাবাজি। এই তোমায় ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। আজ একটু রাত বেশি হয়ে গেল, একটু মাংস নেওয়া হল আজ। বাঁল রোজ রোজ ডাল ভাত ওরা খেতে পারে না। আমার বাড়ী আজ দুদিন খাচ্ছে, সে আমার ভাগ্যি। নইলে ওদের অভাব কি। তাই আজ—

রাধামোহন সলজ্জভাবে বললে—না না, সে কি কথা! যা জুটবে তাই খাব। পর ভাবেন নাকি কাকা? আমি তো বাড়ীর ছেলে।

পরদিনও আবার খুকি সন্ধ্যার সময় এসে হাজির।

রাধামোহন বললে—এস খুকি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

খুকি হেসে বললে—আমার কথা?

—সত্যি তোমার কথা!

খুকি ছেলেমানুষী ভাবে ঘাড় দুলিয়ে বললে—কেন, আমি জানি।

—তুমি জান?

—জানি। কিন্তু বলব না।

রাধামোহন আজ খানিকটা সন্দেশ আনিয়ে রেখেছে, খুকিকে দেবে বলে। অবিশ্যি আনিয়েছিল হরি নন্দীর চাকর অমূল্যকে দিয়ে, ইসলামকাটির বাজার থেকে। ইসলামকাটির সন্দেশ এ অঞ্চলে বিখ্যাত। অমূল্য দেখা যাচ্ছে গল্প করে বেড়িয়েছে। রাধামোহন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল অমূল্যর উপর। খুকিকে হঠাৎ খুশি করে দেবে সন্দেশ হাতে দিয়ে ভেবেছিল। সেটা আর হল কই।

তবুও রাধামোহন বললে—না, তুমি জান না খুকি। কি বল তো?

খুকি মৃদু মৃদু হেসে বললে—জানি আমি।

ওর হাসির মধ্যে এমন একটা বিজ্ঞতা আছে যে রাধামোহন আর কোন প্রশ্ন করলে না এ নিয়ে। ও জানে। ওর মৃদু হাসির মধ্যে দিয়েই সে কথা বোঝা গেল।

অমূল্যটা আচ্ছা তো! পাড়াগাঁয়ের লোকের পেটে কোন কথা থাকে!

খুকি আবদারের সুরে বললে—কই, দাও আমাকে সন্দেশ?

রাধামোহন ব্যস্ত হয়ে ওকে সন্দেশ দিতে গেল, কিন্তু ওকে আর সেখানে দেখা গেল না। চঞ্চলা বালিকা, কখন হঠাৎ চলে গিয়েছে। ওর ধরন বড় আশ্চর্য রকমের!

আহারের সময় ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বাড়ীতে ও সন্দেশটা নিয়েই গেল! বললে—খুকি বড় লাজুক, তখন চলে এল, ওকে একটু এই—

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে হেসে বললে—খুকি বুঝি তোমার কাছে গিয়েছিল?

—রোজই যায়। গল্প-সল্প করে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ও একটু লাজুক বটে। খুব ছেলেমানুষ তো!

পরদিন সন্ধ্যায় খুকি আবার নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে দাঁড়াল বারান্দাতে।

রাধামোহন বললে—কাল অমন করে চলে গেলে কেন তুমি? আমি ভারি রাগ করেছিলাম কিন্তু।

খুকি হেসে চুপ করে রইল।

—খেয়েছিলে সন্দেশ?

—বা রে, যখন তুমি বললে, ওই তো আমার খাওয়া হলে গেল।

পরক্ষণেই সে যেন স্নেহের সুরে বললে—তুমি এই এসেছ, আমার কত ভাল লাগছে! বাড়ীতে পিদিম জ্বলছে। একা একা ভাল লাগে?

—শহরে যাবে? চল আমার সঙ্গে। চল—

—আমার এখানেই ভাল। ওসব আমার ভাল লাগে বুঝি?

—বাঃ, কত টকি-ছবি, কত খাবার-দাবার—

—হক গে। আমার তাতে কি। তুমি আবার আসবে বল।

—আসব নিশ্চয়ই। কেন আসব না।

—এতদিন তো আসনি। ভিটেতে সন্ধ্যের সময় পিদিম জ্বলেনি তো? আচ্ছা আসি আজ। তুমি তো মঙ্গলবারে যাবে?

রাধামোহন একটু আশ্চর্য হল। মঙ্গলবারে সে যাবে, বলেছিল ভৈরব বাঁড়ুজ্যেকে। ভৈরব কাল আবার বাড়ীতে গল্প করেছে!

তার পর দু দিন রাধামোহন বৈষয়িক কাজে অন্য গ্রামে গিয়ে রইল। সোমবার অনেক রাত্রে নৌকাযোগে স্বগ্রামে ফিরল বটে, কিন্তু ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বাড়ীর কারও সঙ্গে অত রাত্রে আর দেখা করলে না। ঘরে চিঁড়ে ছিল, তাই খেয়ে রাত কাটালে।

পরদিন সে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ভৈরব এসে বললে—বাবাজি, কাল কত রাত্রে এলে? খেলে কোথায়? আমাদের ডাকা তোমার উচিত ছিল। তুমি তো ঘরের ছেলে। এত লজ্জা কর কেন? ছিঃ—

রাধামোহন বললে—আপনার খুকিটিকে একবার ডেকে দিন না?

—বেশ বেশ। এখুনি ডাকছি—দাঁড়াও—

একটু পরে একটি আট বছরের কালো-মত মেয়ের হাত ধরে ভৈরব বাঁড়ুজ্যে সেখানে নিয়ে এলেন। রাধামোহন বললে—এ খুকি তো নয়, এর দিদি।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে বললেন—এর দিদির তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সে তো শ্বশুরবাড়ী আছে। তুমি তাকে দেখনি।

—তবে আপনার বাড়ীর অন্য কোন মেয়ে—

—আমার বাড়ীতে বাবাজি আর কোন মেয়ে নেই। তবে অন্য কোন মেয়ে কিন্তু না, আর কোন মেয়ে এ-পাড়ায় নেই ও বয়সের। দু-ঘর তো মোটে ব্রাহ্মণের বাস। বয়স কত?

রাধামোহনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বললে—ওর নাম বলেছিল লক্ষ্মী।

—লক্ষ্মী? সে আবার কে? কই, ও-নামের মেয়ে এ গ্রামেই নেই। তোমার শুনতে টুনতে ভুল হয়ে থাকবে বাবাজি।

—শুনতে ভুল হতে পারে নামটা, কিন্তু সে খুকীটি কে? সে তো আর ভুল হবে না।

—কই বাবাজি, বুঝতে তো পারলাম না। ও-বয়সের ও-নামের মেয়ে আমাদের পাড়ায় কেউ নেই ঠিকই।

রাধামোহন চিন্তিত মনে বিদায় নিলে। আশ্চর্য ব্যাপার, খুকিই বা আর দেখা করতে এল না কেন?

স্বগ্রাম থেকে ফেরবার দু বছর পরে রাধামোহন তার পিসির বাড়ী গিয়েছে জব্বলপুরে। সেখানে পুরনো ফটো-অ্যালবাম খুলে দেখতে দেখতে একটি মেয়ের ফটো চোখে পড়ল। এই মেয়েটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে! ঠিক মনে পড়ল না।

পিসিমাকে ডেকে ফটোটা দেখাতে তিনি বললেন—একে তুই দেখবি কোথায়! ও তো আমার ছোট বোন। তোর ছোট পিসি। বার বছর বয়সে মারা যায়, তখন তুই কোথায়? তোর মার বিয়েই হয়নি। আমরা তখন সব আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতেই থাকি।

তারপর পিসিমা যেন কতকটা আপনমনেই বললেন—আহা, একটু একটু মনে হয় ওকে। বেশ দেখতে ছিল। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। তার পর তোর বাবাও দেশ ছেড়ে মেদিনীপুর চলে এল। দেশের বাড়ীতে যাওয়াই হয়নি। বিয়ের পর আমি একবার মোটে গিয়েছিলাম, সেও আজ বিশ বছর আগের কথা।

রাধামোহন অবাক হয়ে চেয়ে রইল অ্যালবামখানা হাতে করে। হঠাৎ মনে পড়াতে বললে—কি নাম ছিল ছোট পিসিমার?

পিসিমা উত্তর দিলেন—লক্ষ্মী।

অশরীরী

নানারকম অদ্ভুত গল্প হচ্ছিল সেদিন আমাদের লিচুতলার আড্ডায়। কিন্তু সে সব নিতান্ত পানশে গোছের ভূতের গল্প। পাড়াগাঁয়ের বাঁশবাগানের আমবাগানের গেঁয়ো ভূত। সাদা কাপড় পরে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকে—ওসব অনেক শোনা আছে। ওর বেশি আর কেউ কিছু বলতে পারলে না।

এমন সময় শরৎ চক্রবর্তী আড্ডায় ঢুকলেন। তিনি আবগারী বিভাগে বহুদিন কাজ করে অবসর গ্রহণ করেচেন। ষাটের কাছাকাছি বয়সে। তান্ত্রিক সাধনা করেন। ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিনা পয়সায় ক'রে দেন। কোন রঙের আংটি ধারণ করলে কার সুবিধে হবে, ঠিক ক'রে দেন। পরের বেগার খাটতে ওঁর জুড়ি বড় একটা দেখা যাবে না এসব কাজে। লোক অতি সজ্জন, সকলে মানে, শ্রাদ্ধা করে। অনেকে ওঁর সামনে ধূমপান করে না।

শরৎবাবু ঢুকে বললেন—এই যে, কি হচ্ছে আজ? যে বাদলা নেমেচে!

শ্যামাপদ মোক্তার বললেন—আসুন, আসুন চক্কত্তিমশায়। আমাদের ভূতের গল্প হচ্ছে বাদলার দিনে। তবে তেমন জমচে না। আপনার তো...

শরৎ চক্রবর্তীমশায় বললেন—আমি একটা গল্প বলতে পারি তবে সেটা ভূতের গল্প নয়। সেটা কিসের গল্প তা আমি জানিনে। আপনারা শুনে বিচার করুন।

শরৎবাবুর মুখে, সেই গল্প শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। স্বর্গমর্ত্য যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল সেই ঘন বর্ষার বর্ষণমুখর মেঘের আবরণ ভেদ করে।

শরৎবাবু বললেন—আমাকে সেবার হঠাৎ জলপাইগুড়ির ওধারে ডুয়ার্স অঞ্চলে বদলি করলে। আমার পরিবারবর্গ তখন ঢাকায়, তাদের ওখানে রেখে জলপাইগুড়ি চলে গেলাম। নতুন জায়গা। সেখানে নিজে না দেখেশুনে কি করে সবাইকে নিয়ে যাই। বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়েরা তখন ঢাকা স্কুলে পড়াশোনা করচে।

যেখানে গেলাম সেখানটা জলপাইগুড়ি থেকে অনেক দূর। ছোট লাইনে যেতে হয়, পথে চা-বাগান পড়ে। বনময় অঞ্চল। কিন্তু দূরে সবুজ বনরেখার পটভূমিকায় হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরমালা চোখে পড়ে। বড় নির্জন স্থান। আমি যে জায়গায় গেলাম, তার নাম হলদিয়া। ছোট্ট জায়গা, আমি সেখানে গিয়ে সিনিয়র সাব্‌ইন্‌স্পেক্টরের বাসায় উঠলাম, কারণ, আমার বাসা তখনো ঠিক হয়নি। সে ভদ্রলোকের নাম, রেবতীমোহন মুখুজ্যে, বাড়ি নদীয়া জেলা। বেশ ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা। আমায় খুব যত্ন করলেন, দিন কয়েকের মধ্যেই বাসা ঠিক ক'রে দেবেন ভরসা দিলেন।

তৃতীয় দিন সকালে আমায় বললেন—আপনাকে একটা কথা বলি.....

—কি ?

—আপনার এখন এখানে আসা খুব ভুল হয়েচে।

—কেন বলুন তো ?

—আপনি জানেন না কিছু এদেশের ব্যাপার ?

—না। কি ব্যাপার ?

—এই বর্ষাকালে এখানে ভয়ানক ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর হচ্চে চারিধারে। আপনি নতুন লোক, আপনার তো খুবই জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। দু'একবার জ্বর হোলেই ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর দেখা দেবে। তখন জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এইরকম এদেশের কান্ড।

—তবে আপনারা আছেন কি করে ?

—সেকথা আর ব'লে লাভ নেই। ইচ্ছে ক'রে নেই। আছি প'ড়ে পেটের দায়ে। চাকরি ছেড়ে দিলে এ বয়সে যাবো কোথায়, খাবো কি ? আমার দুটি মেয়ে পর পর মারা গিয়েচে ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারে। তবুও বদলি পেলাম না। কি করি বলুন শরৎবাবু।

—তবেই তো...

—একটু সাবধানে থাকলেই হবে। জলটা গরম না ক'রে খাবেন না বাইরে গিয়ে !

—ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার হোলেই কি মানুষ মারা যায় ?

—ভালো চিকিৎসা না হলে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষ ক'রে এই বর্ষাকালে যাঁরা নতুন আসেন, তাঁদের ধরলে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আমি এরকম দুটো কেস দেখেচি। দুটোই মারা গেল।

শুনে মনে ভয় হলো। কিন্তু সাবধান হয়েই বা কি করবো। বিদেশে বেরিয়ে কত-দূর সাবধান হওয়াই বা চলে। যা থাকে কপালে ভেবে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলাম। দশ-বারো মাইল দূরে দূরে গাঁজার দোকান মদের দোকান তদারক করে বেড়াতে লাগলাম।

খুব ভালই লাগছিল। বর্ষার সবুজ অভিযান সুরু হয়েচে বনে বনে। কত রকমের ফুল ফোটে। কত ধরনের পাখী ডাকে। দূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত কি একটা শৃঙ্গ একদিন দেখা গেল। মিছরির পাহাড়ের মত ঝক্‌ঝক্‌ করচে সকালের সূর্যকিরণে। তবে রোদ বড় একটা উঠতে ইদানীং আর বড় দেখা যেতো না।

ইতিমধ্যে রেবতীবাবুর চেষ্টায় ভালো একটা বাসা পাওয়া গেল। উঁচু কাঠের খুঁটির ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে তার ওপর বাংলো ধরনের ঘর করা হয়েছে। কাঠের মেজে বেশ শুকনো খট্‌খটে। ঘরটা বেশ বড়। আলো-হাওয়া বেশ আসে।

মনের ভয় ক্রমে কেটে গেল। তখন মনে ভাবি, রেবতীবাবুর ওটা উচিত হয়নি। এখানকার মাটিতে পা দিতে না দিতে অমন ভয় দেখিয়ে দেওয়া কি ভালো হয়েচে ? কেন করলেন ওটা রেবতীবাবু ? অন্য কোন মতলব ছিল নাকি ? সাত-পাঁচ ভাবি।

এখানে আমার এক ব্রাহ্মণ আরদালি জুটলো। নাম দিগম্বর পান্ডে। লোকটা অনেক-দিন সেখানে আছে। রান্না করতো খুব ভালো। সে হাট-বাজার রান্নাবান্না সবই করতো। কোন অসুবিধা ছিল না।

মাস-দুই পরে সেবার 'বামনাপাড়া নর্থ' বলে একটা জায়গায় আবগারি তদারকে গেলাম। সেটা একটা চা-বাগানের পাশে ছোট্ট বাজার। চা-বাগানটার ট্রাকগুলোর গায়ে লেখা আছে, 'বামনাপাড়া নর্থ টি এস্টেট'। পাহাড়ী একটা ছোট নদী পেরিয়ে আমার

গরুর গাড়ি বাজারে গিয়ে থামলো। বেলা তখন দশটা। দুটি মাড়োয়ারী মহাজনের গদি আছে। তারা বন অঞ্চলের উৎপন্ন সওদা করে। দেবেন সামন্ত ব'লে মেদিনীপুরের একজন ব্যবসায়ীর কাঠের কারবার আছে। গাঁজা ও আফিমের দোকান সেই দেবেন সামন্তের ভাই, শশী সামন্তের।

ওখানে বসে থাকতে-থাকতেই আমার শরীর কেমন খারাপ হোলো। মাথা ধরলো। দেবেন সামন্তকে বলতে সে কি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলে। বললে, এতেই সেরে যাবে। কোনো ভয় নেই।

আমি বললাম—আপনাদের এখানে ব্ল্যাকওয়াটার হয়?

—খুব।

—মানুষ মরে?

—তা মন্দ মরে না।

—আপনারা ভয় পান না?

—আমরা অনেকদিন আছি। নতুন যাঁরা আসেন, তাঁদের ভয় একটু বেশি।

সবাই দেখছি একই কথা বলে। গাঁজার হিসেব চেক করতে করতে আর যেন বসতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ি। জল-তেষ্টা পাওয়াতে বামনপাড়া নর্থ চা-বাগানের একটা গুমটি টিনের শেড্ থেকে জল চেয়ে খাই এক নেপালী দরওয়ানের কাছ থেকে।

যখন বাসায় পৌঁছলাম তখন বেলা গিয়েচে। আমার তখন খুব জ্বর। পথেই কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। খবর পেয়ে রেবতীবাবু ছুটে এলেন। ডাক্তার ডাকা হলো। ওষুধ ও ইন্‌জেকসান চললো। তিনদিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল।

দিন পনেরো বেশ আছি।

সবাই বল্লে—ঠাণ্ডা লেগে অমনটা হঠাৎ হয়েছিল। ও কিছু না।

আমিও নিজেকে সেইভাবেই বোঝালুম। আবার বেশ কাজকর্ম করি। শরীরে কোন গ্লানি নেই। একদিন হলদিয়া পুলিশ-থানায় বসে থানার দারোগার সঙ্গে গল্প করচি, হঠাৎ আবার জ্বর এলো। দারোগাবাবু লোক দিয়ে আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

আরদালি দিগম্বর পাঁড়েকে বললাম—জল দাও। জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম, তিনদিন ভীষণ জ্বরের ঘোরে কাটলো। রেবতীবাবু এবং থানার দারোগাবাবু দু'বেলাই আসতেন। কিভাবে আমার সাবু বার্লি তৈরী করতে হবে, আমার আরদালিকে শিখিয়ে দিয়ে যেতেন। তিনদিন পরে জ্বর কমে গেল।

ক্রমে বেশ সেরে উঠলাম। কাজকর্ম আবার সুরু ক'রে দিলাম। দিন পনেরো পরে চা-বাগানের একটা আবগারী কেস দেখতে গিয়েছি, আবার হঠাৎ জ্বর এলো। এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম।

এখানকার জ্বর ভেল্কিবাজীর মত আসে, আবার ভেল্কিবাজীর মত চলে যায়। সুতরাং প্রথম প্রথম জ্বর এলে আমার যে রকম ভয় হোতো, এখন গা সওয়ার দরুন সে ভয় একেবারেই নেই। আরদালিকে ডেকে বলে দিলাম, আগের মত পথ্য প্রস্তুত ক'রে আমাকে যেন খাওয়ায়।

এবার কিন্তু একটু অন্যরকম হলো।

অত সহজে এবার আমি নিষ্কৃতি পেলাম না। দিন দুই পরে উৎকট ব্ল্যাকওয়াটার জ্বরের সব লক্ষণগুলি আমার মধ্যে ফুটে বেরুলো। অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লাম। সেরে উঠতে পাঁচ-ছ'দিন লেগে গেল। দিন দুই পথ্য করার পর একদিন সকালবেলা আমার সঙ্গে রেবতীবাবু আর দারোগাবাবু দেখা করতে এলেন। আরদালিকে চা ক'রে দিতে বললাম, কিন্তু তাঁরা চা খেলেন না। পরে বুঝেছিলাম, তাঁরা চা খাননি—ব্ল্যাকওয়াটারকে ছোঁয়াচে জ্বর ভেবেই। দারোগাবাবু বললেন—শরৎবাবু, একটা কথা বলি।

—বলুন।

—আপনি এখান থেকে চলে যান।

—কেন বলুন তো?

—ডাক্তারবাবুর তাই মত।

—আমাকে তো কিছু বলেননি।

দারোগাবাবু ইতস্তত ক'রে বললেন—না, আপনাকে বলেননি। আমাদের বলেচেন আপনাকে বলবার জন্য কিনা। তাই বলা উচিত ভাবলাম। উনি বলেচেন, আপনার অসুখ খুব খারাপ। মানে—

—আমি তো সেরে গিয়েচি।

—ও সারা বড় কঠিন শরৎবাবু।

—বেশ, তাহলে স্টেশন পর্যন্ত আমি যাবো কি করে? রক্ষিয়াঘাট পার হবার তো কোন উপায় দেখিনি।

—কিছু ভাববেন না। স্ট্রেচার যোগাড় করছি চা-বাগান থেকে। কুলী পাঠাবো। পুলিশের একজন লোক সাথী থাকবে, আপনাকে ট্রেনে উঠিয়ে না দিয়ে তারা ফিরবে না।

—বেশ।

আমি তখন জানতাম না যে, আজই আমার জীবনের শেষদিন হোতো, যদি—

কিন্তু সে কথা ক্রমে বলচি।

আমি সম্মতি দিলে দারোগাবাবু চলে গেলেন।

তখন বেলা ন'টা হবে। গরম জল ক'রে নিয়ে আসতে বললাম আরদালিকে, গা-হাত মুছবো ব'লে। তারপর একবাটি বার্লি খেলাম। আরও একটু বেলা হোলে দুটি ভাতও খেলাম।

বেলা বারোটার পর লোকজন এলো স্ট্রেচার নিয়ে। এই পর্যন্ত ব'লে শরৎ চক্রবর্তী বললেন—একটু চা খাবার ইচ্ছে হচ্চে।

আমরা বললাম—গল্পটা শেষ করুন।

—চা খেয়ে নিয়ে বলবো। এইবার গল্পের আসল অংশটাতে এসে গিয়েছি কিনা, একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলি।

নিতাইবাবু উকিল বললেন—একই কথা। আপনি বললেন, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর হলো, সেরে গিয়ে আপনি পথ্য করলেন, অথচ ডাক্তারবাবু কেন আপনার অসুখ খারাপ বললেন? অসুখ তো সেরে গিয়েছিল।

—সেরে গিয়েছিল কি রকম সেবার, এখুনি সেটা শুনলে বুঝতে পারবেন। আসলে সারেনি।

—তবে পথ্য দিয়েছিল কেন ডাক্তার?

—এ কথার জবাব আমি দিতে পারবো না। কাউকে জিগ্যেসও করিনি। তবে যেমন ঘটেছিল, সেইরকম বলে যাচ্চি—

—এটা একটা অদ্ভুত কথা বলচেন আপনি। কিরকম সে-দেশের ডাক্তার বুঝলাম না মশাই!

—এ-কথাটা আমিও কখনো ভেবে দেখিনি। আচ্ছা, এবার বলি গল্প। শরৎ চক্রবর্তী পুনরায় গল্প আরম্ভ করলেন:

বেলা বারোটার পর স্ট্রেচার নিয়ে এলো চা-বাগানের লোকজন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেবতীবাবু ও দারোগাবাবু। আমি আরদালি জিনিসপত্র গোছাচ্চি এমন সময় আমার এলো জ্বর। ভীষণ কম্পজ্বর। আর আমি বসতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধা বিছানা আরদালিকে দিয়ে খুলিয়ে পাতিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার আমি আর কিছুই জানিনে। আমার সমস্ত চৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেল এক ঘন অন্ধকারের আবরণের অন্তরালে।

যখন আবার আমার জ্ঞান হলো, তখন দুটো জিনিস আমার চোখে পড়লো প্রথমেই। অন্ধকারের মধ্যে একটা কি গাছের ডাল পাশের জানালার বাইরে হাওয়ায় দুলচে। দ্বিতীয় জিনিস হলো. আমার বাক্স ও পুঁটুলি আমার পায়ের দিকে দেওয়ালের কাছে রয়েচে এবং আমার ছাতিটা দেওয়ালের কোণে হেলানো রয়েচে।

আমি কি রেলওয়ে ট্রেনে উঠেছি?...

কিন্তু এত অন্ধকার কেন রেলের কামরা? অন্য লোকই বা নেই কেন কামরায়? তারপর আস্তে আস্তে আমার মনের আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে আসতে লাগলো। আমার মনে পড়লো যে, আমি স্ট্রেচারে আদৌ উঠিনি, জ্বর আসাতে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু ঘরই যদি হয় আরদালি দিগম্বর কই? ঘরে আলো জ্বালেনি? আমি কোথায়?

তৃষ্ণা পেয়েছিল। ডাকতে গেলাম ওকে। গলায় স্বর আটকে গেল। দুবার ডাকতে গেলাম, দুবারই তাই হলো।

আমার মনে হোলো বাইরে চাঁদ উঠেছে। জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের সামান্য আলো এসে পড়েচে। কিছুক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে রইলাম, ঘরের মধ্যে বা বাইরে কোথাও কোন শব্দও নেই।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো বাইরের দিকে। কে ওখানে বাইরে?

এই দেখুন, এতদিন পরে মনে পড়েও আমার গা শিউরে উঠলো। দেখলাম কি জানেন, একটি কালো মত মেয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমার ঘরের চারিপাশে ঘুরছে, আর একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে কি করচে—দুবার আমার সামনের দরজার ফাঁক দিয়ে সে নীচু হয়ে ঘুরে গেল।... তিনবারের বার মেয়েটি হঠাৎ মুখ উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললে—কোনো ভয় নেই—গণ্ডি দিচ্চি—আজ রাত্রে কেউ গণ্ডির মধ্যে আসতে পারবে না—ঘুমো—

অতি অল্পক্ষণের জন্যে মেয়েটিকে চোখের সামনে দেখলাম, তারপর সে ঘুরে গেল ওদিকে। আমারও আর জ্ঞান রইল না। ঘুমিয়ে পড়লাম কি?

এরপরে কতক্ষণ পরে জেগে উঠেছিলাম তা বলতে পারবো না, কিন্তু তখন চোখ খুলেই দেখলাম, সেই কালো মেয়েটি আমার শিয়রের কাছে ব'সে। তার বয়েস আঠারো বছরের বেশি হবে বলে আমার মনে হলো না। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম. মেয়েটি যেন খুব ঘেমেচে, ওর মুখ ঘামে ভিজে গিয়েচে যেন, সারা শরীর দিয়ে যেন দরদর করে ঘাম ঝরচে...

আমি ওর দিকে চেয়ে দেখতেই মেয়েটি চমৎকার শান্ত স্নেহময় সুরে বলে উঠলো—জাগলি কেন? ঘুমো-ঘুমো—কোনো ভয় নেই—ঘুমো—

শেষবার যখন ও 'ঘুমো' বলেছে, তখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ওর কথা শুনতে শুনতে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে সেই গাছের ডালটার দিকে নজর পড়লো জানলার বাইরে। তার গায়ে জ্যোৎস্না পড়েচে।...

এইখানেই আমার গল্প শেষ হলো।

সকালে আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন আমার মনে হোলো, স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ঘুম থেকে আমি জেগে উঠেছি।

আমার শরীরে কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু শরীর বড় দুর্বল। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না। ক্রমে ক্রমে একটু বেলা হোলো। তখন দেখি, দিগম্বর পাঁড়ে আরদালি সন্তর্পণে পা টিপে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্চে। আমি ডাকতেই যেন সে চমকে উঠলো. কোনো উত্তর দিলো না। আমি বললাম—রেবতীবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো।

থতমত খেয়ে সে যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে অনেক লোক এলো আমাকে দেখতে। তার ম'ধ্য রেবতীবাবুও ছিলেন।

রেবতীবাবু বললেন—কেমন আছেন শরৎবাবু?

—ভালো। আমি কিছু খাবো।

তখনই রেবতীবাবু বাইরে গিয়ে কাকে কি বললেন। খানিক পরে এক বাটি বার্লি এলো আমার জন্যে। বার্লি খেয়ে শরীরে বল পেলাম। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন. জ্বর ছেড়ে গিয়েচে।

এর দিন-দুই পরে আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে উঠলাম। পথ্যও করলাম। তখন ক্রমে ক্রমে শুনলাম, সেই ভীষণ রাত্রে আমাকে মুমূর্ষু মনে ক'রে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল একা ফেলে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন রাত কাটবে না। এমন কি. নাকি সকালে

আমার সৎকারের জন্যে কে কে যাবে, কোথায় কাঠ পাওয়া যাবে, এসব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সকালেই লোক পাঠিয়ে আমার পরিবারবর্গকে টেলিগ্রামে আমার মৃত্যু সংবাদ জানানোর জন্যে থানা থেকে একজন কনেস্টেবল পাঠাবেন, দারোগাবাবু তাও ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

অথচ সেই নির্বান্ধব, পরিত্যক্ত অবস্থায় কে আমার মৃত্যুশয্যার পাশে সারারাত বসেছিল, কে আমার ঘরের চারিধারে গণ্ডি এঁকে দিয়েছিল আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে...সবাই পরিত্যাগ করলেও কে আমাকে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যেও পাহারা দিয়েছিল...এ সব প্রশ্নের কোনো জবাবই আমি দিতে পারবো না।

যদি আপনারা বলেন, সবটাই জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি—তারও কোন প্রতিবাদ আমি করতে চাই না। স্বপ্ন যদি হয়, বড় মধুর, বড় উন্নত ধরনের উদার স্বপ্ন দেখেছিল আমার মুমূর্ষু মন। সে স্বপ্নের ঘোর আমার সারাজীবন চোখে রইল মাখা। মস্ত বড় একটা আশার বাণী দিয়ে গেল প্রাণে।

শরৎ চক্রবর্তী চুপ করলেন। মনে হোলো তাঁর চোখে যেন জল চক্‌চক্‌ করছে। উকিল নিতাইপদ রাহা বললে—সেরে উঠে হলদিয়াতে আপনি ছিলেন কতদিন?

—যতদিন গবর্ণমেন্ট আমাকে বদলি না করেছিল? প্রায় দু'বছর।

—এভাবে একা ছিলেন বাসায়?

—আমি আর দিগম্বর। আর কেউ না।

—আর কোনোদিন কিছু দেখেছিলেন?

—না।

—আর অসুখে ভুগেছিলেন?

—না।

ঘন বর্ষার রাত। বাইরে বেশ অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছিল উঠানের শিউলি গাছটার ডালে পাতায়। আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। নিতাই উকিলও আর বেশী কথা বলেনি। বৃষ্টি এসে পড়বে ব'লে শরৎ চক্রবর্তীকে আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম ছাতি দিয়ে।

কি বাদামই হোত শ্রীশ পরামাণিকের বাগানে। রাস্তার ধারেই বড় বাগানটা। অনেক দিনের প্রাচীন গাছপালায় ভর্তি। নিবিড় অন্ধকার বাগানের মধ্যে—দিনের বেলাতেই।

একটু দূরে আমাদের উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালা। রাখাল মাস্টারের স্কুল। একটা বড় তুঁত গাছ আছে স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেজন্যে আমরা বলি 'তুঁততলার স্কুল'।

দুজন মাস্টার আমাদের স্কুলে। একজন হলেন হীরালাল চক্রবর্তী। স্কুলের পাশেই এঁর একটা হাঁড়ির দোকান আছে, তাই এঁর নাম 'হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার'।

মাস্টার তো নয়, সাক্ষাৎ যম। বেতের বহর দেখলে পিলে চমকে যায় আমাদের। টিফিনের সময় মাস্টার মশায়েরা সব ঘুমুতেন। আমরা নিজের ইচ্ছে-মতো মাঠে-বাগানে বেড়িয়ে ঘণ্টাখানেক পরেও এসে হয়তো দেখি তখনও মাস্টার মশায়দের ঘুম ভাঙে নি। সুতরাং তখন আমাদের টিফিন শেষ হোল না—টিফিনের মানে হচ্ছে ছুটি মাস্টার মশায়দের, ঘুমুবার ছুটি।

সেদিনও এমনি হোল।

রেল লাইন আমাদের স্কুল থেকে অনেক দূরে। আমরা মাৎলার পুল বেড়িয়ে এলাম, রেল লাইন বেড়িয়ে এলাম—ঘণ্টাখানেক পরে এসেও দেখি এখনও হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের নাক ডাকচে।

নারাণ বললে—ওরে চুপ চুপ, চেঁচাস নি, চল ততক্ষণ পরামানিকদের বাগানে বাদাম খেয়ে আসি—

আমাদের দলে সবাই মত দিলে।

আমি বললাম—বাদাম পাড়া সোজা কথা?

—তলায় কত পড়ে থাকে এ সময়—

—চল তো দেখি—

এইবার আমরা সবাই মিলে পরামাণিকদের বাগানে ঢুকলাম পুলের তলার রাস্তা

দিয়ে। দুপুর দুটো, রোদ ঝম্ ঝম্ করচে। শরৎকাল, রোদের তেজও খুব বেশি।

গত বর্ষায় আগাছার জঙ্গল ও কাঁটা ঝোপের বেজায় বৃদ্ধি হয়েচে বাগানের মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি পথ। এখানে-ওখানে মোটা লতা গাছের ডাল থেকে নেমে নিচেকার ঝোপের মাথায় দুলচে। আমরা এ বাগানের সব অংশে যাই নি, মস্ত বড় বাগানটা। পাকা রাস্তা থেকে গিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত লম্বা।

পেয়ারাও ছিল কোনো কোনো গাছে। কিন্তু অসময়ের পেয়ারা তেমন বড় হয় নি। ফল আরও যদি কোনো রকম কিছু থাকে, খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারের দিকে চলে গেলাম। বাদাম তো মিললোই না। যা বা পাওয়া গেল, ইঁট দিয়ে ছেঁচে তার শাঁস বের করবার ধৈর্য আমার ছিল না। সুতরাং দলের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। নদীর দিকে বন বেজায় ঘন। এদিকে বড় একটা কেউ আসে না।

খস্ খস্ শব্দে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শেয়াল চলে যাচ্চে। কুল্লো পাখি ডাকচে উঁচু তেঁতুল গাছের মাথায়। আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করচে।

আমাদের স্কুলের ছেলেরা কানে হাত দিয়ে গায়—

ঠিক দুক্‌খুর বেলা—
ভূতে মারে ঢ্যালা—
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি—

সঙ্গে সঙ্গে তারা অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এসব করলে নাকি ভূতের ভয় চলে যায়।

আমার সঙ্গে কেউ নেই—ঠিক দুপুর বেলাও বটে! মন্তরটা মুখে আউড়ে হাঁটু গেড়ে বসবো? কিন্তু ভূতের নাম রসি হোল কেন, শ্যামও হতে পারতো, কালো হোতে পারতো, নিবারণ হোতেই বা আপত্তি কি ছিল?

একটা বাঁক ঘুরে বড় একটা বাঁশবন আর নিবিড় ঝোপ তার তলায়।

সেখানটায় গিয়ে আমার বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

একটা আমড়া গাছের তলায় ঘন ঝোপের মধ্যে আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে আছে বরো বাগদিনী।

ভালো করে উঁকি মেরে দেখলাম। হ্যাঁ, ঠিক—বরো বাগদিনী বটে, সর্বনাশ!

সে যে মরে গিয়েছে।

বরো বাগদিনীর বাড়ী আমাদের গাঁয়ের গোঁসাই পাড়ায়। অশত্থতলার মাঠে একখানা দোচালা কুঁড়ে ঘরে সে থাকতো, কেউ ছিল না তার। পাল মশায়ের বাড়ী ঝি-গিরি করতো অনেক দিন থেকে। তারপর তার জ্বর হয়, এই পর্যন্ত জানি। একদিন তাকে আর দেখা যায় না।

মাস দুই আগের কথা। একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল বাঁওড়ের ধারে বাঁশবনে—শেয়াল কুকুরে তাকে খেয়েছে অনেকটা। সেই রকমই কালো রোগা-মত দেহটা, বরো বাগদিনীর মতো। সকলে বললে, জ্বরের ঘোরে বাঁওড়ে জল তুলতে গিয়ে বরো গিয়েচে।

সেই বরো বাগদিনী আমড়া গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে দিব্যি বসে!

আমি এক ছুটে বনবাগান ভেঙে দিলাম ছুট পাকা রাস্তার দিকে। যখন বাদামতলায় দলের মধ্যে এসে পৌঁছলাম তখন আমার গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

ছেলেরা বললে—কি হয়েছে রে? অমন কচ্ছিস কেন?

আমি বললাম—ভূত।

—কোথায় রে? সে কি? দূর—

—বরো বাগদিনী বসে আছে ঝোপের মধ্যে আমড়াতলায়—সেই নদীর ধারের দিকে। স্পষ্ট বসে আছে দেখলাম।

—সে কি রে? তা কখনো হয়?

—নিজের চোখে দেখলাম। একেবারে স্পষ্ট বরো বাগদিনী—

--দূর—চল তো যাই—দেখি কেমন? তোর মিথ্যে কথা--

সবাই মিলে যেতে উদ্যত হোল--কিন্তু সেই সময় দলের চাঁই নিমাই কলু বললে—না ভাই। ওর কথায় বিশ্বাস করে অতদূর গিয়ে স্কুলে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এতক্ষণ মাস্টারদের ঘুম ভেঙেছে। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতের বহর জানো তো! সে ঠ্যালা সামলাবে কে? আমি ভাই যাবো না—তোমরা যাও—ওর সব মিথ্যে কথা—

ছেলের দলের কৌতূহল মিটে গেল হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের বেতের বহর স্মরণ করে। একে একে সবাই স্কুলের দিকে চললো। আমিও চললাম।

আমরা গিয়ে দেখি মাস্টার মশায়দের ঘুম খানিক আগেই ভেঙেচে—ওঁদের গতিক দেখে মনে হোল। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার আমাদের শূন্য ক্লাস রুমের সামনে অধীরভাবে পায়চারি করছিলেন—আমাদের আসতে দেখে বলে উঠলেন—এই যে! খেলা ভাঙলো?

আমরাও বলতে পারতাম, আপনার ঘুম ভাঙলো? কিন্তু সেকথা বলে কে? তাঁর রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে আমরা তখন সবাই এতটুকু হয়ে গিয়েছি।

ক্লাসে ঢুকেই তিনি হাঁকলেন—রত্না! অর্থাৎ আমি এগিয়ে গেলুম।

—কোথায় থাকা হয়েছিল?

আমি তখন নবমীর পাঁঠার মতো জড়সড় হয়ে কাঁপচি। এদিকে বরো বাগদিনী ওদিকে হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার। আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে উঠেচে! কিন্তু শেষ অস্ত্র ছিল আমার হাতে, তা ত্যাগ করলাম।

বললাম—পণ্ডিত মশাই, দেরি হয়ে গেল কেন ওরা জানে। এই সর্ব পরামাণিকের বাগানে বাদাম কুড়ুতে গিয়ে ভূত দেখেছিলাম—তাই—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টারের মুখে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক যুগপৎ ফুটে উঠলো। বললেন—ভূত? ভূত কি রে?

—আজ্ঞে, ভূত—সেই যারা—

—বুঝলাম বাঁদর। কোথায় ভূত? কি রকম ভূত?

সবিস্তারে বললাম। আমার সঙ্গীরা আমায় সমর্থন করলে। আমায় কি রকম হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখেছিল, বললে সে কথা। হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার ডেকে বললেন—শুনচেন দাদা?

রাখাল মাস্টার তামাক খাওয়ার যোগাড় করছিলেন, বললেন—কি?

—ওই কি বলে শুনুন। রত্না নাকি এখুনি ভূত দেখে এসেচে সর্ব পরামাণিকের বাগানে।

—সর্ব পরামাণিক কে?

—আরে, ঐ শ্রীশ পরামাণিকের বাবার নাম। ওদেরই বাগান।

আবার বর্ণনা করি সবিস্তারে।

রাখাল মাস্টার গোঁড়া ব্রাহ্মণ,—হাঁচি, টিকটিকি, জল-পড়া, তেল-পড়া সব বিশ্বাস করতেন। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলেন—তা হবে না? অপঘাত মৃত্যু—গতি হয় নি—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার একটু নাস্তিক প্রকৃতির লোক। অবিশ্বাসের সুর তখনও তাঁর কথার মধ্যে থেকে দূর হয় নি। তিনি বললেন—কিন্তু দাদা, এই দুপুর বেলা, ভূত থাকবে বাগানে বসে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে!

—তাতে কি? তা থাকবে না ভূত এমন কিছু লেখাপড়া করে দিয়েচে নাকি? তোমাদের আবার যত সব ইয়ে—

—আচ্ছা চলুন গিয়ে দেখে আসি!

ছেলেরা সবাই সমস্বরে চীৎকার করে সমর্থন করলে।

রাখাল মাস্টার বলেন,—হ্যাঁ, যত সব ইয়ে—ভূত তোমাদের জন্যে সেখানে এখনো বসে আছে কিনা? ওরা হোল কি বলে অশরীরী—মানে ওদের শরীর নেই—ওরা মানে বিশেষ অবস্থায়—

হাঁড়ি-বেচা-মাস্টার বললেন—চলুন না দেখে আসি গিয়ে কি রকম কাণ্ডটা, যেতে দোষ কি?

আমরা সকলে তো এই চাই। এ'রা গেলে এখুনি ইস্কুলের ছুটি হবে এখন। সেদিকেই আমাদের ঝোঁকটা বেশি।

যাওয়া হোল সবাই মিলে।

হুড়মুড় করে ছেলের পাল চললো মাস্টারদের সঙ্গে।

আমি আগে আগে, ওরা আমাদের পেছনে।

সেই নিবিড় ঝোপটাতে আমি নিয়ে গেলাম ওদের সকলকে। যে-দৃশ্য চোখে পড়লো, তা কখনো ভুলবো না—এত বৎসর পরেও সে দৃশ্য আবার যেন চোখের সামনে দেখতে পাই এখনো!

সবাই মিলে ঝোপ-ঝাপ ভেঙে সেই আমড়াতলায় গিয়ে পেঁছিলাম।

যা দেখলাম, তা অবিকল এই।

আমড়াগাছের তলায় একটা ছেঁড়া, অতি-মলিন, অতি-দুর্গন্ধ কাঁথা পাতা, পাশে একটা ভাঁড়ে আধ ভাঁড়টাক জল। একরাশ আমড়ার খোসা ও আঁটি জড় হয়েচে পাশে—কতক টাটকা, কতক কিছু দিন আগে খাওয়া, একরাশ কাঁচা তেঁতুলের ছিবড়ে, পাকা চালতার ছিবড়ে—শুকনো।

ছিন্ন কাঁথার ওপর জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধা বরো বাগদিনী মরে পড়ে আছে। খানিকটা আগে মারা গিয়েচে।

এ সমস্যার কোন মীমাংসা হয়নি।

আমরা হৈ হৈ করে বাইরে গিয়ে খবর দিলাম। গ্রাম্য চৌকিদার ও দফাদার দেখতে এল। কেন যে বরো বাগদিনী এই জঙ্গলে এসে লুকিয়ে ছিল নিজের ঘর ছেড়ে—এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! কেউ বললে, ওর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কেউ বললে, ভূতে পেয়েছিল।

কিন্তু বরো বাগদিনী মরেছে অনাহারের শীর্ণতায় ও সম্ভবত আশ্বিন কার্তিক মাসের ম্যালেরিয়ায় ভুগে। কেউ একটু জল দেয়নি তার মুখে।

কে-ই বা দেবে এ জঙ্গলে? জানতোই বা কে?

বরো বাগদিনীর এ আত্মগোপনের রহস্য তার সঙ্গেই পরপারে চলে গেল।

বাঘের মন্তর

বাইরে বেশ শীত সেদিন। রায়বাহাদুরের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বেশ গল্প জমেছিল। আমরা অনেকে ছিলাম। ঘন ঘন গরম চা ও ফুলুরি মুড়ি আসাতে আসর একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছিল।

রায়বাহাদুর অনুকুল মিত্র একজন মস্ত বড় শিকারী। আমরা কে তাঁর কথা না শুনেছি? তাঁর ঘর ঢুকে চারিদিকে চেয়ে শুধু দেখবে মরা বাঘ ও ভালুকের চামড়া, বাঘের মুখ ভালুকের মুখ বাঁধানো—ঘরগুলো দেখে মনে হয় ট্যাক্সিডারমিস্টের কারখানায় বুঝি এসে পড়লাম।

কিন্তু সেদিন আর-একজন লম্বা মত প্রৌঢ় ব্যক্তিকে রায়বাহাদুরের অতি কাছে বসে থাকতে দেখে ও শিকার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। রায়বাহাদুরের সামনে শিকারের কথা বলে এমন লোক তো আজও দেখিনি। যে অনুকুল মিত্র জীবনে ত্রিশটি রয়েল বেঙ্গল পনেরোটি লেপার্ড মেরেছেন, ভালুক ও বুনো শুয়োরের তো লেখা-জোখা নেই—এছাড়া আছে গণ্ডার, আছে বাইসন, আছে অজগর পাইথন, আছে শজারু, আছে কাক বক হাঁস, এ-হেন রায়বাহাদুরের পাশে বসে শিকারের কথা বলা! নাঃ, লোকটা কে হে? বড় কৌতূহল হল জানবার।

উপেনবাবু, আমাদের উপেন মাইতি আপন মনে চা খেয়েই চলেছেন, তাঁকে দেখে বললাম—ও উপেনবাবু, ঐ লোকটি কে?

উপেনবাবু যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—অ্যাঁ? কই, কে?

—ঘাবড়াবেন না। ওই আধ-বুড়ো লোকটি কে?

—উনি?

—হুঁ। বলুন না।

—বিজ্ঞ শিকারী নিধিরাম ভট্টাচার্য।

—নামটা যেন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মত শোনালো। আপনি অনায়াসে বলতে পারতেন —নৈয়ায়িক নিধিরাম সার্বভৌম।

—তা শিকারের ব্যাপারে উনি বড় কেউ-কেটা নন। ওঁর 'শিকারযোগ' বই পড়েননি? তিনটে এডিশন হয়ে গেল। আসুন আলাপ করিয়ে দিই।

আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। নিধিরাম ভট্চাজ যে কোনকালে চাল-কলা-বাঁধা পুরুত ছিলেন না তা তাঁর কথাবার্তার ধরনে আগেই বুঝেছিলাম, এখন সেটা আরো ভাল করে জানা গেল। নানা স্থানের বাঘ-ভালুকের শিকার কিভাবে হয় সে গল্প করলেন। রাত্রে কিভাবে গাছের উপর বসে কাটিয়েছেন, কোন্ জঙ্গলে একবার বাঘের মুখে পড়েছিলেন, ইত্যাদি নানা গল্প। লোকটি ভাল গল্প বলতে পারেন। এমন সুন্দর, নিখুঁতভাবে গল্প বলছিলেন যে আমরা ঘটনাবলী যেন চোখের ওপর ঘটতে দেখছি। আরও দেখলাম, নিধিরাম বেশ প্রকৃতি-রসিক ব্যক্তি। জ্যোৎস্না রাত্রি ও বর্ষামুখর শ্রাবণ রাত্রিগুলির এমন সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছিলেন মুখে মুখে! আমি বললাম—একটা কিছু আশ্চর্য ঘটনা বলুন।

নিধিরাম ভট্চাজ বললেন—সবই আশ্চর্য। বনের সব ব্যাপারই আশ্চর্য।

—তবুও।

—তবুও কী? ভূতের গল্প? ভূত দেখিনি কখনো চোখে।

—বিশ্বাস করেন?

—না।

বা-রে, এ আবার অতি অদ্ভুত লোক। বাঙালী হয়ে ভূতে বিশ্বাস করে না এমন লোক তো দেখিনি! পরে কথার ভাবে বুঝলাম তিনি তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী। বললাম—আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে ভূত মানে না?

—তন্ত্রশাস্ত্র আমি পড়িনি। মন্তর-তন্তরের কথা বলছি।

—ও! কিরকম মন্তর-তন্তরের?

—সব বাজে, ভুয়ো।

—ও-ও বাজে?

—একদম।

—আমি একেবারে অতটা যেতে রাজি নই। মন্তরের শক্তি নিশ্চয়ই আছে।

—ঐ করে করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। আপনারা ইংরেজি লেখাপড়া শিখেও এইসব মানেন?

এইবার নিধিরাম ভট্চাজের ওপর আমার শ্রদ্ধা হল। আশ্চর্য মানুষ তো? আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রৌঢ় ব্যক্তি। আমি বললাম—সুন্দরবনে আপনি গিয়েছেন?

—অনেকবার। এই মন্তর-তন্তর সম্বন্ধে সেখানকার একটি ঘটনা বলি।

আমি বেশ এগিয়ে গিয়ে বসলাম তাঁর কাছে। দিনটা এইসব গল্প শুনবার উপযুক্ত বটে।

উনি বলতে লাগলেন:—

সেবার কাকডাঙার ট্যাকে আমাদের বজরা লেগেছিল। আমাদের যিনি শিকারের গুরু, খুলনার উকিল সীতাকান্ত রায়ের ভাইপো শ্যামাচরণ রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কথাটা উল্টে বলা হল। আসলে তাঁর সঙ্গেই আমরা গিয়েছিলাম—নইলে আমাদের অবস্থার লোক আর বজরা কোথায় পাবে বলুন।

যেখানে বজরা বাঁধা হল সেখানটা একটা খালের মুখ। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে এসে এখানে নদীতে পড়েছে কাকডাঙার খাল। খালের দৃশ্য বড় সুন্দর। দুধারে হেঁতাল ঝোপ, বনের মধ্যে গরান আর গোলপাতার গাছ। জলের ধারে টাইগার ফার্নের জঙ্গল। এই

টাইগার ফানে'র জঙ্গলের মধ্যেই সাধারণত বড় বড় বাঘ আত্মগোপন করে থাকে। শ্যামাচরণ রায় ফর্সিতে তামাক খেয়ে নিয়ে আমাদের বললেন—কাকডাঙার-খালে ডিঙি ওঠাও।

ডিঙি বেয়ে আমরা চললাম খালের মধ্যে দিয়ে। সুন্দরবনে যাঁরা কখনো যাননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না এইরকম খাল বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় কী চমৎকার রূপ চোখে পড়ে সুন্দরবনের। কখনো হেঁতাল ঝোপ, কখনো বন্য লেবুর জঙ্গল, গোল গাছের সারি, কোথাও বা বাতাবি লেবুর মত প্রচুর ফল হয়ে আছে। কোথাও বা হলুদ ফুল ফুটে আলো করে আছে বন্য লতা। কেয়া ঝোপে কেয়া ফুল ফুটে বাতাসকে মিষ্টি করেছে।

অনেকে বলেন সুন্দরবন বড় একঘেয়ে। তাঁরা গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে এ বনের চেহারা কখনো দেখেননি, অন্ধকারে দেখেননি সূর্য উঠবার আগে রাঙা আলোয় মোড়া নিস্তব্ধ বনানীর রূপ, শোনেননি এর বিচিত্র বিহঙ্গ-কাকলি। আমার গুরু শ্যামাচরণ রায় এত ভালবাসতেন এই বন যে বাড়িতে বলেছিলেন তিনি মারা গেলে তাঁর দেহটি যেন সুন্দর-বনে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর আত্মা এতে শান্তি পাবে।

আমি বললাম—তিনি বেঁচে আছেন?

—না। বহুদিন দেহ রেখেছেন।

—দেহ কি সমাধিস্থ করা হয়েছিল বনের মধ্যে?

—না। হিন্দুর দেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে গোলমাল হয় সমাজে। তাই হয়নি।

—বড় দুঃখের কথা। তারপর বলুন।

—শুনুন তারপর, কিন্তু একটা কথা, সবটা শেষ হয়ে না গেলে কোন প্রতিবাদ করতে পারবেন না।

—বেশ, বলুন।

নিধিরামবাবু ভালভাবে তামাক টেনে দম নিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে তারপর আবার বলতে লাগলেন:—

অনেক দূর চলে গেলাম খাল বেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, শিকার করার নেশার চেয়েও এই ঘন বনভূমির দৃশ্য আমাকে পেয়ে বসেছিল। যখন প্রায় মাইলখানেকেরও বেশি চলে গিয়েছি নদী থেকে, তখন খালের ধারের বনঝোপের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল—বাবু, ও বাবুরা—

আমরা চমকে উঠলাম। ডিঙির হিন্দু মাঝি বলে উঠল—রাম রাম!

শ্যামাচরণ রায় গলা উঁচু করে ডাঙার দিকে চেয়ে বললেন—আঃ, চুপ কর সবাই। কে ওখানে?

ক্ষীণ স্বরে কে বললে—বাবু আমি।

—কে তুমি? কোথায় তুমি, সামনে বেরিয়ে এস—

—এই যে বাবু আমি, হেঁতাল ঝোপের পাশেই বসে।

সত্যি এতক্ষণ লোকটাকে দেখতে না পাওয়ার দরুন ওর স্বর অশরীরীর কণ্ঠনিঃসৃত বলে ভ্রম হচ্ছিল বটে, এবার লোকটাকে সবাই দেখতে পেলে। ওই তো বসে আছে হেঁতাল ঝোপের ডাইনে। ওকে আগেও দেখা গিয়েছিল, এবার বুঝলাম। কিন্তু আলো-ছায়ায় জলের মধ্যে দিয়ে ওকে গাছের কাটা গুঁড়ির মত দেখাচ্ছিল। আমরা দস্তুরমত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওকে ওখানে একা বসে থাকতে দেখে। সুন্দরবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা বুঝবেন এরকম বনের মধ্যে একা বসে থাকতে বাঘুলেও ভয় পায়।

শ্যামাচরণ রায় বললেন—ও, বেশ। তা ওখানে কী করছ?

—বাবু, হেঁতালের ফল খাচ্ছিলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে। গরিব লোক!

—কথাটার ঠিক জবাব হল না। খিদে পাওয়া তো শরীরের ধর্ম, সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, এ জঙ্গলে ঢুকলে পাকা কুল ছাড়া যে আর কিছু খাবার পাওয়া যায় না তাও ঠিক। কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে?

—বাবু, আমি ফকির মানুষ। ভয়-ডর করলি আমাদের চলে? আমারে একটু নৌকায়

তুলে নেবেন বাবু? কাল-রন্‌ঘাটের ট্যাঁকে আমাকে নাবিয়ে দিলে হেঁটে পীরের দরগায় গিয়ে রাত কাটিয়ে কাল সক্কালে বাড়ি যাব। নেবেন বাবু?

—তোমার বাড়ি সেখানে?

—কাল-রন্‌ঘাটের কাছে মানিক সেনের পাড়ায়।

শ্যামাচরণবাবু কিছু বলবার আগে আমাদের ডিঙির মাঝি দুজন আপত্তি জানিয়ে বললে—নেবেন না বাবু! ডিঙির নিয়ম জানেন তো, সুন্দরবনে চলতি ডিঙিতে পথের লোক তুললে সে বড্ড অপয়া। বাবু যাচ্ছেন যখন একটা শুভ কাজে—

শ্যামাচরণবাবু রেগে বললেন—তোদের কী বুদ্ধি!

—কেন বাবু?

—আমার শিকার হোক আর না হোক, ওকে এখানে ফেলে যাব বাঘের মুখে? নিয়ে চল ওকে।

আর এর পরে কী কথা চলবে? ডিঙি থামিয়ে তাকে উঠিয়ে নেওয়া হল। আমাদের মনে হল লোকটা একজন ফকির। সাজ-পোশাক দেখে অন্তত তাই আমার মনে হয়েছিল। হিন্দু কি মুসলমান, বাইরের সাজ দেখে বোঝা শক্ত। আমরা চুপ করে আছি। শ্যামাচরণ রায় বললেন—কী সাধনা?

—বাঘ আনবার মন্তর জানি কিনা, তার সাধনা।

আমি বললাম—সেটা আবার কী?

—আছে বাবু। আমার গুরু আমায় শিখিয়েছেন।

শ্যামাচরণবাবু বললেন—হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকো?

—না বাবু। মন্তরে বাঘ আসবে।

—আমরা শিকার করতে চলেছি। তুমি বাঘ এনে দিতে পারলে দশ টাকা বকশিশ পাবে।

—বাবু! আপনার দয়া!

—ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে না।

—ও কথাই বলবেন না বাবু।

লোকটাকে আমরা ততক্ষণে সবাই ঘিরে বসেছি। শ্যামাচরণবাবু বললেন—সুন্দরবনে এক-একজন লোক আছে, যারা শিকারীর সামনে বাঘ হাজির করে পয়সা রোজগার করে। তারা তো হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকে জানি। তুমি সে দলের নও?

—আপনাকে আগেই বলেছি বাবু। মন্তর আসল জিনিস। বাঘ টেনে আনে।

এই সময় আমরা নিধিরাম ভট্‌চাযকে জিজ্ঞাসা করলাম—হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকার ব্যাপারখানা বুঝলাম না তো?

নিধিরামবাবু আমাদের বুঝিয়ে দিলেন—

এক শ্রেণীর লোকের পেশা হচ্ছে এই। তারা ঝোপের মধ্যে বসে হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে বাঘের আওয়াজ নকল করে ডাকে, তাতে নর-বাঘ সেখানে ছুটে আসে এবং শিকারীর বন্দুকের পাল্লায় ধরা দেয়। পাঁচ টাকা ছিল ওদের ফি যুদ্ধের আগে। এখন কত জানি না।

আমরা বললাম—এমনভাবে বাঘ আসতে আপনি দেখেছেন?

—অনেক দেখেছি। তবে সব সময় সফল হয় না ওদের চেষ্টা। বাঘ হয়ত সে জঙ্গলে নেই কিংবা কাছে নেই। নয়তো মানুষের সাড়া পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। সে অবস্থায় কী হবে?—তারপর শুনুন। আমি ঘুন শিকারী, মন্তরে বাঘ এনে দেয় এমন কথা কখনো শুনিনি। শিকার কত এগিয়ে গেল তাহলে ভাবুন তো? শিকারের শখ যাঁদের আছে তাঁরা জানেন একটা জ্যান্ত বাঘের পেছনে কী খাটুনিটাই মশাই তাকে শিকার করতে হয়। জঙ্গল ঠ্যাঙাও, নয়তো মাচান বেঁধে রাত জাগো। সোজা কষ্ট মশায়? আর সে জায়গায় যদি মন্তরে বাঘ আসে, তবে শিকার কত সোজা হয়ে গেল বলুন! পাঁচের জায়গায় দশ টাকা দিতে কেন তারা আপত্তি করবে?

—ঠিক কথা। বলুন আপনি।

তারপর ঘণ্টা দুই কেটে গেল, কাকডাঙার খালের মাজায় এসে আমরা নোঙর করলাম।

—মাজায় মানে কী?

—খালের অর্ধেকটা পার হয়ে এসে।—সন্ধ্যে হয়ে এল। আমরা সাহস কবলাম না এখন ডাঙায় নামতে। রাত্রের খাবার সঙ্গে করে আনা হয়েছিল, তাই খেয়ে সবাই ডিঙিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম। সমস্ত রাত উত্তেজনায় শ্যামাচরণবাবুর ঘুম নেই চোখে। তিনি শুধু বসে বসে ফকির সাহেবের আজগুবী মন্তরের কথা শুনছিলেন—সে কতবার সাধনা করেছে বনের মধ্যে এই বাঘ আনার জন্যে। গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে বসে এই মন্তরের সাধনা করাই তার কাজ। আরও কত কি যে বাজে গল্প! সারাদিন খেটেখুটে রাতে যে একটু ঘুমুবে, তার উপায় নেই।

কিন্তু শ্যামাচরণ রায় স্বয়ং ফকির সাহেবের মুরুব্বি। তাঁর কথার উপর কথা বলবে কে? আমরা চুপচাপ শুয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করলাম। শেষরাতের দিকে খানিকটা কৃতকার্য যে হইনি তাও নয়।

আমি বললাম—একটা কথা। আপনারা কাকডাঙা খালের মাঝামাঝি এলেন কেন? বজরা ছেড়ে আসার হেতু কী?

হেতু খুব স্পষ্ট। বজরায় বসে তো শিকার চলবে না! বজরা আছে নদীতে, তার একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে কূলকিনারা দেখা যায় কি না যায়। ছোট খালের মধ্যে না গেলে দুদিকের জঙ্গল তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না। তুমি তো জঙ্গলে চড়ুইভাতি করতে আসনি?

নিধিরাম ভট্‌চাজ একটু তর্কপ্রিয় লোক। কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ পাছে করে এই আশঙ্কায় সর্বদাই কোমর বেঁধে তর্কের জন্য তৈরি হয়ে থাকেন এবং গল্প শুরু করবার সময়ে কেন যে বলেছিলেন আমার কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত, এখন তা বুঝলাম। আমরা তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—আপনাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছি জানবার আগ্রহে, আপনার গল্পের খুঁত ধরবার জন্য নয়। বলে যান আপনি।

নিধিরাম ভট্‌চাজ বললেন—খুব ভাল কথা। শোন তারপরে। আমার এ গল্প শেষ হয়ে এসেছে। যা কিছু প্রতিবাদ করবার গল্পের শেষে করতে তো তোমাদের বলছি।

ডিঙি নোঙর করে সারারাত্রি সেখানে থাকবার সময়ে সে-রাত্রেই বুঝতে পারা গেল, কী ভয়ানক জায়গায় আমরা এসেছি। জ্যোৎস্না রাত্রির আলো-ছায়া বার বার কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল বাঘের গর্জনে। কাকডাঙার খাল সম্বন্ধে শ্যামাচরণ রায় বিবেচনায় ভুল করেননি। ভোরে উঠে শ্যামাচরণবাবুকে বললাম—চমৎকার জায়গায় এসেছেন!

শ্যামাচরণ রায় বললেন—কাঁচা শিকারীর কথা হয়ে গেল!

—আজ্ঞে কেন?

—বনের বাঘ আর শিকারীর বাঘ এক নয়। ওরকম বাঘ ডাকে সুন্দরবনের বহু জায়গায়। কিন্তু চোখে দেখতেও পাবে না কোনদিন একটি। তাই তো ফকির সাহেবকে ধরেছি। এখন ফকির সাহেবের দয়া—

—আর আপনার হাতযশ—

সকালের রোদ বেশ উঠলে আমরা সবাই ডিঙি থেকে নেমে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আধমাইলটাক দূরে একটা ফাঁকা জায়গা আছে বনের মধ্যে, তাকে বলে হাতল বাদিয়ার ডাঙা। সেখানে আমরা রান্না করে খাব দুপুরে।

আমরা জিনিসপত্র নিয়েই নামলাম, নয়তো কে আবার এ বনের মধ্যে দিয়ে ডিঙিতে ফিরবে রান্নার জিনিস নিতে। মাঝি দুজনকেও সঙ্গে নিলাম, এ নির্জন জঙ্গলে তারা দুটি প্রাণী ডিঙিতে বসে থাকতে রাজি নয়।

দুদিকে ঘন গরান আর হেঁতালের জঙ্গল, টাইগার ফার্নের ঘন সমাবেশ, পা বাঁচিয়ে চলতে হয় শুলোর ভয়ে। শুলো হল গাছের বায়ব্য শিকড়, কাদা থেকে মাথা তুলে তীক্ষ্ণ। সড়কির মত খাড়া হয়ে থাকে, ঝরা পাতার তলায় পা দিলেই রক্তপাত। দু-ধারে বন,

মাঝখান দিয়ে জুড়ি পায়ে চলার পথটা।

ফকির সাহেব সকলের আগে, তার পেছনে গুরুজী শ্যামাচরণ রায়, তাঁর পিছনে দুজন লোক, তারপর আমি, সর্বশেষে মাঝি দু'জন।

হঠাৎ এক জায়গায় কি একটা শব্দ হল, শ্যামাচরণবাবু ও লোক দু'জন চমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম, ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে এগিয়ে গেলাম।

বললাম—কী হল? থামলেন যে?

সেই সময় নজর পড়ল, দলের পুরোভাগে ফকির সাহেব ছিলেন, তিনি নেই। বলতে যাচ্ছি—ফকির সাহেব বুঝি—

শ্যামাচরণবাবু বললেন—উঃ সর্বনাশ! এমন কাণ্ড কখনো—উঃ!

তাঁর পেছনের লোকদুটি তখনো আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে। একজন বললে—উঃ! বাবুর ডান পাশের ঝোপ থেকেই তো—

শ্যামাচরণবাবু আড়ষ্ট গলায় বললেন—আহা, গরিব লোক! আমিই মন্তর আওড়াতে বলেছিলাম ওকে মনে মনে—

ব্যাপার তখনি শুনলাম। ডানদিকের টাইগার ফার্নের বন থেকে ভীষণ এক রয়্যাল টাইগার লাফিয়ে পড়ে ফকির সাহেবকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

চেয়ে দেখে মনে হল বাঁ দিকের হেঁতাল ঝোপের মাথা যেন তখনো নড়ছে।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললাম—তারপর? পাওয়া গেল ফকির সাহেবকে?

—তা কখনো যায়! ওই শেষ। একটা হিংলাজের দানার মালা কেবল একটি হেঁতালের ডালে বেধে ঝুলছিল। আমরা অনেক খুঁজেছিলাম। শ্যামাচরণ রায় বড় শিকারী, বাঘের ধরন-ধারণ তাক-বাক অনেক কিছু জানেন। কিছুই করতে পারলেন না। নামও জানিনে ফকির সাহেবের যে কাউকে কোথায় খবর দেব।

আমার গুরুজী শ্যামাচরণ রায় বলতেন, লোকটি সত্যিই গুণী ছিল। মন্তরের জোরে বাঘ আকর্ষণ সে ঠিকই করেছিল, আমার অসতর্কতায় মারা পড়ল ও। বাঘকে আকর্ষণ করতেই শিখেছিল, বাঘের হাত থেকে বাঁচার মন্তর তো শেখেনি!

অপরাহ্নের দিকে আমরা খোঁজাখুঁজি শেষ করে কাকডাঙার খাল বেয়ে বজরা ধরলাম নদীতে। মন সবারই এত খারাপ হয়ে গেল যে সেবার আমাদের শিকারে আর কোন উৎসাহই রইল না। শ্যামাচরণবাবুকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—গুরুজী, ফকির সাহেবকে দলের আগে আগে যেতে কে বলেছিল? আপনি তো জানেন নিরস্ত্র অবস্থায় আগে আগে ওভাবে যেতে নেই? শ্যামাচরণ রায় বলেছিলেন—বিশ্বাস করিনি যে। বোগাস বলে ভেবেছিলাম তোমাদের মত!

হাবু—নাপিতের ছেলে, সুতরাং রীতিমত তার বুদ্ধি।

পায়রাগাছির গুণীন্ রোজা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সে নাকি মন্ত্রবলে সাপ হতে পারে, বাঘ হতে পারে, কী না হতে পারে! লোহার সিন্দুকে কিংবা বাড়ীতে বড় বড় হব্‌সের চব্‌সের কুলুপ লাগানো আছে—পায়রাগাছির রোজা (ওঝা) এসে কি একটা মন্তর বিড়বিড় করে বলে দুবার তালা ছম্‌ছম্ করে নাড়লে, আর তালা সব গেল বেমালুম খুলে। এ কত লোকের স্বচক্ষে দেখা। রায়েদের কলম আমবাগানে বিকেল বেলা কেউ কেউ নাকি দেখেছে রোজা কলমের আম পাড়ছে—হয়তো লোকে ধরতে গিয়ে দেখলে একটা খরগোস লাফাতে লাফাতে বাগানের উত্তরদিকের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

পায়রাগাছির রোজা! মস্ত বড় নাম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এত বড় নাম-করা রোজা যে, তাকে কেউ কখনও দেখে নি। কোথায় যে কখন কি ভাবে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না।

হাবুর বড্ড ইচ্ছে সে কিছু মন্তর-তন্তর শেখে। এ তার অনেক দিনের ইচ্ছে। এখন তার বয়স আঠার-উনিশ। যখন তার বয়স চোদ্দ-পনের তখন থেকে সে যেখানেই শুনেছে রোজা গুণীন্ এসেছে অমনি তার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছে। একবার তাদের পাশের গ্রামের হাইস্কুলে একজন বড় জাদুকর এসে নানারকম তাসের খেলা, টাকার খেলা দেখালে। একটা তাস বেমালুম গোলাপ ফুল হয়ে গেল, এর মুঠোবাঁধা হাতের টাকা ওর হাতে গেল, এক গ্লাস জল হয়ে গেল মিষ্টি শরবত।

তাদের গাঁয়ের দু-চারজন লোকের সঙ্গে হাবুও গিয়েছিল খেলা দেখতে। একখানা তাসকে তার চোখের সামনে গোলাপ ফুল হতে দেখে সত্যি সে কি আশ্চর্যই না হয়ে গিয়েছিল!

ফেরবার পথে সন্ধে হয়ে এসেছে। ওর কি রকম গা ছম ছম করতে লাগল।

কালী স্যাকরা দলের মধ্যে প্রবীণ। হাবু বললে—আচ্ছা কালী জেঠা, ওসব কি করে করলে?

কালী স্যাকরা একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গি করে বললে—আহা, ওসব তো সোজা!

—সোজা, কালী জেঠা?

—খু-উব সোজা।

—কি রকম সোজা?

—ওসব মন্তর-তন্তরের কাণ্ড। আমি ইচ্ছে করলে পারি।

—তুমিও পার?

—কেন পারব না?

—একদিন করে দেখাবে জেঠা?

—হুঁ হুঁ, যা। সময় হলে দেখাব। ও কিছুই নয়।

কালী স্যাকরার কথায় কিন্তু হাবুর বিস্ময়বোধ দূর হল না। সে গিয়ে জাদুকরকে পরদিন সকালে পাকড়ালে। সোজাসুজি তাঁকে জানালে সে ঐসব খেলা শিখতে চায়। শাগরেদ হতে সে রাজী আছে। জাদুকর কলকাতার লোক, মাথায় নরম বুরুশ দিয়ে চুল আঁচড়ে থাকেন, হাতে ঘড়ি পরেন, চোখে থাকে চশমা। তিনি নাক উঁচু করে বললেন—ওসব হয় না হে ছোকরা, হয় না। অনেক টাকার খেলা, অনেক টাকা প্রিমিয়াম দিলে তবে শাগরেদ করি।

হাবু বললে- -প্রিমিয়াম কি?

—প্রিমিয়াম টাকা হে, টাকা পারবে আমায় দিতে?

মরীয়া হয়ে হাবু বললে—আজ্ঞে কত টাকা?

—একশ'।—পারবে দিতে?

—আজ্ঞে না। অত টাকা কখনও একসঙ্গে দেখি নি।

—তবে ফিরে যাও। এসব অমনি হয় না।

—কিছু কম করে নিন—

—দু'শ করে প্রিমিয়াম নিই, তোমায় একশ বলেছি!

হাবু সেখান থেকে সরে পড়ল। অত টাকার সিকিও দেবার ক্ষমতা নেই তার। জাদুবিদ্যা শেখবার সৌভাগ্য কি সকলের ঘটে!

কেটে গেল বছর তিনেক। এই তিন বছরে তার জীবনে নতুন কিছু ঘটল না। এ অজ-পাড়াগাঁয়ে জীবন এক-রঙা ছবির মত একঘেয়ে।

ঠিক এই সময়ে একদিন হাবু দুপুরে মাছ ধরতে গেছে নদীতে, এমন সময়ে দেখলে একটা লোক আমবাগানের ছায়ায় বসে আপন মনে কতকগুলো ঢিল নিয়ে খেলছে। হাবু

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে লোকটা একটা ঢিল হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিতেই সেটা মস্ত বড় একটা কোলা ব্যাং হয়ে গেল, লাফিয়ে লাফিয়ে পালাল। আর একটা ঢিল ছুঁড়তেই সেটা হয়ে গেল একটা ছেলেদের দু টাকার খেলনাগাড়ী, কিন্তু সে গাড়ী গড়গড় করে গড়িয়ে চোখের বাইরে অদৃশ্য হল, আর একটা ঢিল হিল হিল করতে করতে একটা সাপ হয়ে চলে গেল, একটা ঢিল একমুঠো আবীর হয়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে মাটি রাঙিয়ে দিলে। হাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা ওর মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে বললে—কি?

স্তম্ভিত ও ভীত হাবু কোন কথা না বলে একেবারে লোকটার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল।

গাছতলায় লোকটা নেই।

হাবু বিভ্রান্ত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। অত বড় আমবাগানের কোথাও সে নেই! দু মিনিট হাবু দাঁড়িয়ে রইল আড়ষ্ট হয়ে। হঠাৎ সে দেখলে হাত দশেক দূরে সেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

হাবু কাতর কণ্ঠে বললে—আমাকে দয়া করুন।

—কি দয়া?

—পায়ে ঠেলবেন না এমন করে। আমাকে আপনার চাকর করে রেখে দিন। আমি অনেক ভাগ্যে আপনার দেখা পেয়েছি।

—আমি গরিব লোক, চাকরে আমার কি দরকার। তাছাড়া আমার হাতে অনেক চাকর। এই দেখ—বলেই লোকটা একটা ঢিল গাছের ওপরের ডালের দিকে অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে মারতেই ঝর ঝর করে একরাশ আম পড়ল। হাবু একেবারে স্তম্ভিত। আম আসে কোথা থেকে এই কার্তিক মাসে? পাড়াগাঁয়ে কোন গাছেই এ সময়ে আম তো দূরের কথা, আমের বউলও নেই। পাকা আম ঝুড়িখানেক তার সামনে!

লোকটা বললে—খাবার জল? এই—

যেমন একটা ঢিল ছোঁড়া, অমনি গাছের গুঁড়ির এক জায়গা একেবারে ফুটো হয়ে কলের মুখে যেমন জল পড়ে তেমনি জল পড়তে লাগল। লোকটা হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে বললে—খাও—ভাল জল।

হাবু কাতর সুরে বললে—আমায় শাগরেদ করে রাখুন!

—কি সর্বনাশ! শাগরেদ? আমি ওস্তাদ নই।

—আমায় দয়া করুন।

লোকটি হি হি করে হেসে উঠল। ও কি! মুখের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল নীল বেগুনি রঙের ডানাওয়ালা প্রজাপতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।...লোকটা কে?

এর উত্তর লোকটা দিলে। বললে—পায়রাগাছি জান? উত্তর দিকে। আমার সঙ্গে সেখানে দেখা ক'রো।

হাবু হাঁ করে রইল। ইনি তবে পায়রাগাছির সেই গুণীন্! সবাই বলে, উনি 'নুটি মন্তর' জানেন, অর্থাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হতে পারেন। আজ সে নিজে তার প্রমাণ পেয়েছে! হাবু হাত জোড় করে বললে—আমায় দয়া করুন।

পায়রাগাছির রোজা এবার নরম সুরে বললে—শেখাতে পারি নুটি মন্তর, কিন্তু ছোকরা, তুমি এ পথে কেন? এ পথে কেবল তারাই আসতে পারে যাদের কামনা ক্ষয় হয়ে গেছে। কত লোভের পথ খুলে যাবে—দেখ। আচ্ছা বোসো', দিচ্ছি তোমায় মন্তরটা শিখিয়ে।...

কিছুদিন কেটে গেল।

হাবু এখন নুটি মন্তর শিখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে শিখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করলে সে একজন ভীষণ চোর। যে ঘরে যায়, ভাল ভাল জিনিস সব চুরি করতে ইচ্ছে হয়। খাবারের দোকানে গেলে ইচ্ছে হয় খাবারের হাঁড়ি ফাঁক করে। সে যে চোর, তা সে কখনও জানত না। একদিন এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখলে, মস্ত বড় একটা

ইলিশ মাছ এনেছে বন্ধুর বাবা। রোয়াকে সেটা পড়ে আছে, বন্ধুর মা ঘরে ঢুকেছেন বঁটি আনতে। ওর লোভ হল মাছটাকে নিয়ে দৌড় দেয়!

হাবু ভয়ে তখনই দৃশ্যমান হয়ে গেল!

বন্ধুর মা ওকে দেখে বললেন—ওমা, হাবু কোথা দিয়ে এলি? তোকে তো দেখলাম না দরজা দিয়ে আসতে? এই মাত্তর তো ঘরে বঁটি আনতে গিয়েছি।

হাবু হেসে চুপ করে রইল।

একদিন আরও গুরুতর ব্যাপার ঘটল। পাড়ার গাঙ্গুলিরা বড়লোক, তাদের বাড়ীর ওপরের তলায় খাটে একছড়া দামী সোনার হার কে ফেলে রেখেছে। হাবু কৌতূহল-বশত গাঙ্গুলিদের তেতলায় অদৃশ্য অবস্থায় বেড়াতে গিয়ে লোভ সামলাতে না পেরে সেই হার হাতে নেমে এল। সেও অদৃশ্য, তার কাছে যে জিনিস থাকবে তাও অদৃশ্য। কেউ কিছু টের পেলে না।

তার পর যখন জানা গেল হার চুরি গিয়েছে, তখন গাঙ্গুলিদের বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। গাঙ্গুলিদের বড় মেয়ের হার সেটা, তার সে কি কান্না? সবাই মিলে তাকে অপমান উৎপীড়ন করতে লাগল, সে কেন এত অসাবধান, কেন সে হার খাটের উপর ফেলে রেখেছিল। অবশেষে সন্দেহ গিয়ে পড়ল এক বৃদ্ধ দাসীর ওপর। তার ওপর শুরু হল নির্যাতন। পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হতে লাগল।

কিন্তু হাবুর সবচেয়ে অসহ্য হল গাঙ্গুলিদের মেয়ের সেই হাপুস নয়নে কান্না। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর স্বামীর বনিবনাও সেই। বাপের বাড়ী পড়ে থাকে। এমন মেয়ের কোন মান থাকে না বাপের বাড়ী। বৌদিদিরা একেই তো তাকে দাঁতে পেষেন, তার ওপর সে বাপের দেওয়া হারছড়া খুইয়ে ঘোর অপরাধে অপরাধিনী।

হাবু অদৃশ্য হয়ে সব দেখছিল, হারও তার পকেটেই ছিল। আর সহ্য করতে না পেরে হারছড়াটা সে বালিসের তলায় রেখে দিলে। সেখান থেকে সেই মেয়েই প্রথম হার আবিষ্কার করলে। তখন কি হাসি তার মুখে!

'তা তো হল, কিন্তু হাবু পড়ে গেল মহা বিপদে।

সে চোর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত? এ কি ভয়নক প্রলোভনে সে পড়েছে? পদে পদে প্রলোভন, পদে পদে সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাকে। মনের বল ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। লোভ সামলাতে সামলাতে গলদঘর্ম। অদৃশ্য না হয়েও থাকা যায় না, অদৃশ্য হলেও বিপদ। এ কি সর্বনাশা মন্ত্র!

মাসের পর মাস কাটে, এই ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

হাবু ইতিমধ্যে এক বিয়েবাড়ীর ভাঁড়ারে ঢুকে সের খানেক সন্দেশ মেরে দিল। পরক্ষণেই জাগল অনুতাপ—তীব্র অনুতাপ। সে কোথায় নেমে চলেছে দিন দিন! পায়রা-গাছির রোজা এ কি সর্বনাশ তার করে গেল! কিছুতেই অদৃশ্য হবার প্রলোভন সামলানো যায় না। কিছুতেই ভোলা যায় না নুটি মন্তর। নুটি মন্তর তার জীবনের অভিশাপ।

বছরখানেক এভাবে কেটে গেল। কত খুঁজলে পায়রাগাছির রোজাকে—কেউ সন্ধান দিতে পারলে না।

একদিন হাবু সেই আমবাগান দিয়ে যেতে যেতে সেই একই গাছের তলায় দেখলে পায়রাগাছির রোজা সেই রকম ঢিল নিয়ে ছুঁড়ে খেলা করছে। ওর দেহে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল। সন্ধান মিলেছে এতদিন পরে। ও ছুটে এগিয়ে কাছে গেল। ঢিল একটা ব্যাঙ হয়ে লাফাতে লাফাতে পালাল। একটা ঢিল সদ্য-কাটা ধাড়ি ছাগলের মুণ্ড হয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে চলে গেল। এক ঝাঁক ছাতারে পাখী রোজার মুখের মধ্যে থেকে বের হয়ে উড়ে গেল।

হাবু ছুটতে ছুটতে (পাছে রোজা অদৃশ্য হয়ে যায়) গিয়ে ওর পায়ের ওপর পড়ল।

রোজা প্রশান্ত হাসির সঙ্গে বললে—কি হয়েছে?

—আমায় বাঁচান।

—কি ব্যাপার?

—আপনি সব জানেন। আপনি অন্তর্যামী। ওস্তাদজি, নূটি মন্তরের কবল থেকে আমায় উদ্ধার করুন। আমার চরিত্র গেল, মনের শান্তি গেল,—সব গেল। এ আপনি ফিরিয়ে নিন।

রোজা মৃদু মৃদু হেসে বললে—একবার মন্তর দিলে আর ফেরত হয়?—হয় না।

হাবু ভয়ে শিউরে উঠল। তবে কি জীবন-ভোর এই সর্বনেশে মন্তরের ভার বইতে হবে তাকে? এই অশান্তি,—পদে পদে এই পরীক্ষা সারাজীবন চলবে?

হাবু পা আঁকড়ে ধরে বললে—বাঁচান আমায়। আমি মরে যাব।

—তবে চাও না নূটি মন্তর?

—আজ্ঞে না।

রোজা হেসে বললে—তবে যাও, দিলাম না। মোটেই তোমাকে মন্তর দিই নি। পরীক্ষা করছিলাম।

হাবু অবাক। সে কি কথা! এক বছর ধরে তবে সে কিসের ভারবোঝা বয়ে মরল?

সে কি বলতে যাচ্ছিল। রোজা হেসে বললে—মোটে সাত মিনিট কেটেছে। এই প্রথম দেখা তোমার সঙ্গে আমবাগানে। নূটি মন্তর তোমাকে দেওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করছিলাম। আমি আজ বিশ বছর এই মন্তরের ভার বয়ে আসছি, আর তুমি এর দায়িত্ব সাত মিনিটও নিতে পারলে না?

হাবু বললে—তবে আমি গাঙ্গুলিদের বাড়ী হার চুরি করি নি? ময়রাদোকানে খাবার খাই নি চুরি করে? তবে আমি—

—না। মোটে সাত মিনিট কেটেছে। আমার সামনে ছাড়া তুমি কোথায়ও যাও নি। এই তো প্রথম তোমার সঙ্গে আমবাগানে...

বলে কি! হাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়রাগাছির গুণীন্ হা হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চামচিকে তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে থেকে পট্‌পট্ শব্দে বের হয়ে ইতস্তত উড়ে গেল।

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাস্তায় পুরোনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভাল জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ীর গায়ে টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে—

তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়। গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি। আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন। বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ী।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত তার এই বাড়ী?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষীমশায় বাড়ী আছেন?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিল, এখন তাহার যেন অনেকটাই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না, আপনার হ'ল কেমন ক'রে এরকম তো দেখি নি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তবে তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোন অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মনিব্যাগটা খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয়,

প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফাট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ীর ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ীর গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই?

আমার মতো গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছি কি না। লোক পাই নি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে। ভালো ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন এক-খানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলে-ঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।' তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কর্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত

লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাতসাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিক-শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর তো বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর ততক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপ্‌নটিজ্‌মের প্রভাব অক্ষুন্ন রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবুও তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখ নি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চর্চা যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'ল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ী এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম—চন্দ্র-দর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরনের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ীর পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামত নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম, —সব দিন ঘটে উঠ্‌ত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাস-তিনেক পরে প্রথম

জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিক্‌লিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির, মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এই ভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়ীতে আর মন টেকে না। ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয় নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলেছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলুহাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না। সাধু তো কতই দেখি, চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ী কোথায়?

আমি বললাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর? তারপর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেছ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ী-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শুনি নি! সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি ক'রে! খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্‌কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরোনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোন পূর্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন?

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধপিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলেমানুষি কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারি নি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস্ কেন? ধর্মকর্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম করগে যা। এ পথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস্ নি, ছাড়তে পারবিও নে। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয় নি। যা বাড়ী যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্ নে।

কথা শেষ ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি ক'রে জানলেন বলবেন না? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূরে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন

—কেন আসছিস্?

আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্‌দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্যালের কোন হদিস মেলাতে পারলাম না। সান্যালদের বাড়ীর ছেলেছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাই-গুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ী এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটা-হাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি। অন্ততঃ দেড়-শ বছর আগের কথা হবে!

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল। বড় বড় কিস্তি চলত। কোন্ নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে ব'লে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট?

তিনি অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি. বাবার মুখে শুনেছি, ত ছাড়া আমাদের পুরোনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল? বই-টই লিখছ নাকি?

ওদের কাছে কোন কথা বলি নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ী থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি

কণ্ঠে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন্, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার ওপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি।

আঙ্গুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস্, তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখে আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে, না রে? তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ও মা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে। পাগলী আমায় দেখে মারমূর্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া-কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরীয়া হয়েছি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই তো আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে? তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মতো—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যেন উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস্ বল্ তো? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেছিস্, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার। বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধ-বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য ব'লে মনে হয় নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি তো অবাক্! ইতস্ততঃ করছি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি এক রকম অসম্বন্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায়

মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েছে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বল্‌লে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছে শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসিহাসি মুখে বলছে—রাগ করিস্ নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক্, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাদু করলে নাকি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন! বললে—আবার এসেছিস্ দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে? দিনে অপমান ক'রে বিদেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ রকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম ব'লে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা দিবি। ভোর-রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যা হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পার। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে! ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস্ কেন রে, অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা

ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে হৌসে চাকরি কর্ গিয়ে —বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাব, তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না, এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী ব'লে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম, তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেলা গালাগাল দিয়েছি, কিছু মনে করিস নে। ভালোই হয়েছে, তুই সাধনা করতে চাস্ নি। ও সব নিম্ন-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক্ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকে কতক-গুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা!

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া ব'লে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মতো মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনী-মন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে, তাই রাগ করিস্।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তা'হলে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ ক'রে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক, মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপ্‌সা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই কি, না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল্ না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢ'লে পড়ে আর কি। বললে—এস না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব'লে মনে হ'ল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, এ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস, ব'স।

বললাম—তুমি ও রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোন ভয় দেখিও না, যখন তোমায় মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্ তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর্। কিন্তু যা ব'লে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোন কালেই, তবুও

কখনও মড়ার উপর ব'সে সাধনা করব এ-কল্পনাও করি নি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাংগামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন্ ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হাল্কা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোন তফাত নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, ও আপদ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিগ্‌বিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একটা টাটকা মড়ার ওপর ব'সে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সংগে সংগে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সংগে সংগে আমার মনে হ'ল, শ্মশানের নিচে নদীজল থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা,

বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব কর্‌রা পাখি, বীরভূম নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল—তাই বল! হরি হরি! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয়নি—পরক্ষণে আমার চারপাশে মেয়েগলায় কারা খলখল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।...আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনটার মাথার খুলি ফুটো, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা, হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? যা হোক্, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেছি অনেক সাধনা ক'রেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি...বললাম—আমার মহা-সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন...আমার জীবন ধন্য হ'ল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করছ কেন?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। যখন দেখা দিয়েছি তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা...তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর ক'রে বললাম—সাধনা ক'রে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমার মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার

গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।...যদি অপরাধ কাঁর মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোননি তন্ত্রে? পাষণ্ড-দলনের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার যন্ত্রে দিব্যৌঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে...অত ভয় কিসের! আমি না তোকে লাথি মেরেছি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি? তোকে পরীক্ষা না ক'রে কি সাধনার নিয়ম ব'লে দিয়েছি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল!

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাত নেই। একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস্ কি?

আমি কথার উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ ক'রে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলীও নাকি?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কাল হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকে বেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালের হাড়, কোনটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলেছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ!

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মতো, আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুথালু বেশে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা-মেঘে ছেয়ে গেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাত্রে! শেয়ালের চিৎকার ও নর-কঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দু-চোখে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে

কি ভীষণ ক্রুর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেছে ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে! ছাপ্পান্ন বছর...কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশাহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পূবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী ব'সে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে...সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করছে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস্ না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা। তুই তার জানিস্ কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধস্বরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকট-মূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস্, তিনি মহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন?

তারপরে সে হঠাৎ হি হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে এলি? এই তো সবে সন্ধ্যে—'

—আঁ!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক, —সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম

নয়, তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভৈরব নিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন?

পাগলী আবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীরূপ। এঁদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্ম এমনি কেটেছে—এ জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাই নি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত—তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝবে? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুলে দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষা গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব

তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প আপনারা শুনিয়াছেন কিছুদিন আগে, হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাহার দ্বিতীয় গল্পটি যে বিশ্বাস করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গল্পটি এমন অদ্ভুত যে সেটি আপনাদের শুনাইবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

জগতে কি ঘটে না ঘটে তাহার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি? "There are more things in Heaven and Earth, Horatio" ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব এই গল্পটি শুনিয়া যান এবং সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া ডিস্‌মিস্ করিবার পূর্বে মহাকবির ঐ বহুবার উদ্ধৃত, সর্বজনপরিচিত, অথচ গভীর উক্তিটি স্মরণ করিবেন এই আমার অনুরোধ।

তবে যিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট, এই স্থূল জগতের বাহিরে অন্য কোন সূক্ষ্ম জগৎ, কিংবা ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন অশরীরী জীব কিংবা অপদেবতা-উপদেবতার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসবান নহেন, তিনি এ গল্প না-হয় না-ই পড়িলেন?

ভূমিকা রাখিয়া এখন গল্পটা বলি।

সেদিন হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না, সন্ধ্যার পূর্বে মাঠ হইতে ফুটবল খেলা দেখিয়া ধর্মতলা দিয়া ফিরিতেছিলাম। মোহনবাগান হারিয়া যাওয়াতে মনও প্রফুল্ল ছিল না—কি আর করি, ধর্মতলার মোড়ের কাছেই মট্ লেনে (নম্বরটা মনে নাই তবে বাড়িটা চিনি) তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি গেলাম।

তারানাথ একাই ছিল। আমায় বলিল—এস, এস হে, দেখা নেই বহুকাল, কি ব্যাপার?

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময়ে ঘোর বৃষ্টি নামিল। তারানাথ আমায় এ অবস্থায় উঠিতে দিল না। আমি দেখিলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামিবে না, তারানাথের বৈঠকখানায় বসিয়া আমরা দু-জনে। বৃষ্টির সময় মনে কেমন এক ধরণের নির্জনতার ভাব আসে—বৃষ্টি না থাকিলে মনে হয় শহরসুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে আসিয়া ভিড় করিবে, কেহ না আসিলেও মনের ভাব এইরূপ থাকে, কিন্তু বৃষ্টি নামিলে মনে হয় এ বৃষ্টি মাথায় কেহই আসিবে না। সুতরাং আমার ঘরে আমি একা। তারানাথের [illegible]ও সেদিন মনে হইল আমরা দু'জনে ছাড়া সারা কলিকাতা শহরে যেন কোথাও কোন লোক নাই।

সুতরাং মনের ভাব বদলাইয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও নামিল। জীবনের অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগিল। ঘোর বৃষ্টি-মুখর আষাঢ়-সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়, ল্যাংড়া আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার, চৌরঙ্গীর মোড়ে ওবেলাকার বাস্-দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানারূপ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন্ সময় নারীপ্রেমের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম।

তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হইলেও শুকদেব যে নয় বা কোন কালে ছিল

না, এ-কথা পূর্বের গল্পটিতে বলিয়াছি। আশা করি, তাহা আপনারা ভোলেন নাই। নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করিয়াছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহার মুখ হইতেই এ বিষয়ে কিছু রসাল অভিজ্ঞতার কথা শুনিব, এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে এ সম্বন্ধে যে অসাধারণ ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করিল, তাহার জন্য, সত্যই বলিতেছি, আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

আর একটা কথা, তারানাথকে দেখিয়া বা তাহার মুখে কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চাপিয়া রাখিয়াছে, অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথা-বার্তা বলিতে গিয়া যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই, আজ বুঝিলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনীই সে আমার কাছে কেন কাহারও কাছে বলে নাই, হয়তো সেগুলি ঠিক বলিবার কথাও নহে—কারণ সে-কথা বলা তাহার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করা মাত্র। তা ছাড়া আমার মনে হয়, লোককে সে-সব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত।

বলিলাম—জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক—কি বলেন?

তারানাথ বলিল—অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত। প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার। এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয়—শোনো তবে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—কোন ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না, প্রথম প্রেম হ'ল একটি মেয়ের সঙ্গে, সে মারা গেল—এই তো? ও ঢের শুনেছি। তারানাথ হাসিয়া বলিল—ঢের শোন নি! শোন—কিন্তু বিশ্বাস যদি না কর তাও আমায় বলবে। এরকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্পলেখক হয়ে যেতুম হে !... দু-একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া একথা কারও কাছে বলেনি।

ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর হইতে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দু-পেয়ালা গরম চা ও দুখানি করিয়া পরোটা ও আলুভাজা আনিল। চারি দশ বছরের মেয়ে, তারানাথের মতই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল, মুখ চোখ মন্দ নয়। আমায় বলিল—কাকাবাবু, লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না? চারির কাছে কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম, ধর্মতলার দোকান হইতে তাহার উল-বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নক্‌শা কিনিয়া দিব। বলিলাম—আজ ফুটবলের ভিড় ছিল, কাল এনে দেবো ঠিক।

চারি দাঁড়াইয়া ছিল, তারানাথ বলিল—যা তুই চলে যা, দুটো পান নিয়ে আয়—

মেয়ে চলিয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ছেলেপিলের সামনে সে-সব গল্প—চা-টা খেয়ে নাও, পরোটাখানা—না না, ফেলতে পারবে না, ইয়ং ম্যান তোমরা এখন—খাওয়ার বেলা অমন—ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেলো—

চা পানের পরে তারানাথ বলিতে আরম্ভ করিল:

বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলীর অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করেছিলাম, তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরেই।

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তার পর থেকে। নিজের চোখে যা দেখলুম, তা তো আর বিশ্বাস না ক'রে পারি না। এটা পাগলীর কথা থেকে বুঝেছিলুম, পাগলী আমায় ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল। ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে। গুরু খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজলে কি হবে, ও পথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথম, ধুনি-জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদার, ধর্ম জিনিসটা এদের

কাছে একটা বেচাকেনার বস্তু, ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে। দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা, এদের ঠকানো খুব সহজ, বিশেষতঃ ধর্মের ব্যাপারে।

যাক ও-সব কথা। আমি ধুনি-জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম, ইন্‌সিওরেন্সের দালাল দেখলুম, দৈবী ঔষধের মাদুলি বিক্রেতাকে দেখলুম, সাধুবেশী ভিক্ষুক দেখলুম—সত্যিকার সাধু একটাও দেখলুম না।

এ অবস্থায় বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে একদিন আশ্রয় নিয়েছি, শীতকাল, আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করবার যোগাড় করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একজন শ্যামবর্ণ, ঋজু ও দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় সাধু দেখি একটা পুঁটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন। আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী, বললেন—তুই যে দেখছি বড় ভক্ত! কি চাস্ এখানে? বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস।

আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম—রাগ নয় বাবাজী, বৈরাগ্য—

সাধুজী হেসে বললেন, যে কথাটি পাগলীও বলেছিল—ওহে ছোকরা, সাধু হব বললেই হওয়া যায় না। তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। সংসারধর্ম কর্ গে যা।

মন্দির থেকে একটু দূরে ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমুণ্ডির আসন—পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরী। সাধু রাত্রে সেখানে নির্জনে সাধনা করেন তাও দেখলুম। মনে ভারী শ্রদ্ধা হ'ল, সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে এবার।

কিছুদিন লেগে রইলাম তাঁর পিছনে। তাঁর হোমের কাঠ ভেঙ্গে এনে দিই, তিন মাইল দূরের কুসুমবনী ব'লে গ্রাম থেকে তাঁর চাল-ডাল কিনে আনি। গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক। অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁর আছে। তবে পাগলীর কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল—এখানেও তেমনি ভয় দেখালে। বললে—তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসিদের বিশ্বাস করো না বেশী। ওরা সব পারে, একটু সাবধান হয়ে চলো। বিপদে পড়ে যাবে।

শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলুম।

গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সেদিন শুক্লপক্ষের রাত্রি, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজী কার সঙ্গে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে কথা বলছেন। কৌতূহল হ'ল—এত রাত্রে কে এল এই নির্জন নদীতীরের জঙ্গলের মধ্যে?

কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূরে গিয়েই যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

সাধু বাবাজী এত রাত্রে একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলছেন—গাছের আড়াল থেকে মেয়েমানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হ'ল মেয়েটি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী।

এত রাত্রে গুরুদেব কোন্ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, সে মেয়েটি এলই বা কেমন করে একা এই নির্জন জায়গায়?

যাই হোক আর বেশীদূর অগ্রসর হ'লেই ওরা আমায় টের পাবে। মনে কেমন ভয়ও হ'ল, সে দিন চলে এলুম। তার পরদিন রাত্রে আমি ঘুমুলাম না। গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সে-মানুষটি আজও এসেছে। ভোর হবার কিছু আগে পর্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে। ফরসা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর সাহস হ'ল না—মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই।

একদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। যে-মেয়েমানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে

অর পরণের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরণের। সে যে কোন দেশের বস্ত্র পরেছে, সেটা না শাড়ি, না ঘাঘরা, না জাপানী কিমোনো, না মেয়েদের গাউন!—অজানা যদিও, ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে।

সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হ'ল।

মেয়েমানুষটি যেই হোক, সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি। কি ক'রে আমার একথা মনে হ'ল তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই কথা আবছা ভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয়ও হ'ল।

সরে পড়ি বাবা, দরকার কি আমার এ সবের মধ্যে থেকে?

কিন্তু পরদিন রাত্রে এক সময়ে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে—উঠে যেতেই হ'ল। সেদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়েমানুষটি যখন থাকে, তখন এক ধরণের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায়—এ ক'দিনও এই গন্ধটা পেয়েছি, কিন্তু ভেবেছিলুম কোনও বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো। আজ বেশ মনে হ'ল এ গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্তমান।

এই রকম চলল আরও দিন-দশ-বারো। তার পরে সাধুর ডাক এল বরাকর না কোডার্মার এক গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়িতে কি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। সাধুজী প্রথমে যেতে রাজী হন নি, দু-দিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বারে জমিদারের ছোট ভাই নিজে পাল্কী নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোশামোদ করে নিয়ে গেলেন।

মনে ভাবলুম এ আর কিছু নয়, সাধুজী সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজী নন্।

কিন্তু নিকটে কোথাও বস্তি নেই, মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে? আর সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারী মেয়ে নয়—আমি অনেকবার দেখেছি সেটিকে এবং প্রত্যেক বারই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এ কোন বড় ঘরের মেয়ে, যেমন রূপসী, তেমনি তার অদ্ভুত ধরণের অতি চমৎকার এবং দামী পরণ-পরিচ্ছদ।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্টুবুদ্ধি জাগল। আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজীর হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয় নি—দেখাই যাক না আজ রাত্রে আসে কি না? তখন ছিল অল্প বয়েস, তোমরা যাকে বল রোমান্স, তার ইয়ে তখন যে আমার যথেষ্টই ছিল. এতে তুমি আমাকে দোষ দিতে পার না।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে রইলাম। মনে ভয়ানক কৌতূহল, দেখি আজ মেয়েটি আসে কিনা। কেউ কোন দিকে নেই, নির্জন রাত্রি, মনে একটু ভয়ও হ'ল—এ ধরণের কাজ কখনও করি নি, কোন হাঙ্গামায় আবার না পড়ে যাই!

তখন আমি অপরিণতবুদ্ধি নির্বোধ যুবক মাত্র, তখন ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাতসারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি তবে কি আর ছাতিমতলায় একা পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে যাই?

তার নয়, ও আমার অদৃষ্টের লিপি। সে রাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটে নি। আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্যে হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কালরাত্রে —তা কি আর তখন বুঝেছিলাম!

যাক্ ও-কথা।

রাত ক্রমে গভীর হ'ল। পুব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগল একটু একটু ক'রে। আমার ডাইনেই বরাকর নদী, দুই পাড়েই শিলাখণ্ড ছড়ানো, তার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই নদীর পাড়েই ছাতিমতলা ও পঞ্চমুণ্ডির আসন—আমি যেখানে ব'সে আছি। আমার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ—তার পর শালবন শুরু হয়েছে।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম। আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন

এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে, এমন অতর্কিত ভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাই নি। অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বরাকর নদীর জ্যোৎস্না-ওঠা শিলাবিস্তৃত পাড় আর এক দিকে ফাঁকা মাঠ। আসনে ব'সে পর্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টিও রেখেছি—মাঠের দিকে! নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয়—মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আধ সেকেণ্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি, আধ সেকেণ্ড পরেই সেখানে জলজ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মত ঠেকল ব'লেই আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধ! আমার সারা দেহ-মন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।...আমার জ্ঞানও বোধ হয় ছিল তার পর আর এক সেকেণ্ড। তার পরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না।

যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ভোর হয়েছে। উঠে দেখি সারা-রাত সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম। নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারা-রাত পড়ে থাকার দরুন গায়ে ব্যথা হয়েছে, গলা ভার হয়েছে। উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম। এসে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার মনে হ'ল আমার জ্বর হবে, শরীর এত খারাপ।

পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবি।

মেয়েটি কে? কি ক'রে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এল? এ তো একেবারে অসম্ভব। অসামান্যা রূপসী যে মেয়েটি, অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্বে ওই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তা আমি দেখে নিয়েছিলুম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন, এরও তো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না! অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করাও সারাদিন আমার ঘুচল না। বিকেলের দিকে সাধুবাবাজী গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়ি থেকে ফিরলেন। আমার জন্যে লাড্ডু, কচৌড়ি এবং একটা মোটা সুতি চাদর এনেছেন—তাঁর নিজের জন্যে জমিদার-বাড়ি থেকে ভাল একখানা পশমী আলোয়ান দিয়েছে!

আমায় বললেন—শুয়ে কেন? ওঠ—জিনিসগুলো রেখে দাও—

অতিকষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুঁটুলিটা নিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হয়েছে?...অসুখ-বিসুখ নাকি?

কিছু জবাব দিলাম না।

সাধু স্নান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার-বাড়ির কাণ্ড কি রকম তারই সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমায় বললেন—তোমার কি হয়েছে বল তো? অমন মনমরা ভাব কেন? বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? বলেছি তো বাবা, তোমরা ছেলে-ছোকরা এ-পথে কি নামলেই নামা যায় রে বাপু! বড় কঠিন পথ।

সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এল। কত দিন ঠিক জানি না—অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম। জ্ঞান হ'লেই দেখতাম সাধু শিয়রে বসে আছেন। বোধহয় তাঁরই সেবাযত্নে এবং দয়ায় সেবার ক্রমে সেরে উঠলাম।

সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি দুপুরের পরে, সাধু বললেন—ছেলেছোকরা কিনা, কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছিলে বাপু? এবার তো বাঁচতে না—অতিকষ্টে বাঁচাতে হয়েছে। আচ্ছা বাপু, পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি জন্যে গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে?

আমি তো অবাক। কি ক'রে জানলেন ইনি? আমি তো কোন কথাই বলি নি। হঠাৎ আমার সন্দেহ হ'ল, সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হয়েছে, সে-ই ব'লেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—ভাবছ আমি কি ক'রে জানলাম, না?... আরে বাপু, কতটুকুই বা তোমরা বোঝ, আর কতটুকুই বা তোমরা জান। তোমাদের দেখে দয়া হয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম—আপনি জানলেন কি ক'রে?

সাধু হেসে বললেন—আরে পাগল, তুমিই তো জ্বরের ঘোরে বলেছিলে ঐ সব কথা—নইলে জানব কি ক'রে? যাক, প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের। আর কখনও অমন পাগলামি করতে যেও না।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তা হ'লে আমিই বিকারের ঘোরে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছি!...সেইদিন মনে মনে সংকল্প করলাম দুএক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব—শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই।

কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্য রকম। সাধুবাবাজীকে তার পরদিন পাহাড়ী বিচ্ছুতে কামড়াল—তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী মিহিজাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি, তাঁর সেবা করি, দিনরাত জেগে তিন দিন পরে তাঁকে সারিয়ে তুলি।

দিন-দশেক পরে আমি এক দিন বললুম—সাধুজী আমি আজ চলে যেতে চাই।

সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন—চলে যাবে? কোথায়?

—এখানে থেকেই বা কি হবে? আমার তো কিছু হচ্ছে না—মিছে ব'সে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসানো। দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে ব'সে নেই?

সাধুজী চুপ ক'রে গেলেন, তখন কোন কথা বললেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন। বললেন—ভেবেছিলাম এ পথে নামাব না তোমায়। কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ, সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ, নিজের ছেলের মত সেবা করেছ, তোমাকে কিছু দিতে চাই। একটা কথা তার আগে বলি, তোমার সাহস বেশ আছে তো?

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র-সাধনা ক'রেছি!

তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলি ও তার অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের কথা বললাম—এতদিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলীর কথা বললাম।

সাধু অবাক হয়ে বললেন—সে পাগলীকে তুমি চেন? আরে, সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ সে কেবল তোমার পূর্বজন্মের পুণ্য। ওর নাম মাতু পাগলী, মাতঙ্গিনী। ও নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানক ভাবে সিদ্ধ। ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে! কি সর্বনাশ! ওকে আমরা পর্যন্ত ভয় ক'রে চলি—কি রকম জান? যেমন লোকে ক্ষ্যাপা শেয়াল-কুকুর কি গোখরো সাপকে ভয় করে, তেমনি। ও সেই জাতীয়। অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্ত্রের। ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত, সে একদিন বলব। কত দিন ওর সঙ্গে ছিলে?

—প্রায় দু-মাস।

সাধুজী বললেন—যখন ওর সঙ্গে ছিলে, তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার। তোমাকে আমি মন্ত্র দেব। কিন্তু তুমি যুবক, তোমার মনের ভাব আমি জানি। তুমি কি জন্যে রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়েছিলে বল তো?

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। মনের গোপনে পাপ নেই, যদি পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে থাকি—তবে সেই অপরিচিতা নিশাবিহারিণী রূপসীর টানে যে, এ-কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে।

সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন।

বললেন—কিন্তু একটা কথা তুমি জান না, সেটা আগে বলি। তুমি সেদিন যাঁকে রাত্রে ছাতিমতলায় ব'সে দেখেছিলে, তিনি তোমার আমার মত দেহধারী মানুষ নন্।

শুনে তো মশাই আমার গা শিউরে উঠল—দেহধারী জীব নয়, বলে কি রে বাবা! তবে কি ভূত-পেত্নী নাকি?

সাধুজী বললেন—তোমায় এ কথা বলতাম না, যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলীর সঙ্গে ছিলে। আচ্ছা শুনে যাও। আমার গুরুদেব ছিলেন ৺কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, হুগলী জেলায় জেজুড় গ্রামে তাঁর মঠ ছিল। মস্ত বড় সাধক ছিলেন, কুলার্ণব আর মহাডামর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তাঁর সমান অধিকার ছিল। মহাডামর-তন্ত্রের একটি নিম্ন শাখার নাম

ভূতডামর। আমি তখন যুবক, তোমারই মত বয়েস—স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূতডামরের উপর। গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও-পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাই কি হয়, অদৃষ্টলিপি তবে আর বলেছে কাকে? এই তোমার যেমন—

আমি বললাম—ও-পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?

—ও-পথ প্রলোভনের পথ, বিপদের পথ। ভূতডামর তন্ত্র নানাপ্রকার অশরীরী উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে—তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী। জপে ও সাধনায় বশীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে-কেউ—যার সাধনা তুমি করবে—সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে। নানা ভাবে এদের সাধনা করা যায়, কিঙ্কণী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয়, কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যাভাবে—কিন্তু বাকী সব যোগিনীদের যে-কোন ভাবে সাধনা করা যায় এবং যে-কোন ভাবে পেতে পারা যায়। এই সব যোগিনীদের কেউ ভাল কেউ মন্দ। এঁদের জাতি নেই বিচার নেই ধর্ম নেই, কোন গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে এঁরা আবদ্ধ নন। ভূতডামরে এই সাধনার ব্যাপারে ব'লে দেওয়া আছে। ভূতডামরের প্রথম শ্লোকই হ'ল—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তমম্
সর্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্বসিদ্ধিদম্
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা

তুমি সেদিন যাঁকে দেখেছিলে তিনি এই রকম একজন জীব। তোমার সাহস থাকে সে-মন্ত্র আমি তোমায় দেব। কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোন তবে এ-পথে নেমো না।

এতটা বলে সাধুজী ভাল করেন নি, আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামলে রাখতে পারেন? আমি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লাম, মন্ত্র নেবই।

সাধুজী বললেন—তবে কনকবতী দেবী-সাধনার মন্ত্র নাও—কন্যাভাবে পাবে দেবীকে—

আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি আবার বললেন—তবে কিঙ্কণী-সাধনার মন্ত্র?

আঃ, কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে। অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি?

সাধু আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন—বেশ, আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবী-সাধনার মন্ত্র দিচ্ছি। এঁকে কন্যা ভাবে, ভগ্নী ভাবে বা ভার্যা ভাবে পেতে পার। তবে আমার যদি কথা শোন, কখনও ভার্যা ভাবে পেতে যেও না। এর বিপদের দিক বলি। ভার্যা ভাবে সাধন করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মত দেখবেন—কিন্তু এঁরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী, সাধারণ মানবী নয়, এঁদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত। হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ ক'রে রাখবে, নয়তো একেবারে উন্মাদ ক'রে ছেড়ে দেবে। সামলাতে পারা বড় কঠিন।

সাধুজী আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন—বাবা, এ জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে। তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে। এক জায়গায় দু'জন সাধকের সাধনা হয় না।

বেশ ভাল। আমিও তা চাইনে। আমার ভয় ছিল, হয়তো সাধুজীও মাতু পাগলীর মত হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ জানে, এবং খানিকটা অভিভূত ক'রে যা-তা দেখাবে আমায়। তারপর—

আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—কেন, আপনি যে স্বচক্ষে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি মূর্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না?

—তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয় বলি নি? হয়তো পঞ্চমুণ্ডির আসনে যখন বসে, তখনই জ্বর আসছে, সে-সময় জ্বরের পূর্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব—হয়তো চোখের ধাঁধা। জ্বর ছেড়ে সেরে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, সত্যি বলছি।

যাক সে কথা। তারপর ওখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জন জায়গায়। ওখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে, থাকতাম

গ্রামের বারোয়ারী ঘরে। গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম, আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে নির্জনে বসে মন্ত্র জপ করতাম।

এই রকমে একমাস কেটে গেল, দু-মাস গেল, তিন মাস গেল। কিছুই দেখিনে। মন্ত্রের উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে। তবুও মনকে বোঝালাম—ছ-মাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম ব'লে দিয়েছিল সাধুজী। তার আগে কিছু হবে না। ছ'মাসও পূর্ণ হ'ল। সাধুজী যেমন বলে দিয়েছিল, ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম।

পদ্মাসনং সমাস্থায় মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্মতম্।
আমিষান্নৈঃ পুপসূপৈঃ সংপূজ্য মধুসুন্দরীম্॥

বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাঁধলুম, কই মাছ পোড়ালুম, আঙট কলার পাতায় ভাত ও পোড়ামাছের নৈবিদ্য দিলাম। ডুমুরের সমিধ দিয়ে বালির উপর হোম করে ওঁ টং ঠং ঝং ইঁ ক্ষং মধুসুন্দর্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম। জাতিফুলের মালা নিতান্ত দরকার, কত দূর থেকে খুঁজে জাতিফুলের মালা এনেছিলাম—তার মালা ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশে নিবেদন ক'রে ধ্যানে বসলাম—সারারাত কেটে গেল।

বললাম—কিছু দেখলেন?

—কা কস্য পরিবেদনা। ঘি, চন্দন, মিষ্টি কিনতে কেবল কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। ধ্যান-জপ-হোমে কিছুই ফল ফলল না। রাগ ক'রে টান মেরে সব নৈবিদ্য ফেলে দিলাম নদীর জলে। বেটা সাধু বিষম ঠকিয়েছে। কোনো ব্যাটার কোনো ক্ষমতা নেই—যেমন মাতু পাগলী তেমনি এ সাধু। তন্ত্রটন্ত্র সব বাজে, খানিকটা হিপ্‌নটিজ্‌ম্ জানে—তার বলে মূর্খ গ্রাম্যলোককে ঠকিয়ে খায়।

এ-সব ভাবি বটে, জপটা কিন্তু ছাড়তে পারিনি, অভ্যেসমত ক'রেই যাই. ওটা যেন একটা বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ-ভাবে আরও মাস চার-পাঁচ কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পরেই। রাত তখন হয়েছে সবে, আধ ঘণ্টাও হয়নি। আমি একটা গাছের তলায় বসে জপ করছি, অন্ধকার হ'লেও খুব ঘন হয় নি তখনও—হঠাৎ তীব্র কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে। বেশ মন দিয়ে শুনে যাও। এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি। যা যা হ'ল একটার পর আর একটা বলছি মন দিয়ে শোন। কস্তুরীর গন্ধটা যখন সেকেণ্ড চার-পাঁচ পেয়েছি তখন আমার সেদিকে মন গেল। ভাবলুম এ দেখছি অবিকল কস্তুরীর গন্ধ! বাঃ, পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলই আছে!

তারপরেই আমার মনে হ'ল আমার পেছনে অর্থাৎ যে-গাছটার তলায় ব'সে ছিলাম তার গুঁড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না-দেখেও এভাবে ধরা যায়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে মনে হ'ল। আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি? ভয় হ'ল মনে। ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আধ সেকেণ্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না। ঠিক সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসার রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করলাম জ্ঞান হারাব না কখনই।

মেয়েটি দেখি ভ্রূকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নিজের চোখে এমনি এক মূর্তি দেখলেন আপনি?

আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পাইয়া তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের সুরে বলিল—নিজের চোখে। সুস্থ শরীরে। বিশ্বাস কর না-কর সে আলাদা কথা—কিন্তু যা দেখেছি তাকে মিথ্যে বলতে পারব না।

—কি রকম দেখলেন? কেমন চেহারা?

—ভারি রূপসী যদি বলি কিছুই বলা হল না। মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যানে আছে।

উদ্যদ্ ভানু প্রতীকাশা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা সতী
নীলাম্বর পরিধানা মদবিহ্বললোচনা

নানালঙ্কারশোভাঢ্যা কস্তুরীগন্ধমোদিতা
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্

অবিকল সেই মূর্তি। তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মনগড়া কথা নয়, সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—আপনি কোন কথা বললেন?

—কথা! আমার চেতনা তখন লোপ পাবার মত হয়েছে—তো কথা বলছি। পাগল তুমি? সে-তেজ সহ্য করা আমার কর্ম? সাধারণ মানবীর মত তার কোন জায়গাই নয়। ঐ যে বলেছে মদবিহ্বললোচনা—ওরে বাবা সে চোখের কি ভাব! ত্রিভুবন জয় হয় সে-চোখের চাউনিতে।...

আমি অধীর হইয়া বলিলাম—বর্ণনা রাখুন। কি কথা হ'ল বলুন।

—কথাবার্তা যা হয়েছিল সব বলার দরকার নেই।

মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে আমায় দেখা দিতেন। নদীতীরের সেই নির্জন জায়গায় তাঁকে চেয়েছিলাম প্রিয়ারূপে—বলাই বাহুল্য, সাধুর কথা কে শোনে? তখন শীতকাল, বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক, জলের ধারে জলজ লিলিগাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে, আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে বালির উপর অভ্রকণা জ্যোৎস্নারাত্রে চক্‌চক্ করে, বরাকর নদীর দুপারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে! আকাশ রোজ নীল, রাত্রে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার বড় মনোরম শোভা—সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতিরাত্রে দেখা দিতেন—সত্যিকার বাঁচা বেঁচেছিলাম ঐ তিন মাস। এসব কথাও বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। কত বেদনাদায়ক তুমি জান না, আমার জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলুম ঐ তিন মাসে। দেবীই বটে, মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালবাসা, অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা—সে এক স্বর্গীয় দান...সে তুমি বুঝবে না, তোমায় কি বোঝাব, তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে, মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে। হয়ত ভাবছ এতক্ষণ। তুমি কেন আমার স্ত্রীই আমার কথা বিশ্বাস করে না, আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল ক'রে দিয়েছিল গুণজ্ঞান করে।

কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্কর মদিরার মত। আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ ক'রে দিতে লাগলো। কিছু ভাল লাগে না। কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বরাকর নদীর শালবনে, কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশে আসবেন! সারারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাবে স্বপ্নের মত, নেশার ঘোরের মত। আকাশ, নক্ষত্র, দিক-বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্যে—কয়েক প্রহরের জন্যে সময় স্থির হয়ে নিশ্চুই হয়ে স্থাণুর মত অচল হয়ে থেমে থাকবে বরাকর নদীতীরের বনপ্রাঙ্গণে।

একদিন ঘটল বিপদ।

একটি সাঁওতালী মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে—সুঠাম তার দেহের গঠন, নিকটের বস্তীতে তার বাড়ি। অনেক দিন থেকে তাকে দেখছি, সেও আমায় দেখছে।

সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। আমায় তাদের বাঁকা বাংলায় বললে—ছেলে হয়ে হয়ে মরে যায়, তার মাদুলি আছে তোমার কাছে সাধুবাবা?

এমন ভাবে করুণ সুরে বললে—আমার মনে দয়া হোল। মাদুলি দিতে জানি একথা বলিনি, তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম। তারপর সে চলে গেল।

মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলুম অন্য মূর্তিতে। কি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি, কি ভীষণ মুখের ভাব! সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না—চণ্ডিকা দেবীর রোষকটাক্ষে যেমন লোলজিহ্বা, করালিনী প্রচণ্ডা কালভৈরবী মূর্তির সৃষ্টি হয়েছিল—এও যেন ঠিক তাই।

সেদিন বুঝলুম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি, সে মানুষ নয়—মানুষের পর্যায়ে সে পড়ে না। মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না, পিশাচী হয় না—মানবীই থেকে যায়।

ভীষণ প্রতিগন্ধে সেদিন শালবন ভরে গেল—প্রতি দিনের মত কস্তুরীর সুবাস কোথায় গেল মিলিয়ে! তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী—দেখেই মনে হোল এরা দেবীও বটে,

বিদেহী পিশাচীও বটে। এদের ধর্মাধর্ম নেই, সব পারে এরা। যে হাতে নায়িকার মত ফুলের মালা গাঁথে, সেই হাতেই বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুশোচনায়, নিমেষে ধ্বংস করতে এরা অভ্যস্ত।

আমার ভীষণ ভয় হোল।

পিশাচী মধুসুন্দরী তা বুঝে বললে—ভয় কিসের?

বললুম—ভয় কই? তুমি রাগ করেছ কেন?

খল খল অট্টহাস্যে নির্জন অন্ধকার ভরে গেল। আমি শিউরে উঠলাম।

পিশাচী বললে—শব চিনতে পারবে? অন্ধকার রাত্রে সাঁওতালদের কোনো বৌয়ের শব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায়—চিনতে পারবে? তুমি না যদি চিনতে পারো, দু'টি শবে জড়াজড়ি ক'রে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে।

হাত জোড় ক'রে বললুম—দেবী, তোমায় ভালবাসি। ও মূর্তি আমায় দেখিও না—আমায় মারো ক্ষতি নেই—কিন্তু অন্য কোন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণ কেন নেবে? দয়া করো।

বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলুম। তখন আবার যে দেবী, সে দেবী। বললেন—সেই সাঁওতালের মেয়ের মূর্তিতে আমায় দেখতে চাও? সেই মূর্তিতে এখনি দেখা দেবো।

বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বরং আরও নিটোল গড়ন শরীরের, মুখের ভাব আরও কমনীয়।

বললুম—ও চাই না—তোমার মূর্তি দেখাও দেবী।

সেই রাত্রি থেকে বুঝলুম কালসাপ নিয়ে খেলা করচি আমি। গুরুদেব বারণ করেছিলেন এই জন্যেই। হয়তো একদিন মরবো এর হাতেই। সাপুড়ে সাপ খেলায় মন্ত্রে—আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছোবলেই মরে। এভাবে বেশীদিন কিন্তু ছিল না। কিছুদিন পরে পিশাচী মূর্তি ভুলে গেলুম দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে। তাতেও বুঝলুম এ সাধারণ মানবী নয়—অমানুষিক ধরণের এদের মন। মানুষের বিবর্তনের জীব এরা নয়। হয় তার ওপরে, নয় তার নীচে।

একদিন দেবী আমায় বললেন—আর কিছুদিন যাক্ তোমায় বহুদূর নিয়ে যাবো—

—কোথায়?

—সে বলবো না এখন।

—কতদূরে? কোন্ দিকে?

—এতদূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তবে তোমার ভাগ্যে আছে কি তা?

সব ভুলে গেলাম আবার। পিশাচিনী মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে—আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী, যৌবনচঞ্চলা, মুগ্ধস্বভাবা অপরূপ রূপসী এক তরুণী নারী। দেবীই বটে।

আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লুম, মাথার ঠিক রইল না।

একদিন বললেন—বিপদ আসচে তোমার, তৈরী হও।

—কি বিপদ?

—তা বলবো না।

—প্রাণ-সংশয়ের বিপদ?

—তা বলবো না।

—তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের?

—আমি ঠেকাতে পারবো না। কেউ ঠেকাতে পারবে না। যা আসচে, তা আসবেই।

কথা খেটে গেল শীগ্‌গির, খুব বেশী দেরি হয়নি।

তিন মাস পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোক তাদের বলেছে কে একজন পাগল, বোধ হয় বাঙালীই হবে, অল্প বয়সে বরাকর নদীর ধারে শালবনে সন্ধ্যাবেলা ব'সে থাকে—আর আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমায় এ অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে।

তাই শুনে বাড়ির লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় জট, গায়ে খড়ি উড়ছে—এই অবস্থায় নাকি আমায় ধরে। বাড়ি ধরে আনবার জন্যে টানাটানি, আমি কিছুতেই আসব না, ওরাও ছাড়বে না। আমার তখন সত্যিই জ্ঞান নেই, সত্যিই আমি ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। ওরা হয়তো আমায় আনতে পারত না—কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়িনী রূপে, তিনি নিরুৎসাহ করলেন।

—কি রকম?

ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের একটি গোয়ালঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল। গভীর রাত্রে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেবীকে বললাম—আমি এই নদীতীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন—যেতে হবেই, এই আমার অদৃষ্টলিপি। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না। তিনি জানেন, এই রাতের পরে জীবনে তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। আগে থেকে বলে তৈরী ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্যেই।

দেবী ত্রিকালজ্ঞা, তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি কি ক'রে তিনি একথা জানলেন। হ'লও তাই, বাড়ী আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল ক'রে দিয়েছে। দিনকতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল—বছর খানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই থেকেই আমি সংসারী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কখনো মন্ত্র জপ করে তাঁকে আহ্বান করেন নি কেন?

—বাপ রে! এ কি ছেলেখেলা? মারা যাব শেষে! অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন? সে-চেষ্টাও কখনো করিনি। সে কতকাল হয়ে গেল, সে কি আজকার কথা?

—আচ্ছা, এখন আর তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে, উত্তেজনায় বালিশ বুকে দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

ইচ্ছে হয় না কে বলেছে? বললুম তো ঐ তিনমাসই বেঁচে ছিলাম। দেবী এসে-ছিলেন মানুষী হয়ে। এদিকে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী শক্তিরূপিণী যোগিনী, তেজে কাছে ঘেঁষা যায় না—অথচ কি মানবীই হয়ে যেতেন, যখন ধরা দিতেন আমায়! প্রিয়ার মত আসতেন কাছে, অমনই মিষ্টি, অমনই ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান, বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তাঁর মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতো—এমনি কত রাত ধরে! এক এক সময় ভ্রম হ'ত তিনি সত্যই মানুষীই হবেন।

বিদায় নিয়ে যাবার সেই রাতটিতে বললেন—নদীতীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলব ভেবেছ! আমাদের পক্ষেও সুলভ এ নয়, ভেবো না আমরা খুব সুখী। আমাদের মত সঙ্গীহারা, বন্ধুহারা জীব কোথায় আছে? প্রেমের কাঙাল আমরাও। কত দিন পরে একজন মানুষে আমাদের সত্যিকার চাওয়া চায়, তার জন্যে আমাদের মন সর্বদা তৃষিত হয়ে থাকে কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারিনে, আগ্রহ ক'রে যে না চায় তার কাছে যাই নে, সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না, নিজেও আনন্দ পাবে না. যা কিনা পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টলিপি; কোথাও চিরদিন থাকতে পারিনে—কি না কি ঘটে যায়, ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ক'জন আমাদের ডাকে? ক'জন বিশ্বাস করে? সুখী ভেবো না আমাকে।

বলিলাম—এত যদি সুখের ব্যাপার তবে আপনি ভয়ংকর বলেছিলেন কেন আগে?

—ব্যাপার ভয়ংকর এই জন্যে যে আমার সারা জীবনটা মাটি হয়ে গেল ঐ তিন মাসের সুখভোগে। কোন দিকে মনই দিতে পারিনে—মধ্যে তো দিনকতক উন্মাদ হয়েই গিয়ে-ছিলাম, বিয়ের পরেও। তারপর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ ক'রে যা হয় একরকম—সেও দেবীরই দয়া। তিনি বলেছিলেন, জীবনে কখনও অন্নকষ্টে আমায় পড়তে হবে না। পড়তে কখনও হয়নি—কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে?

তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। আমিও বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলাম। এত অদ্ভুত, অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়া-

ছিল ততক্ষণ ওর চোখমুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই—কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল—

কি মনে হইল তাহা আর না-ই বা বলিলাম?

কবিরাজের বিপদ

চন্দ্রনাথবাবু কবিরাজ এবং শিশির সেন তরুণ ডাক্তার। রামদাসের ছোট্ট বাজার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি! তবে দেশটায় রোগ-বালাই নিতান্ত কমও নয়, তাই সবাই দু-মুঠো ভাতের যোগাড় করতে পারতো কোনোরকমে। চন্দ্রনাথবাবুর বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, শিশির সেনের বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। ওদের ডাক্তারখানা রাস্তার এপার-ওপার। রোগী-পত্তর প্রায়ই থাকে না, দু'জনে বসে গল্প-সল্প করে। বয়সের তারতম্য যতই থাকুক, দু'জনে খুব বন্ধুত্ব। চন্দ্রনাথবাবু এসেচেন খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া থেকে আর শিশিরবাবু যশোর শহর থেকে।

কাজকর্ম না থাকলে যা হয়ে থাকে, দু'জনে বসলেই তর্ক আর দ্বন্দ্ব। তর্কের বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ মানুষের মৃত্যুর পর কি হয়, এই নিয়ে।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তাঁদের গ্রামের একজন সাধু ছিলেন, তিনি ভূত নামাতে পারতেন। অনেকবার তিনি ভূতনামানো-চক্রে উপস্থিত ছিলেন, নিজের চোখে ভূতের আবির্ভাব দেখেচেন, ভূতের কথা শুনেচেন নিজের কানে। সাধুটি একজন বড় মিডিয়ম, তাঁর মধ্যে নাকি ভূতের দল পৃথিবীতে নিজেদের প্রকাশ করে!

শিশির সেন বলেন—রাবিশ!

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তোমার বলবার কোনো অধিকারই নেই এখানে! তুমি ছেলে-মানুষ, কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা?

—অভিজ্ঞতার কোনো দরকার হয় না, কমন-সেন্সের প্রশ্ন এটা।

—কাকে বলচো কমন-সেন্স?

—মানুষ মরে গেলে আর বেঁচে থাকে না, কমন-সেন্স। মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা।

—মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে জীনটা বড় করে পাওয়া।

—একদম বাজে।

—দু-পাতা সায়েন্স পড়ে ভাবচো খুব সায়েন্স শিখে ফেলেচো? আসল সায়েন্সের কিছুই জানো না, শেখো নি।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ। এ বছরের মত এমন গরম এখানকার বৃদ্ধ লোকেরাও সেখানে কোনোদিন দেখে নি।

শিশির সেন বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এসে ডাক্তারখানা খুললেন। নাঃ, টিনের বারান্দা তেতে আগুন হয়েচে, এখনো ঘরের ভেতর বসা সম্ভব নয়।

সামনের পানের দোকানীকে বললেন—রাস্তাটাতে একটু জল ছিটিয়ে দিও অভয়—এখুনি লরী গেলে ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার করে দেবে।

—ও কোবরেজ-মশায়!

—কি?

—বাইরে আসুন না!

—যাই।

—কতক্ষণ এলেন?

—আমি আজ বাসায় যাই নি—দুপুরে এখানেই শুয়েছিলাম।

—খেলেন কোথায়?

—রামজীবন তরফদা'রর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ গেল আজ কিনা। নেমন্তন্ন ছিল।

—হুঁ। আসুন আমার বারান্দায়, চা খাবেন?

—ন' মশায়। এই গরমে চা? দুপুরে লুচি ঠেসে?

—দালদা ঘি-এর তো?

—নইলে আর কোথায় পাচ্চে গাওয়া ঘি?

—না মশাই, ও নেমন্তন্ন না খেয়ে ভালোই করেচি। খেলে অম্বল, না হয় পেটের অসুখ। আর এই গরমে!

চন্দ্রনাথবাবু ডাক্তার সেনের বারান্দায় এসে বসলেন এবং চাও খেলেন। পরে যথারীতি ভূতের গল্প শুরু হয়ে গেল।

চন্দ্রনাথবাবুর মধ্যে একটি সমরপটু আত্মা বাস করে, অবিশ্বাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাঁর তৃপ্তি। শিশির সেন ভূতে বিশ্বাস করুক, না করুক, তাতে চন্দ্রনাথ কবিরাজের কি? জিনিসটা যদি সত্যিই হয়, তবে শিশির সেনের অবিশ্বাস সেটার কি হানি করতে পারে?

চন্দ্রনাথবাবু সেটা বোঝেন না যে এমন নয়, বোঝেন সবই। তবু যদি একজন অবিশ্বাসীকেও একদিন আলোতে এনে হাজির করা যায়! ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের দিগ্বিজয়ী প্রচারকদের আশা যেন তাঁর মধ্যে এসে বাসা বেঁধেচে। সত্যের আলোতে এসব অসৎ মূর্খ ছেলে-ছোকরাদের আনতেই হবে, তবেই প্রকৃত শাস্তি দেওয়া হবে এই দাম্ভিক-দের। স্বার্থবাদী ছোকরা দাম্ভিকের দল। দু-পাতা সায়েন্স পড়ে সব শিখে ফেলেচে।

চন্দ্রনাথবাবু জানতেন না শিশির সেনের মত ছোকরা তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করে। ওরা আড়ালে মুখ টিপে হেসে বলে—বুড়ো একদম সেকেলে। কুসংস্কারে ভরা। ইংরাজি তো তেমন জানে না। কবরেজি করতো, সংস্কৃত জানে একটু-আধটু। দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর। কি করি, মেশবার কোনো লোক নেই এসব জায়গায়। কার সঙ্গে দুটো কথা বলি? নইলে ওই বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার? রামঃ!

একটু পরে হঠাৎ পশ্চিম দিগন্তে অন্ধকার করে একখানা বড় কালো মেঘ উঠলো এবং কিছুক্ষণ পরে কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ কবিরাজ নিজের কবরেজ-খানার জানলা দরজা বন্ধ করতে ছুটে গেলেন। ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠলো, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু হলো বটে কিন্তু বৃষ্টি বেশি না হয়ে ঝড়টাই হলো বেশি।

ডাক্তারখানার সামনের অশত্থ-গাছের একটা ডাল ভেঙে উড়ে এসে পড়লো শিশির সেনের ডাক্তারখানার দরজার সামনে। বৃষ্টি-ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ঠাণ্ডা—গরম একদম কমে এল।

চন্দ্রনাথ বললেন—আঃ বাঁচা গেল! শরীর জুড়িয়ে গেল যেন! কতদিন পরে একটু বৃষ্টি পড়লো আজ মাটিতে।

—চা খাবেন একটু?

—তা হলে মন্দ হয় না। আনাও আর একটু।

এই সময় বৃষ্টিটা বেশ জোরেই এল। বর্ষাকালের বৃষ্টির মত।

চন্দ্রনাথ কবিরাজের কবরেজখানার ঘরের চালের ছাঁচ বেয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রাস্তায় জল জমে উঠলো আধ-ঘণ্টার ভেতর।

—বেশ বৃষ্টি হলো, মুষলধারে না হোলেও এ বছরের পক্ষে মন্দ নয়। চন্দ্রনাথবাবু বললেন—কই তোমার চা কোথায় গেল হে?

—নবীন তো গিয়েচে, বৃষ্টিতে আটকে পড়লো রামুর দোকানে। ছাতি আছে আপনার?

—নাঃ।

—তবে আর কি হবে? বসুন, জল ছেড়ে যাক।

—আপনার ভূতুড়ে আলোচনা আরম্ভ করুন না!

—নাঃ।

—কেন, আজ এত বিরাগ কেন? আজই বরং ঠাণ্ডা বাদলায় সন্ধেতে এ-কথা জমবে ভালো।

—না হে, তোমরা অবিশ্বাস কর হাসাহাসি কর, গভীর সত্যকে এভাবে বেনা-বনে ছড়াতে নেই।

—আপনার কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হতে হচ্চে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে। গভীর

সত্য কাকে বলচেন আপনি?

—মানুষের জীবন ও মৃত্যু অদ্ভুত রহস্যময়। গভীর রহস্য দিয়ে ঘেরা আমাদের এই জীবন। মানুষ মরে না। ভগবান অনন্ত করুণার আকর। এই হ'লো গভীর সত্য। আরো সংক্ষেপে শুনতে চাও? মানুষ অমর।

শিশির সেন হেসে বলে উঠলেন—তবে আপনি কবরেজি করেন কেন? মানুষ যদি অমর তবে?

—তার এই দেহটা অমর নয়, তাই কবিরাজি করি। আর এ'তদিন পরে কথাটা বলি, কবিরাজি করতে গিয়েই এই সত্যটা টেরও পেয়েচি।

—কি ভাবে?

এই সময় নবীন চাকর ভিজতে-ভিজতে চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলে।

শিশির সেন বললেন—বিস্কুট কই রে? আনিস নি? যা নিয়ে আয় চারখানা।

—আসুন! দুটো সিগারেট নিয়ে আয় অমনি। এইবার বলুন কি ভাবে?

চন্দ্রনাথ কবিরাজ চা খেতে খেতে গম্ভীর মুখে বললেন—নাঃ ও সব নিয়ে ঠাট্টা নয়। বাদ দাও।

—না না, রাগ করবেন না। কি করে সত্যটা টের পেলেন কবরেজি করতে গিয়ে বলুন না?—বেশ বাদলার সন্ধ্যেটা—

—না, আমি বলবো না। ঠাট্টার ব্যাপার নয় সেটা। তোমরা হাসবে আর আমি ভেবেচ আমার জীবনের অত বড় একটা অভিজ্ঞতা—

—আমি কবে আপনাকে ঠাট্টা করেচি এ নিয়ে? সত্যি বলুন!

চন্দ্রনাথ কবিরাজের মনটা যেন একটু নরম হয়ে এল। তিনি চা খেতে-খেতে শুরু করলেন নিম্নের গল্পটি।

—আমি নিজে যা দেখেছি তা অবিশ্বাস করি কি করে? ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। পাকিস্তানে আমার বাড়ী ছিল খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া গ্রামে। আমার বাবার নাম ছিল ত্রিপুরাচরণ শাস্ত্রী, সেকালের বড় নামডাকওয়ালা কবিরাজ ছিলেন তিনি।

বাবা বড় কবিরাজ ছিলেন, তাঁর পসার পেলাম আমি। বাবা তখনো বেঁচেই আছেন, তবে কাজকর্ম করেন না। ইদানীং পক্ষাঘাত রোগে এক দিকের অঙ্গ অচল হয়ে গিয়ে শয্যাগত ছিলেন একেবারে। নাম-করা সেকেলে কবিরাজের ছেলে হিসেবে বড় বড় বাঁধা ঘর ছিল, যারা অসুখ-বিসুখে আমাকে ছাড়া আর কোনো চিকিৎসককে ডাকতো না।

মালমাজীর পাকড়াশী জমিদার ছিলেন এমন একটি বাঁধা ঘর। সেবার কার্তিক মাসের শেষে জমিদার হরিচরণ পাকড়াশী ডেকে পাঠালেন—তাঁর ছেলের অসুখ।

আমি গিয়ে দেখলাম ছেলেটির বিষম জ্বর, যাকে আপনারা বলেন টাইফয়েড। পনেরো-ষোল বছর বয়েসটা ও রোগের পক্ষে তত সুবিধাজনক নয়। আমাকে জমিদার বাবু হাতে ধরে অনুরোধ করে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে হবে কবিরাজ মশায়, যা লাগে আমি তাই আপনাকে দেবো। ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন।

আমি রোগীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। পেট-ফাঁপা, বুকে সর্দি-কাশি, নাড়ির গতি আপনারা যাকে বলেন ইণ্টারমিটেণ্ট, ভুল বকা—সব খারাপ লক্ষণই বর্তমান। বাঁচানো বড়ই কঠিন।

ভগবান ধন্বন্তরীকে স্মরণ করে কাজে লেগে গেলাম। সেদিন সন্ধ্যার পর নাড়ির অবস্থাটা ভালো করে আনলাম। পেট-ফাঁপাও অনেকটা কমে গেল। ভুল বকুনি খানিকটা কমলো। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে গেলাম রাত্রি এক প্রহরের পর!

পাকড়াশী জমিদারদের বাড়ী দো-মহলা। বাইরে একদিকে দোলমঞ্চ, নাটমন্দির আর গোবিন্দ-মন্দির। ডাইনে সদর-কাছারি আর মহাফেজখানা। মহাফেজখানার দক্ষিণে আমলাদের থাকবার কুটুরির সারি-সারি অনেকগুলি। আমলাদের বাসার পুবদিক বড় পুকুর। এই পুকুরের তিন দিকে বাঁধানো ঘাট। পুব পাড়ের ঘাট বাইরের লোকদের জন্যে, বাকি দুটি ঘাট আমলাদের জন্যে।

বাইরের মহলের মাঝখানে সদর দেউড়ি, এই দেউড়ির দু-পাশে দুই বৈঠকখানা।

আমার বাসা নির্দিষ্ট হয়েছিল বাঁদিকের বৈঠকখানার পাশের বড় কুঠুরিতে।

সাদা ধবধবে চাদর পাতা, দুটো বড় তাকিয়া, মশারি খাটানো, চমৎকার বিছনো করে দিয়ে গিয়েচে বাড়ীর ঝি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমি বাইরে বসে অনেকক্ষণ রোগীর বিষয় চিন্তা করলাম, কাল সকালে কি কি অনুপান দরকার হবে, সেগুলো মনে মনে ঠিক করে রাখলাম। তারপর এসে শুয়ে পড়তে যাবো, এমন সময়ে দেখি জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ দিয়ে কে একজন সাদা কাপড় পরা স্ত্রীলোক এদিকে আসচে।

রাত তখন অনেক। এ'ত রাতে একা কে মেয়ে এদিকে আসচে বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি এসে দেউড়ি দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার সে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। আমি ভাবলাম, আমলাদের বাড়ী থেকে যদি কোনো স্ত্রীলোক রোগীকে দেখতে আসে, তবে এত রাত্রে আসবে কেন? একাই বা আসবে কেন? ...ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো দেউড়িতে।

এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে আমার ডাক এলো—রোগীর অবস্থা খারাপ, শীগগির যেন যাই।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রোগীর শয্যার পাশে।

সত্যি রোগীর অবস্থা এত খারাপ হলো কি করে? দেড় ঘণ্টা আগেও দেখে গিয়েচি রোগী বেশ আরামে ঘুমুচ্চে, এখন তার জ্বর হঠাৎ বড্ড নেমে গিয়েচে, অথচ চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, নাড়ির অবস্থা খারাপ। জ্বর এত কম দেখে ঘাবড়ে গেলাম। বেজায় ঘামতে শুরু করেচে রোগী। মস্ত বড় সংকটজনক অবস্থার মুখে এসে পড়লো কেন এভাবে হঠাৎ?

তক্ষুনি কাজে লেগে যাই। আমিও ত্রিপুরা কবিরাজের ছেলে, উপযুক্ত গুরুর শিষ্য; দমবার পাত্র নই।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে রোগীকে চাঙ্গা করে তুলে শেষরাত্রে ক্লান্ত দেহে বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম।

এক ঘুমে একেবারে বেলা আটটা। উঠে রোগী দেখে এলাম, বেশ অবস্থা, কোনো খারাপ উপসর্গ নেই।

সারাদিন এক ভাবেই কাটলো। রোগীর অবস্থা দেখে বাড়ীর সকলে খুব খুশি। আমার সারাদিনের মধ্যে বিশেষ কোনো খাটুনি নেই। দুপুরবেলা খুব ঘুম দিলাম। বিকেলে—এমন কি বড় পুকুরে মাছ ধরতে গেলাম আমলাদের মধ্যে একজন ভালো বর্শেলের সঙ্গে। সেরখানেক একটা পোনা মাছও ধরলাম। মনে খুব ফুর্তি।

সেদিন রাত্রে বাইরের ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময়ে দেখি দূরে মাঠের দিক থেকে যেন সেই স্ত্রীলোকটি এদিকে আসচে!

আজ সারাদিনের মধ্যে মেয়েটির কথা একবারও আমার মনে হয় নি। এখন আবার তাকে আসতে দেখে ভাবলাম ইনি নিশ্চয় এদের কোনো আত্মীয় হবেন, দূর গ্রাম থেকে দেখতে আসেন ঘরের কাজকর্ম সেরে। কিন্তু একা আসেন কেন?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কাল এই মেয়েটি রোগীকে দেখে চলে যাবার পরেই রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি দেউড়ি দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো দেখে আমার বুকের মধ্যেটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো কেন কি জানি! কান খাড়া করে রইলাম বাড়ীর দিকে।

আরামে ঘুমুতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম। ঘড়িতে ঠিক সে সময় বারোটা বাজলো।

হঠাৎ দরজার কাছে কি শব্দ হলো! মুখ তুলে দেখি, সেই স্ত্রীলোকটি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচেন।

বেশ সুন্দরী, ধপধপে শাড়ী-পরা, চল্লিশের মধ্যে বয়েস, কপালে সিঁদুর।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুবার আগেই তিনি আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে

হুকুমের সুরে বলতে আরম্ভ করলেন—শোনো, তুমি এই ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না, তুমি বাড়ী যাও।

আমার মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বেরুলো—কেন মা? আপনি কে?

আমার শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো! সমস্ত ঘরটা যেন ঘুরচে। কেন এমন হলো হঠাৎ কি জানি!

তিনি এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে বললেন—শোনো, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না। একে আমি নিয়ে যাবো। এ আমার ছেলে। ওর বাবা আবার বিয়ে করেচেন আমার মৃত্যুর পর। সৎমা ওকে দেখতে পারে না। বহু অপমান হেনস্থা করে। আমি সব দেখতে পাই। আমার স্বামী অনেক কথা জানেন না, কিন্তু আমি সব জানি। আমি আমার ছেলেকে নিশ্চয় নিয়ে যাবো। কাল রাত্রেই নিয়ে যেতাম, তোমার জন্য পারি নি। তুমি চলে যাও এখান থেকে। ওকে বাঁচাতে পারবে না।

আমার সাহস ফিরে এল।

হাত জোড় করে বললাম—মা, আমি বৈদ্য। আমার ধর্ম প্রাণ বাঁচানো। আমার ধর্ম থেকে আমি বিচ্যুতি হবো না কখনোই। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার। একটা প্রস্তাব আমি করি মা! জমিদারবাবুকে সব খুলে বলি। অসুখ সারবার পরে তিনি ছেলেকে যাতে কোনো ভালো স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে দ্যান, এ ব্যবস্থা আমি করবো। এ যাত্রা আপনি ওকে নিয়ে যাবেন না। যদি আবার ওর ওপর অত্যাচার হতে দ্যাখেন, তখন নিয়ে যাবেন আর আমিও আসবো না। দয়া করুন জমিদারবাবুকে। তিনি বড় ভালবাসেন এই ছেলেকে।

তিনি বললেন—বেশ তাই হবে। তবে যদি কোনো ভালো ব্যবস্থা না হয়, তবে এবার আমি ওকে নিয়ে যাবোই, মনে থাকে যেন।

তখনই যেন সে মূর্তি মিলিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক এল অন্দর থেকে, রোগীর অবস্থা খারাপ।

আমি তখনি ছুটে গেলাম। কাল যেমন অবস্থা ছিল, আজও ঠিক তাই। বরং একটু বেশি খারাপ। ভোর পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হোলো রোগীকে চাঙ্গা করতে।

সকালবেলা বাইরে যাওয়ার আগে জমিদারবাবুকে আমি নিভৃতে ডেকে বললাম—কিছু মনে করবেন না জমিদারবাবু, আপনি এই ছেলেটিকে বাঁচাতে চান তো?

জমিদারবাবু অবাক হয়ে বললেন—তার মানে?

তার মানে হচ্চে এই। আপনি জানেন না ওই ছেলেটির ওপর ওর সৎমা বড় অবিচার করেন। কাল ওর মা আমার কাছে এসেছিলেন—শুনুন তবে।

সব কথা খুলে বললাম। জমিদারবাবু প্রথমটা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

পরে বললেন—আমি কিছু কিছু জানি। বেশ এবার ও বেঁচে উঠুক, এর ব্যবস্থা আমি করবো, আপনাকে আমি কথা দিলাম। ও সেরে উঠুক, জানুয়ারি মাস থেকে যশোর জেলা-স্কুলের বোর্ডিং-এ ওকে আমি রাখবো।

—কেমন ঠিক তো? এবার কিছু হলে আমি বলে, কেউ আর ওকে বাঁচাতে পারবে না।

—আমি কথা দিচ্চি কবরেজ মশাই।

—বেশ। নির্ভয়ে থাকুন. আপনার ছেলে সেরে গিয়েচে। আগামী মঙ্গলবার ওকে পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আপনি পুরনো চাল কিছু এর মধ্যে যোগাড় করুন।

—পরের দিন জ্বর ছেড়ে গেলো রোগীর।

শিশির সেন একমনে গল্প শুনছিলেন।

বললেন—সেরে উঠলো!

—নিশ্চয়।

—আর কোনোদিন দেখেছিলেন তার মাকে?

—কোনোদিন না। সে ছেলে এখন কলকাতায় থাকে, কিসের ভাল ব্যবসা করে শুনেচি। জমিদারবাবু মারা গিয়েচেন। চললুম আমি, বৃষ্টি থেমেচে—ঘরে আলো

জবালি গে।

চন্দ্রনাথ কবিরাজ উঠে গেলেন।